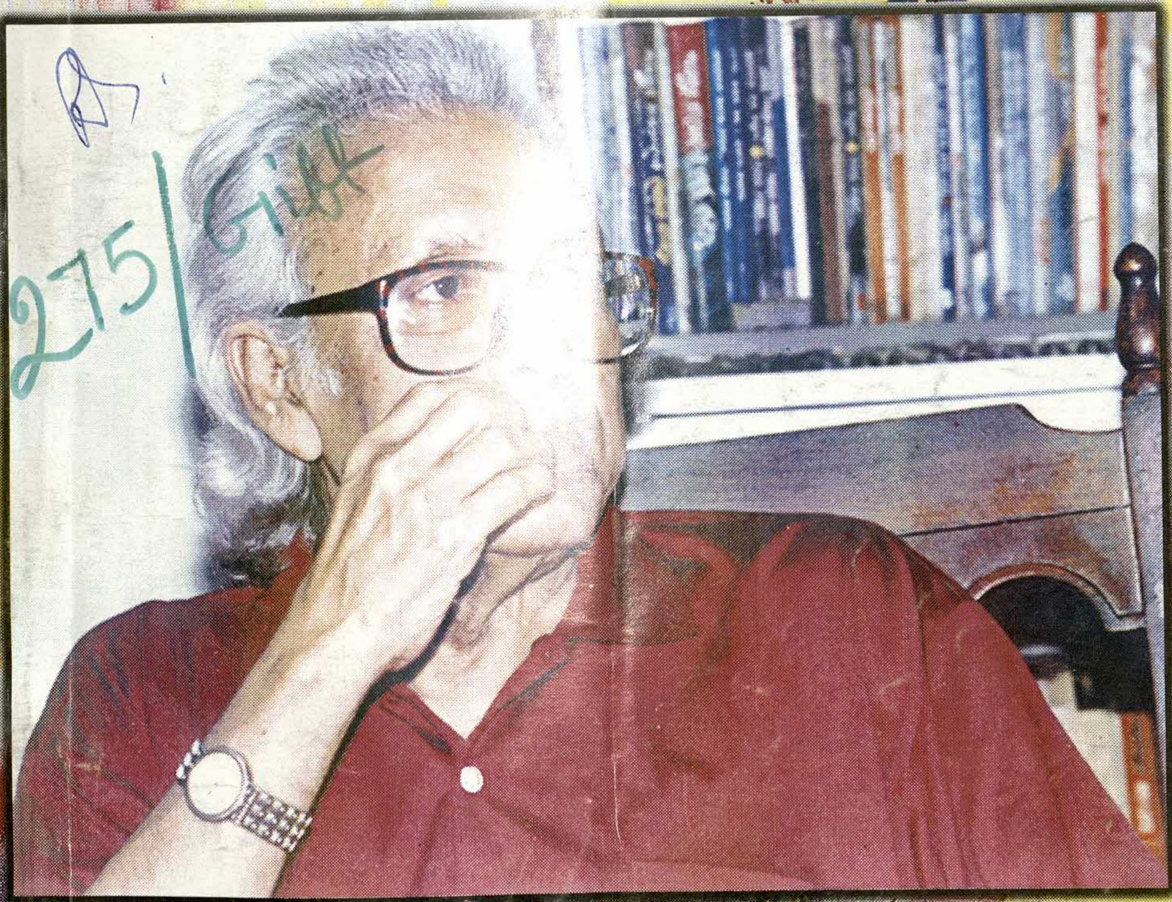
মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

শিক্ষা ও সাহিত্য

Teachers' Journal

VOL. LXXXV NO. 10 OCTOBER, 2006



নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

শিক্ষা ও সাহিত্য
Teachers' Journal

কার্তিক, ১৪১৩ অক্টোবর, ২০০৬

৮৫তম বর্ষ ঃ দশম সংখ্যা

স্বাধীনতা তুমি

শামসুর রাহমান

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল, ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা—
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল
স্বাধীনতা তুমি ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

সমিতি কার্যালয় ঃ সত্যপ্রিয় ভবন, পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ ফোন ঃ ২২১৫-৯১৫৮
২২১৫-৮৮৫৬
ফ্যাক্স ঃ ২২১৫-৭৯৩২

সম্পাদক
শ্রীবিকাশ মণ্ডল

যুগ্ম-সম্পাদক
শ্রীমতী অপর্ণা সান্যাল (ব্যানার্জী)

শিক্ষা ও সাহিত্য

সূচিপত্র

Teachers' Journal
CONTENTS

প্রচ্ছদে সদ্যপ্রয়াত শামসুর রাহমান

সম্পাদকীয়

সেই সত্য যা রচিবে তুমি

অক্টোবর সংখ্যা 'কবিতা সংখ্যা' হিসাবে প্রকাশিত হলো। সদ্যপ্রয়াত কবি শামসুর রাহমানকে শ্রদ্ধা জানাতে প্রচ্ছদে তাঁর ছবি, উপ-প্রচ্ছদে কবিতার অংশবিশেষ এবং কবিতাগুচ্ছের শুরুতে তাঁর পূর্ব প্রকাশিত একটি কবিতা সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া তিনটি প্রবন্ধে তাঁর কাব্যপ্রতিভার নানাদিক নিয়ে সমৃদ্ধ আলোচনা আছে।

বিভিন্ন বিষয় ও উদ্দেশ্যমুখী ৪৯টি কবিতায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যা কবিতাপ্রেমীদের ভালো লাগবে আশা করা যায়। সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি যেমন কবিতাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তেমনি কবিদের নিজস্ব শাণিত পরিশীলিত চিন্তন-মননের অভিব্যক্তিও ঘটেছে এগুলিতে যা পাঠকের চেতনাকে সমৃদ্ধ করবে।

৫ই অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস। এই দিনটিতে শিক্ষক সমাজকে সারা বিশ্বের মানুষ তাদের শ্রদ্ধা জানায় নানা উপচারে। শিক্ষার অঙ্গনকে সকলের জন্য অবারিত করার শপথ নেওয়ার দিন এই শিক্ষক দিবস। শুধু শপথ নয়, তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আন্দোলন চাই দেশব্যাপী। একথা আমরা যেন না ভুলি।

এই মুহূর্তে আমাদের সামনে দুটি গুরুতর বিষয় এসে উপস্থিত হয়েছে। এক, অতিবর্ষণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রবলভাবে বন্যায় আক্রান্ত। বন্যাদুর্গত এইসব মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। সংগঠনগতভাবে উদ্যোগের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে। দুই, সারা দেশের মতোই আমাদের রাজ্যেও ডেঙ্গু জ্বর এবং চিকনগুনিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ক্রমশ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। তাই এবিষয়ে আমাদের দ্রুত সচেতন হতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চেতনা বৃদ্ধি করতে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বাড়ছে। এরফলে প্রচুর প্রাণহানির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার উপর প্রচন্ড প্রভাব পড়ছে। কাশ্মীরে ও অন্যান্য জায়গায় পর্যটকদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ ভয়ঙ্করভাবে অর্থকষ্টে দিন কাটাচ্ছে। পর্যটন শিল্প থেকে সরকারী আয়ও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত। সরকারকে এর মোকাবিলায় যেমন গুরুত্ব দিতে হবে, পাশাপাশি জনমত সংগঠিত করার কাজটিও সমান গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে। আমাদের রাজ্যে মাওবাদীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমিতির নেতৃত্বও আজ তাদের দ্বারা আক্রান্ত। তাই সমিতিগতভাবেও এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

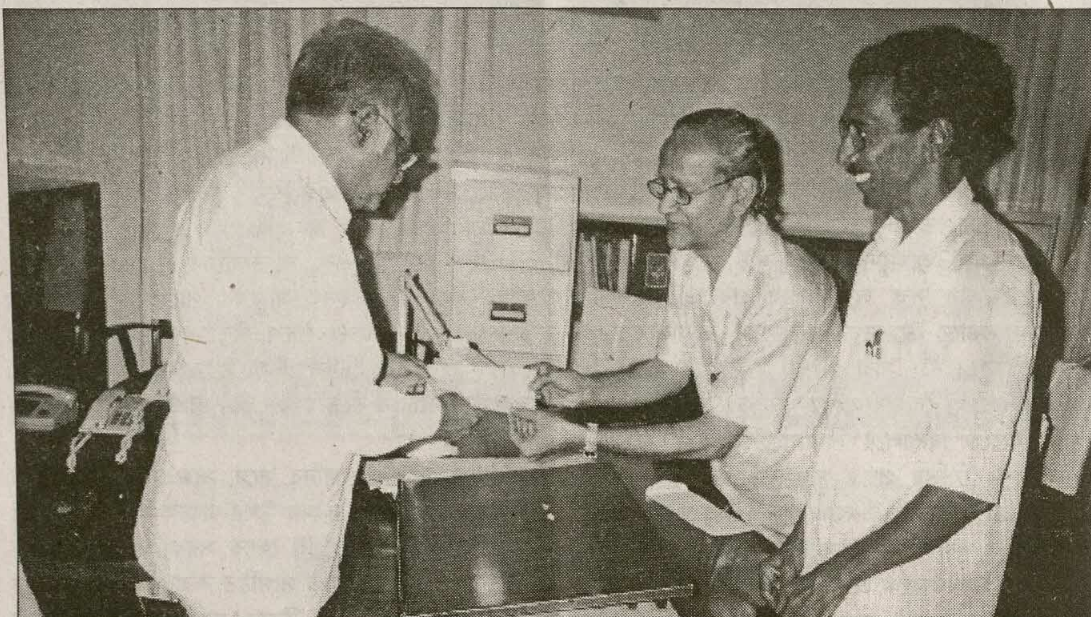
আমেরিকার হুমকি ও অন্যান্য দেশের বাধাকে অগ্রাহ্য করে সম্প্রতি গণতান্ত্রিক কোরিয়া পরমাণু পরীক্ষা চালিয়েছে। সারা বিশ্ব গণতান্ত্রিক কোরিয়ার এই পরমাণু পরীক্ষার নিন্দা করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ গণতান্ত্রিক কোরিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার পরিকল্পনা করছে। আমেরিকা অর্থনৈতিক অবরোধের হুমকি দিচ্ছে। আমরাও এই পরীক্ষার নিন্দা করছি। কিন্তু পরমাণু যুদ্ধের বিপদ থেকে বিশ্বকে বাঁচাতে গেলে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা পরমাণু শক্তিধর দেশগুলিকে আরো আন্তরিক হতে হবে। পরমাণু পরীক্ষা বন্ধ করতে হলে প্রথমেই পরমাণু শক্তিধর দেশগুলিকে তাদের সঞ্চিত পরমাণু অস্ত্র নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে হবে। অন্যথায় আমেরিকা সহ ৬/৭টি পরমাণু শক্তিধর দেশ অন্য দেশের নিরাপত্তাহীনতার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নিজেরা বিপুল পরিমাণ পরমাণু অস্ত্র মজুত রেখে অন্যদেরকে পরমাণু পরীক্ষা বন্ধ করতে চাপ বা হুমকি দিচ্ছে। এই ধরনের দ্বিচারিতার কারণেই অনেক বাগাড়ম্বর হলেও বিশ্বকে সম্পূর্ণভাবে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত করা বা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না। এরজন্য সবারই আন্তরিক সদিচ্ছার প্রয়োজন, অন্যথায় ভবিষ্যতে এই ধরনের পরমাণু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যুদ্ধ ইত্যাদির সম্ভাবনা থেকেই যাবে, পৃথিবীতে দ্বিতীয় হিরোশিমা-নাগাসাকির মারণযজ্ঞ সংঘটিত হবে। তাই এ বিশ্বকে সবার বাসযোগ্য করে রাখার দায়িত্ব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সব অংশের মানুষেরই।

রবীন্দ্রনাথ, অমর্ত্য সেনের পর আমাদেরকে আবার বিশ্ব দরবারে গর্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন বাংলাদেশের

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ মহম্মদ ইউনূস। ২০০৬ সালে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার জয় করে নিলেন ডঃ ইউনূস। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ ইউনূস সেই ১৯৭৪ সাল থেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের, বিশেষত নারীদের অর্থনৈতিক নির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন — তারই পুরস্কারস্বরূপ এ বছরের শান্তি নোবেল পুরস্কার। "প্রথাসিদ্ধ বাজার অর্থনীতির বাইরে দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি মুক্ত বিকল্প অর্থনীতির চিন্তার সন্ধান দিয়েছেন ইউনূস" —বলেছেন আরেক নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন।

১৪·১০·০৬

অতিবৃষ্টি ও জলপ্লাবনে দুর্গত মানুষের পাশে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি



পশ্চিমবাংলায় অতিবৃষ্টি ও জলপ্লাবনে দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সমিতির পক্ষ থেকে প্রথম দফায় একটি ৫০ হাজার টাকার চেক মাননীয় অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের হাতে তুলে দিচ্ছেন। সঙ্গে অন্যতম সহ-সাধারণ সম্পাদক নির্মলেন্দু গুহ।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে পশ্চিমবঙ্গে অতিবৃষ্টি, ঝঞ্ঝা ও জলপ্লাবনে ১৬টি রাজ্যের ৮৩ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার কৃষিপণ্য নষ্ট হয়েছে। চারলক্ষের বেশি ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়েছে। মৃত ৯০ জন। বন্যাপীড়িত মানুষের ত্রাণ ও পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করতে সমিতির পক্ষ থেকে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যতম সহ-সাধারণ সম্পাদক নির্মলেন্দু গুহ রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের হাতে ৫০ হাজার টাকার একটি চেক তুলে দেন। এটি ছিল সমিতির পক্ষ থেকে প্রথম দফার সাহায্য। সমিতির পক্ষ থেকে জেলা কমিটিগুলির সম্পাদকদের জেলার উদ্যোগে যথাসাধ্য অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে দুর্গত মানুষদের ত্রাণকার্যে লিপ্ত হতে বলা হয়। সামনে শীত। এছাড়া দুর্গত ছাত্র-ছাত্রীদের শীতবস্ত্র কিনে দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও নির্দেশ দেওয়া হয় জেলাগুলিকে।

বন্যাদুর্গত মানুষদের সাহায্যার্থে গত ১৪ই অক্টোবর সমিতির পক্ষ থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রিলিফ কমিটির তহবিলে দ্বিতীয় দফায় ৫০ হাজার টাকার আর একটি চেক জমা দিয়েছেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। সমিতির পক্ষ থেকে দুই দফায় মোট ১ লক্ষ টাকা বন্যার্তদের জন্য প্রদান করা হলো।

— *নিজস্ব প্রতিনিধি*

সমিতির ডাক

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাধারণ সম্পাদক

শারদোৎসব কেটেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে। অতিবর্ষণ ঝঞ্ঝা ও বন্যায় রাজ্যের ১৬টি জেলাই ক্ষতিগ্রস্ত। আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৮৩ লক্ষ। মৃতের সংখ্যা ৯০। দেড় হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে কৃষি উৎপাদনে। ৪ লক্ষের বেশি ঘর-বাড়ি ভেঙে গেছে। রাজ্যের জনদরদী বামফ্রন্ট সরকার এই অবস্থার মোকাবিলার জন্য ১০৪ কোটি টাকা এপর্যন্ত বরাদ্দ করেছেন। উৎসবের দিনগুলিতে রাজ্যের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বন্যাদুর্গতদের কাছে গিয়ে সর্বপ্রকার সাহায্যের কথা শুনিয়েছেন। দুর্গতদের সাহায্যার্থে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে প্রথম দফায়। দ্বিতীয় দফায় আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রিলিফ কমিটিকে। সমিতির পক্ষ থেকে জেলা সম্পাদকদের এক পত্রে জেলা থেকে অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে দুর্গত মানুষদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। সামনেই শীত। দুর্গত ছাত্র-ছাত্রীদের শীতের নতুন পোষাক দেবার উদ্যোগ নিতে জেলা সম্পাদকদের বলা হয়েছে। সমিতির দায়িত্বশীল সদস্যবন্ধুরা সে কাজ করছেন। রাজ্য দপ্তরে এ খবর এসেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিটি পালন করে রাজ্য দপ্তরে অবশ্যই রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

রাজ্যজুড়েই এখন চলছে ত্রাণ ও পুনর্গঠনের কাজ। দুর্গত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ত্রাণসামগ্রী। পাশাপাশি চলছে ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়ায় আক্রান্ত রাজ্যের মানুষের চিকিৎসা। রাজ্যের এমন বিপদের দিনে গত ৯ই অক্টোবর তৃণমূল কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল এই রাজ্যে শিল্পায়নের যে অনুকূল ও গতিশীল পরিবেশ তৈরি হয়েছে তাকে নষ্ট করতে কংগ্রেসের নৈতিক সমর্থন নিয়ে ১২ ঘন্টার বাংলা বন্ধ ডেকেছিল। উদ্দেশ্য ঃ সিঙ্গুরে প্রস্তাবিত টাটা মোটর কোম্পানির কারখানা তৈরির উদ্যোগের বিরোধিতা করা। বর্তমানে এই ধরনের শিল্প বহুমুখী অনুসারী শিল্পের জন্ম দেয়। এবং তার মধ্যদিয়ে ছোট-মাঝারি শিল্পের বিকাশ ঘটে ও কর্মসংস্থানের অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়। সিঙ্গুরে এই কারখানা হলে যে বিপুল কর্মসংস্থান হবে, তাতে শুধু সিঙ্গুরের মানুষই নয়, আশেপাশের বেকার যুবক-যুবতী বা কর্মহীন মানুষেরাও কিছু উপার্জনের পথ পাবে। শিল্প আকাশে গড়া যায় না। তাই জমি চাই। তাই রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণের জন্য কৃষকদের সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন ও জমি যাদের একমাত্র আয়ের উৎস তাদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করবার উদ্যোগ নিচ্ছেন। বিশ্বায়নের 'কর্মহীন উন্নয়নের' যুগে, কর্মচ্যুতির বিপদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকার শত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও রাজ্যের বেকারদের কর্মের ব্যবস্থা করছেন। এর বিরোধিতা করার অর্থ রাজ্যবাসীর স্বার্থের বিরোধিতা করা। রাজ্যের জেলায় জেলায় শিল্পতালুক গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস গত নির্বাচনে। তারাই রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন কর্মসূচিকে বানচাল করতে বন্ধ ডাকল। রাজ্যের উন্নয়নের পথে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির এই অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ৯ই অক্টোবর রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সর্বত্র স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে আহ্বান জানিয়েছে সমিতি। এ বিষয়ে জরুরী চিঠিও পাঠানো হয়েছে জেলাগুলিতে। আশা করা যায়, সমিতির এই আবেদনে সাড়া দেবেন রাজ্যের কল্যাণকামী মানুষ।

ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচিতে ইউ পি এ সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা শিক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সব শিশুর স্কুলে যাওয়া সুনিশ্চিত করতে রাইট টু এডুকেশন আইন পাস করাবে। কিন্তু আর্থিক দায়ভারের কথা চিন্তা করে ইউ পি এ সরকার এখন পিছু হঠছে। এখন কেন্দ্রের সরকার বলছে, কেন্দ্রীয় স্তরে শিক্ষাকে অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে কোনো আইনই তৈরি করা হবে না। বরং এ কাজ রাজ্য সরকারগুলিই করুক। এরজন্য মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬ তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকার সব রাজ্যগুলিতে পাঠিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, বাধ্যতামূলকভাবে রাজ্য সরকারগুলিকে এই মডেল আইন হুবহু অনুসরণ করে সব শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে

হবে। তা না হলে সর্বশিক্ষা অভিযানে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের পরিমাণ ৭৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫০ শতাংশ করে দেওয়া হবে। সোজা কথা, শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট টাকা কেটে নেওয়া হবে। অথচ ২০০২ সালের ৮৬তম সংবিধান সংশোধনী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার সর্বভারতীয় স্তরে আইন প্রণয়ন করে সব শিশুকে শিক্ষার সুযোগ করে দিতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় সরকার নিজের দায়িত্ব পালন না করে আর্থিক সীমাবদ্ধতায় জর্জরিত রাজ্যগুলির ওপর দায়িত্ব চাপাচ্ছে।

সমিতি এর প্রতিবাদে তিনটি কাজ করেছে ঃ এক, রাজ্যের মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে-কে এক পত্র দিয়ে জানিয়েছে যে, সমিতি চায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এই সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যাওয়ার মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করুক। দুই, সমিতি এ বি পি টি এ-কে সঙ্গে নিয়ে ১২ই আগস্ট এস টি এফ আই-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে এক যৌথ শিক্ষা কনভেনশনে মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬-এর ওপর আলোচনার আয়োজন করেন। বক্তা ছিলেন অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়। তিন, ২৩শে সেপ্টেম্বর সত্যপ্রিয় ভবনে আটটি বাম শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠনের যৌথ কনভেনশনের ব্যবস্থা করে সমিতি। বিষয় ঃ মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬। বক্তা ঃ মাননীয় পার্থ দে, শ্রীকান্তি বিশ্বাস ও অধ্যক্ষ ভবেশ মৈত্র। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিলটি পুনর্বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। ঐ প্রস্তাব দিল্লিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীকে পাঠানো হয়েছে।

ইতোমধ্যে রাজ্যের মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে জানিয়ে দিয়েছেন, "কেন্দ্রীয় সরকার গায়ের জোরে বিলটি চাপিয়ে দিচ্ছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা শিক্ষাবিদ্‌দের মতামত নিয়ে বিকল্প একটা বিল তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাব। বিকল্প বিলে আমরা দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার কথা বলব। শিক্ষার বিষয়ে কেন্দ্র তার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। তাদেরকেই বেশি আর্থিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। কোন্ কাজটা রাজ্য আর কোন্ কাজটা কেন্দ্র করবে তা বিকল্প বিলে নির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হবে।"

আমাদেরও চুপ করে থাকলে চলবে না। জেলায় জেলায় এই বিলের প্রতিবাদ করতে সভার আয়োজন করতে হবে।

৩রা নভেম্বরের কেন্দ্রীয় সমাবেশকে সফল করার জন্য ইতোমধ্যে প্রচারের কাজ চলছে জেলায় জেলায়। তাকে সুসংহত করতে হবে। এই সমাবেশটিকে বৃহত্তম সমাবেশে পরিণত করতে হবে।

৫ই নভেম্বর কলকাতায় সেন্ট পলস্ স্কুলে রাজ্য স্তরের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই কর্মসূচিটি সুসম্পন্ন করার প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে।

আগামী ২২শে নভেম্বর, ২০০৬ দিল্লিতে এস টি এফ আই-এর আহ্বানে সংসদ অভিযান কর্মসূচি সফল করতে হবে। ঐদিন বেলা ১১টায় দিল্লির রামলীলা ময়দানে সমবেত হতে হবে সংসদ অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের। সমিতির প্রতিনিধিদের নিউদিল্লি কালীবাড়ীতে, মন্দির মার্গ, নিউদিল্লি-১১০০০১, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে ২১, ২২ এবং ২৩শে নভেম্বর।

এই প্রথম এস টি এফ আই এককভাবে সর্বভারতীয় একটি কর্মসূচি পালন করছে। এস টি এফ আই-এর অন্তর্ভুক্ত সংগঠন হিসাবে এই কর্মসূচিকে সুশৃঙ্খলভাবে সুসম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে আমাদের।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি জিন্দাবাদ

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-ছাত্র-অভিভাবক ঐক্য জিন্দাবাদ

কবিতাগুচ্ছ



আসাদের শার্ট

শামসুর রাহমান

গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিম্বা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আমাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায়, নীলিমায়।

বোন তার তার ভায়ের অম্লান শার্টে দিয়েছে লাগিয়ে
নক্ষত্রের মতো কিছু বোতাম কখনো
হৃদয়ের সোনালি তন্তুর সূক্ষ্মতায় ;
বর্ষীয়সী জননী সে-শার্ট
উঠোনের রৌদ্রে দিয়েছেন মেলে কতদিন স্নেহের বিন্যাসে।

ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর-শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে-শার্ট
শহরের প্রধান সড়কে
কারখানার চিমনি-চূড়োয়
গমগমে এভেন্যুর আনাচে কানাচে
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।

আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখন্ড বস্ত্র মানবিক ;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।

খেয়ালখুশির হুল্লোরে

প্রশান্ত ধর

শিশুগণ কচি মন কিশলয় বাপ্‌ধন
সাত পাঁচ পাঁচকাজ মন হয় উচাটন।
টনটন মিল নিয়ে হৈ চৈ মিল্‌টন,
গনগন আঁচে পোড়ে ভুট্টার পল্‌টন।
হোমার গ্র্যামার হ্যামার মারে আয়রনে,
সোডার ফডার ভরে বোতলের বায়রনে।
গামার মামার ভুড়ি ভুরিভুরি কম্পমান,
হো রামা সারে গামা হাঁক দ্যায় দারোয়ান।

তপোবনে একমনে বিড়ি টানে কালিদাস,
খসখস ক্ষয়কাশ উড়ে যায় বালিহাঁস।
রাম রাম রামানুজ কি সবুজ গাংপার,
টন টন পল্টন কিসমিস রাংতার।
গনগন বাইগন ঝলসানো রঙ তার,
গুড়মুড়ি সুড়সুড়ি জল্পেশ ঢং তার।

হাঁকপাক হাঁকডাক খেল তার এন্তার,
আলো ধর প্রদীপ দে জ্যোতি কর মন তার।
শেষমেশ থাকে রেশ বেশ তার চেষ্টা,
বেশ বেশ দরবেশ নটেফুল শেষটা।

।। ২ ।।

ব্রত দত্ত কি প্রমত্ত হেঁকে গেল শিক্ষামিশন,
মেজবাহারে আলো আহারে ! সন্ধ্যামণির মতন।
ড্রপ আউট ড্রপ আউট চিরবিড়িয়ে বৃষ্টি এলো,
সর্বস্ব ছাইভস্ম ভেসে টেসে গেলো।
প্রিয়জন শ্রেয়জন সবজন যায়,
সারমেয় ক্ষিপ্ত হ'ল মস্তকের ঘায়।
প্রদীপ দে আলো ধর জ্যোতি কর ঝংকার,
ঝাঁজ ঝাঁজ মশলার — কচুবাটা লঙ্কার।
আকাশের গায়ে ওরে টকটক গন্ধ,
আমাদের বোধোদয়ে সবকাজ বন্ধ।।

দেহদান

(১৭ আগস্ট,২০০৬ কবিবন্ধু
শামসুর রাহমানের মৃত্যুসংবাদ শুনে)

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

আমার দেহটা চ্যালাকাঠের বিছানায় শোয়াবে না,
কুৎসিত পুড়িয়ে কী বা পেতে পারো
ছাই বৈ তো নয়!
আমাকে মাটির নীচে কোন গাছের ছায়ায় রেখে দিও,
অবশ্য শেয়াল-কুকুর-কাক-শকুনেরা, যাতে
খাবলে ছিঁড়ে না খায়
মাটি ঢেকে দিও
দোহাই সিমেন্ট-বালির বাক্স একদম নয়
দমের কষ্টে ভুগছি।
মাটি ফুঁড়ে যে চারাটি বেরবে
তার বাতাসে আমারও হাড়-মাস জুড়োবে
একটু যত্ন করো
গাছটি ফুলের হলে পুজোতে সংস্কারে হয়ত লাগবে।
ফলের হলেই ভাল
পাখিরা খেয়ে বাঁচবে, গান গা'বে
তার সুরে কোন কাঁটাতার থাকে না।

হেঁটে হেঁটে যাও তুমি স্বরাট সম্রাট

(কবি শামসুর রাহমানকে নিবেদিত)

নিমাই মান্না, হাওড়া

বন্দীশিবির থেকে এখন তুমি চলে গেলে
চিরতরেই ঘাসের শয্যায়।
নেকড়ের পাল দলে-দলে
কতোবার ভীড় জমিয়েছে,
তোমার দরজায়।
চোখ ঠেরে চলে গেছে কতো না অমানুষ,
বলে গেলে — মধুভূক হোয়ে কেবল
দিনরাত্রি পদ্যই বানাও।
বেনামী প্রেতেরা সব চটচটে ঠোঁট চেটেছে
প্রতিটি সন্ধ্যায়।
তবুও সকলেই জেনেছে এখন ঃ
স্বর্গ শিশিরে নিমগ্ন স্নান সেরে
একা-একা হেঁটে যাও তুমি স্বরাট সম্রাট।

বেবাক বিবর্ণতা

রবীন্দ্রনাথ মন্ডল, *শিক্ষক*
কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন (মেইন), কলকাতা

মাদুরে শুয়ে শুনছি আর্তনাদ
চিৎ আকাশটায় একফালি চাঁদ
বিবর্ণ গদ্যের ঝলকানি।
সারারাতের কুয়াশাভারে শালুকফুল
শিশিরসিক্ত শিউলিতলা
শিউরে ওঠে বিবর্ণ বেবাক,
ফুল পাখি নদী আর নিঃশব্দ নির্জনতা।
সর্বত্র নতজানু মূল্যবোধ
বিমর্ষ বিহ্বল বিষণ্ণতা..........

ফুটন্ত আগুন রং হৃদয়-সোপানে
নীলাকাশ তুলো মেঘ কাশগুচ্ছ
সর্বত্র ক্লান্তির ব্যাপ্তি, দহন অন্তরে,
হাতড়িয়ে ফিরি এক অস্ফুট আর্তনাদ।
মাদুরের বুকে নিজেকে লুকাই
নির্ঘুম প্রহর গেছে ক্রমশ প্রকট।
স্বপ্নান্ত জীবন ক্লান্ত, ঘুম নেই......
বিক্ষত বিদীর্ণ ব্যাকুলতা অরণ্য-অন্তরে।

দু'বাহু দিয়ে দু'কর্ণ লুকাই
নির্জনে তবুও আর্তনাদ ঃ
"সাঙ্গ হোক এই খেলা। আর যে পারিনে
মিথ্যে, কতকাল মিথ্যের পথে এগোবে কবিতা।

নারী, ফুল, স্বপ্নজাল
মিথ্যে যত কল্প-রং অসত্য ক্যান্‌ভাসে
নীল হলুদ সবুজের বিমূর্ত ব্যর্থতা-রং........"

বন্ধ কর—সাঙ্গ হোক ছন্দের অসত্য বেসাতি"
আগমনী সঙ্গীত সুর বেহাগ বেহাল
ঐ দেখো, প্রত্যক্ষ রক্তের রং, গদ্যের রুক্ষতা
বিদ্যুৎ ঝলকে ঃ
রক্তরেখা মসীলিপ্ত আকাশ ক্যান্‌ভাসে।

সত্যপ্রিয় রায় স্মরণে

বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য

সদস্য, অ্যাসোসিয়েট মেম্বার্স ইউনিট

নমি মাগো ভক্তি ভরে,
জ্ঞানটি দিও সবার তরে,
তা-না-দিয়ে জনম দিলে,
ধরা ধামে 'সত্য' করে।

উনিশ শত সাত সালেতে,
পহেলা মার্চে মানুষ বেশে,
ময়মনসিং জন্ম ভিটে,
জেলা এখন বাংলা দেশে।

শিক্ষা দিলে সবাই স্বাধীন,
রইবো নাকো একা হয়ে,
নি-শা-না তাই ঠিক থাকেতো,
মানুষ হবো শিক্ষা নিয়ে।

তৎ কালেরই ভারত বর্ষ,
ভেঙে চূরে তিনটি দেশ,
পাকিস্তান একটি হলো,
রইলো ভারত বাংলা দেশ।

স্বর্ণ যুগের এগারো তারিখ,
আটাত্তরের ফে-ব্রু-য়া-রী,
বিদায় নিয়ে করলে অনাথ,
শিক্ষাব্রতী নর নারী।

প্রার্থনা মোর আবার এসো,
নতুন শতক নতুন বেশে,
দাওগো মোরে জ্ঞান চক্ষু,
প্রণাম জানাই অবশেষে।

নিমন্ত্রণ

অসীমকুমার রায়

গৌরহাটী হরদাস ইনস্টিটিউশন, *হুগলী*

জীবনের শেষ কথা একদিন বলে যাবো
সেদিন নিমন্ত্রণে এসো, স্বপ্নচর পাখি
জেনো উদ্ভাসিত হবে অপরূপ জীবনের ছবি
ফাল্গুনী রাত ভেসে যাবে অমল জ্যোৎস্নায়

স্মৃতির রণক্ষেত্রের পুরনো ঝোপঝাড় থেকে বেজে উঠবে
সানাইয়ের বাজনার সুরে অসংখ্য রাতপোকার ডাক
তখন নিমন্ত্রণে এসো, রোমন্থন শেষে চিনে নিও
চেনা কক্ষপথে পরিভ্রমণরত তোমারই স্বপ্নভ্রমর।

তোমার বোধন

রবীন্দ্রনাথ দাস, *শিক্ষক*

সন্তোষকুমারী শিক্ষানিকেতন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

যে জন্য এই প্রাণপাত কঠিন সংগ্রাম
তা যেন নড়চড় না হয়
তোমার রঙ্ তুলির আঁচড়ে
যেন ঠিকঠাক সেই ছবিটাই ফুটে ওঠে
তোমার উদাত্ত গাওয়া গানে
সেই সুর তান লয় যেন প্রাণ পায়
তোমার কর্মে ও কথায়
যেন ফারাক না থাকে।

আর এইভাবে তুমি যদি দাঁড়াতে পারো
অন্ধকারে আলো জ্বালাতে পারো
তবে জেনো
জীবনের সব মেঘ কেটে গিয়ে
এ দেশে সূর্যসকাল
খুশির হাসিতে সব ম্লান বিষণ্ণ মুখ চাঁদমুখ
বেজে উঠবে কাঙ্ক্ষিত সুর
জীবনবাঁশিতে

আর সমস্বরে উঠবে তোমার জয়জয়কার
তোমার বোধন
এদেশের ঘরে ঘরে
সব মনে মনে

অথচ

সূর্য নন্দী, *শিক্ষক*

দাঁতন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর

ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে সরিয়ে দেখি
কার হাত
কার পা
কার দেহ এমন নিথর ?

মানুষের হাত
মানুষের পা
মানুষের মন
সবই যেন পাথর, পাথর !

ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে সরিয়ে, অথচ দেখি
আমরা, মানুষেরা এখনও বেঁচে আছি !

বর্ষা বন্দনা

শীতল গঙ্গোপাধ্যায়, *অধ্যাপক, টি ডি বি কলেজ*

রাণীগঞ্জ, আসানসোল, *বর্ধমান*

বর্ষা তুমি মাথায় দিলে বাজ
ফ্যাচাৎ কাদা গাড়ির চাকা থেকে
চকিত চোখে দৃষ্টি বিনিময়
বর্ষা তোমার ছাতাতে মুখ ঢেকে।

বর্ষা আমার কৈশোরে রাতজাগা
বর্ষা আমার যৌবনে মুখভার
রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে সুরে
ব্যর্থ চেষ্টা কণ্ঠ মেলাবার।

চাষার বুকে আশঙ্কা ও আশা
'অনা' এবং 'অতি'-র ঘেরাটোপে
বর্ষা তুমি বস্তুত ঈশ্বর
জীবন দিলাম তোমার হাতে সঁপে।

বর্ষা তুমি হাতেই না হয় মারো
ভাতের জোগাড় থাকুক ঘরে ঘরে
গাইব তোমার যশোগাথা, রূপ
দেখব আমার মুগ্ধ দু'চোখ ভরে।

সহযোদ্ধা

ঝুলনকান্তি দত্ত

ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি

শরতে কত ফুল প্রস্ফুটিত হয়,
তার সৌরভ—
নির্মল বাতাসকে আপ্লুত করে,
দিবাবসানে—
আবার যায় ঝরে।
কিন্তু—
নতুন বৃন্তে ঘটে বেদনা
শিকড়ে জেগে উঠে অরণ্যের সুপ্ত চেতনা।

যিনি গেলেন চলে,
তিনি কিছু গেছেন বলে।
হে প্রিয় সাথী
যারা আছ বেঁচে,
এখনও অনেক পথ বাকী।
শিকড়ের সমৃদ্ধ শিহরণ
বাংলার মাটিতেই শুধু নয় ?
প্রভাতী সূর্যের আলোয়
বিশ্বে ঘটুক তার পরিচয়।

তোমার আদর্শ যখন—
কঠিন সময়ের নির্মম আঘাতে,
ক্রুর হাসির—
শানিত ধূপ-ছায়ার অন্তরালেও
শিক্ষার প্রভায় বিচ্ছুরণ ঘটাতো ;
মনে হতো—
তোমার কর্মধারা
দিগন্তের যবনিকায় — যেন
অমানিশার সন্ধ্যাতারা।

তাই—
যেখানে ঘাতকের লড়াই ক্ষতবিক্ষত করেছে
যুগান্তরের নবোত্থানের ব্যথা।
যেখানে শহীদের মালা,
স্তূপাকারে ফিকে হয়ে আছে ;
সেই পথের — মৃত্তিকা রসে,
তোমাকে খুঁজে পেতে চাই।

রিক্তা দত্তের দুটি কবিতা

শিক্ষিকা, বরানগর মোহন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,
উত্তর ২৪ পরগণা

ভাস্কর বেইজ

মৃত্তিকার বাঁধনে বাঁধা উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ
উৎসারিত অন্তরাত্মা গভীর নিনাদ।
সেই সংবাদ —
ফুটে ওঠে ছবিতে, তুলিতে,
তারপর কঠিন মাটিতে ;
তবু তৃপ্ত নয় সেই সাগর চুম্বন
অথবা দংশন ;
কীর্তি শুধু গাথা হয়ে থাকে
উন্মুক্ত আকাশতলে ;
খোলা তার সর্ব অঙ্গ,
নেই গুন্ঠন।
হঠাৎ কোন এক শুভক্ষণ
বাউলে বাউলে হলো অপূর্ব মিলন।
জানি না সে কোন গ্রাম ছেড়ে
রাঙা মাটির্ কোন পথ ধরে
গিয়েছিল তারা,
অতি সর্বহারা
কোন এক মিলনের দেশে
অপূর্ব আবেশে।
....
কিঙ্করে গড়তে গিয়ে গড়ল শঙ্কর
জানি না সে কোন ভুবনেশ্বর !
অদৃশ্য ইঙ্গিতে তার
দিয়ে গেল অচেনা সংগীতে
মনোময় অতি মনোহর।

অধীনতা

স্বাধীনতা ছিল কিনা
ভূগোলের পাতাতে
ইতিহাসে খুঁড়ে দেখি
বাগানটা সাজাতে ;
সেখানেও গড়াপেটা
বাড়াভাতে ছাই ;
রাজারাই গজা শুধু
আর কিছু নাই।
অনেকটা মাটি খুঁড়ে
প্রত্নতত্ত্বর ভিড়ে
কঙ্কাল উঠে আসে
সত্যের নীড়ে।
বিস্ময়ে হতবাক, কেউ নয় চারুবাক,
নৃপতির গড়াপেটা স্থপতির আঙিনায়
গুন্ঠন খুলে যায় প্রকৃতির ছলনায়।
স্বাধীন তো কেউ নয়,
ছিলনা তো কোনদিন, —
আগামীতে দেখা যাবে
ফুটলে সে অমলিন।

স্বাতী বাগ্‌চীর তিনটি কবিতা

শিক্ষিকা, শ্রীপুর গার্লস হাইস্কুল, বর্ধমান

দশচক্র

কষ্টিপাথরও কখনো কখনো গন্ধমাদন হয়।
বোঝা বয়ে লাভ কী? বেনোজলে ভেসে যাওয়া
অগত্যা মধুসূদন।

শীতঘুম ভাঙে অচিরেই;
নিজেকে আবিষ্কার করি
গড্ডালিকার পালে,
একরকম অনিচ্ছায় — চরে বেড়াচ্ছি অজান্তেই।

আমাদের স্বেচ্ছাচার, কাঁটাঝোপ, খানা-খন্দ
স্পর্শ করে না তাঁর নিদ্রার বাহার।

ইচ্ছা — তাঁকে জাগাই,
জাগিয়ে দিয়ে জানাই ঃ
আম কখনও ইমলি হয় না,
দরকার তো ছাই উড়িয়ে ভিড়টা কমাবার।

শম্বুক

ভাবনামনস্ক গতিময়তা
আছে তারই একাধিপত্যে;
মতের অমিল যেটুকু —
একান্তই গৌণ।
দুর্ভেদ্য দুর্গে তার অস্তিত্ব
অবিশ্বাস্য বিপরীত —
শব্দহীন — নমনীয় — নিঃসঙ্গ।
কেউ ভাবে মেজাজটা অসামাজিক,
দাঁড়ি কমার নিতান্ত অভাব।
কেউ ভাবে অর্থহীন অভিমান।
ফল ঃ প্রতিপদে বাঁধে টক্কর।
রাখী পূর্ণিমার নিবিড় কবোষ্ণতায়
কেউ আজন্ম সুহৃদ।
কোথাও উপাসিত —
উচ্ছ্বসিতের উপাসনা মঞ্চে।
তারতম্যহীন অভিব্যক্তি।
শম্বুক
উরসে প্রশান্ত মহাসাগর।

সব খোয়াবার ছড়া

জ্বলছে আগুন মাটির বুকে
জ্বলছে আগুন মনে,
আকাশ! তুমি আঙ্‌রা ঝরাও
চোত্‌-বোশেখের ক্ষণে।
শুখা ক্যানেল, শ্যালো-র দাপট,
মরছে নদী পলির ভারে,
ধানের চারায় মরণ ঝাপট
কোন্ মহাজন রাখবে তারে!
বর্ষা আসে — বর্ষা এল
ক্যালেন্ডারের পাতায়,
বিদায় নিল আষাঢ় শ্রাবণ
বিনা মেঘের ছাতায়।
ঢাকের কাঠি, শিউলি সুবাস,
ঝরছে সোনা রোদের-ছলে,
ধূপের ধোঁয়া পঞ্চপ্রদীপ
চোখদুটি কি ভ'রল জলে?
কোন্ সে বেকুব চোখ ছল্‌ছল্‌?
কাস্তে হাতে মাথায় টোকা
এই যে রফিক, ওই যে সুবল
দেখছে জমির বেবাক ধোঁকা।
দুধ জমেনি ধানের বুকে
পায়নি জিয়ন রস,
সুদের কাঁটা ঋণের বোঝা
নামায় বুকে ধস।
কান্না-ভোলা চোখের পাতা
তীব্র মরুর জ্বালা
ফাটিয়ে পাঁজর গর্জালো কি
সব খোয়াবার পালা!
ডুবছে বাড়ি, ডুবছে জমি
অকাল ধারা পাতে —
আকাশ! তুমি অশ্রু ঝরাও
ছাই দিয়ে বাড়া-ভাতে!

সুদীপ গঙ্গোপাধ্যায়ের তিনটি কবিতা

সহ-শিক্ষক, চেতলা বয়েজ হাইস্কুল, কলকাতা

হিরোশিমা-নাগাসাকির শিক্ষা

সাম্রাজ্যবাদের আবার ঢাকাঢাকি
ইতিহাসের উদাহরণ ঃ হিরোশিমা-নাগাসাকি
বীভৎস তান্ডবে অভিশপ্ত বেঁচে থাকা বাকি
ইতিহাসে লিটল বয় ফ্যাট ম্যান মানে
হিরোশিমা-নাগাসাকি
পারমাণবিক অস্ত্র সংবরণ অসম্ভব নাকি ?
ইতিহাসের অনপনেয় কলঙ্ক ঃ
হিরোশিমা-নাগাসাকি

ইতিহাস

গভীর রাত —
ইতিহাস বইয়ের পৃষ্ঠায়
অজস্র ছাপার অক্ষরের এককোণে
ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভের ছবি
একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে ;
দমবন্ধকরা গুমোট আবহাওয়া,
জানালার বাইরে কংক্রীটের জঙ্গল,
উড়ালসেতুর নীচে দীনদরিদ্র, জমাট অন্ধকার
রাস্তার কুকুরদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে
মনে হচ্ছে
গোটা দুনিয়াটাই স্তম্ভিত হয়ে পড়ে আছে....

বিসমিল্লা খান স্মরণে

.... তুমি জাগিয়ে দিচ্ছিলে বিসমিল্লা খানের সানাই ....
— তার আগেই যদি ঃ শামসুর রাহমান

বিসমিল্লায় গলদ নেই, তারপরেও না
বইমেলা থেকে পুষ্পপ্রদর্শনী
বিয়েবাড়ি থেকে খেলার মাঠ
সর্বত্রই উস্তাদ আগ্রা গোয়ালিয়র ঘরানা
কাব্য ও সুর ওতপ্রোত, এ তো জানাই
করুণ সুরে কোথায় যেন বাজছে সানাই

শেষ চিঠি

উজ্জ্বল মন্ডল
পাঁচলা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাঁকুড়া

আমার প্রণাম নিও মাগো
কাল শুনবে তোমার বড় মেয়ে
আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে
ঝুলছে গাছে গলায় দড়ি দিয়ে।

আকাশে এখন রূপোর থালা চাঁদ
কী সুন্দর পৃথিবী চারিধার
খারাপ লাগছে একটা কথা ভেবে
এমন দৃশ্য দেখব না তো আর!

আমাকে তুমি বারবার বলেছিলে
শান্ত হয়েই যেন আমি থাকি
হাজারবার চেষ্টা করেছি মাগো
যাতে তোমার অনুরোধটা রাখি।

সহ্যের একটা সীমানাতো থাকবে
চেষ্টা করেছি নিজেকে মানিয়ে নিতে
অসুখ হলে ডাক্তার ডাকেনি
চাঁদর ছিল না গতবারের শীতে।

এসব কথা তোমাকে বলিনি
সবসময়ে তোমার মনে ভয়
চোখের সামনে তিন তিনটে মেয়ে
তাদের নিয়ে চিন্তাতো কম নয়।

আত্মহত্যা মহাপাপ জানি
এতো জেনেও কী করবো বলো
রোজ রোজ অশান্তির থেকে
একেবারেই মরে যাওয়া ভালো।

জবাব চাই

কানাইলাল বিশ্বাস, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক
গড়াইমারী জে কে বিদ্যানিকেতন, মুর্শিদাবাদ

প্রতিশ্রুতির পাহাড় পেরিয়ে
তুমি প্রকাশ্যে এসো
একবার হাত রাখ পাপের মিনারে

পেঁজা সাদা তুলোর নদী ডাইনে বামে
নতুন মানচিত্র জুড়ে জঙ্গীহানা
পায়ের নিচে হিংস্র ময়াল

ছায়া মানুষ দিচ্ছে শান — পোখরান পোখরান
জবাব চাই জবাব দাও
সামনে এসে দাঁড়াও মহাকাল।

সহাবস্থান

হর্ষময় মণ্ডল
মানকর গার্লস হাইস্কুল, বর্ধমান

গাছপালা, মাটি, ফসল, নদী প্রকৃতি
এইসব সম্পদেই আমার জীবন
দিন কাটে — সম্মানে উঁচু শির।
এদের নিয়েই হৃদয়ের কবিতাগুলিকে উন্মুখ করি — রচি
কবিতা বড় কষ্ট দেয় তবুও বুক ভরিয়ে রাখে।
যে কষ্টের কোন নাম নেই
সাদৃশ্য নেই অন্য কোন কষ্টের সাথে
আনন্দের সহোদর সহজন্মে ধরা
তীব্র অধিকার বোধে সারাক্ষণ থাকে
একা করে দেয় মানুষ থেকে
ক্রমশ বন্ধ্য হয় দারিদ্র্যতা — নির্জনতা
প্রকৃতি আর তীব্র আবেগ
আবেগমথিত করে পাগল করে।

ভাত আর ভাতের ছবি

শ্যামকিঙ্কর চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক
লোদনা মানখামার বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, বাঁকুড়া

প্রখর দহন শেষে ফিরে এলে
সাতপাকে বর্ষা বেঁধে নিয়ে
চুপসানো গাল বেয়ে বৃষ্টির নদীরেখা,
বানভাসি চোখে
অসংখ্য ধানের শীষ সবুজ প্রান্তরময় গ্রাম
ভেসে উঠে ঝাপসানো চোখে,
কিছুক্ষণ পেটের হাঙ্গর থাকে পাথর নিশ্চুপ
পরক্ষণে সমস্ত চোখ জুড়ে ভাত আর ভাতের ছবি।

অর্ধাকাশ

সায়ক দত্ত চৌধুরী
বেলুড়মঠ লালবাবা বিদ্যালয়, হাওড়া

সেইসব বেড়ালেরা গুঁড়ি মারে ; রাত শোঁকে,
খুঁজে ফেরে চড়াই-এর দল,
আকাশেতে চেয়ে দেখ তারাদল
আজো চঞ্চল।
স্রোতস্বিনী শরীরেতে বয়ে গেছে
কত শত কাল —
চন্দন তরু গন্ধে আজো স্থির
নিয়ানডারথাল।
নিভৃতে প্রশ্রয় স্পর্শ ছুঁয়ে যায়
মার্জার মাথায়
ঘুপচি ঘরের কোণে চড়াই — এরা
তবু গান গায়।
শিমুল পলাশ শাল ধুলোঝড়
মাদলের বোল
শুষে নেয় ধোঁয়া ইঁট যন্ত্র শব্দ
জনকলরোল,
কেন-না ফড়িং ছোঁ পুকুর জলেতে
নিস্তব্ধ দুপুরে
শুনে দেখ রঙিন ঘুড়ির টান
কিশোরী নূপুরে।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের তিনটি কবিতা

সহ-শিক্ষক, মিত্রভূম উচ্চবিদ্যালয়, বীরভূম

শপথ

মাটি চাটছে রক্ত, নখরাহত দেহ
বাতাসে বারুদের গন্ধ
লেবানন আজ বধ্যভূমি।

..... গান মিশাইলের মরণ নৃত্য
মরুর বালিতে গলিতে গলিতে বৃদ্ধ শিয়াল
দুধের শিশু নারীর শরীর ঝল্‌সায়।
মৃতের পাহাড়ে ভূতের নাচন
হিটলারী মাতন, আর কতদিন ?

বন্ধু, আজ রক্তশপথ
শত্রুঘরে মারণযজ্ঞ।

মাটি

আকাশ মন বাসন্তিক স্বপ্নে
নীল লাল সবুজ কতো রঙে রাঙা
জীবনে রঙ না থাকলে, সব সাদা
মেঘের কোলে সাগর ভাষা
পাহাড়ে পাহাড়ে বর্ষার গান
মাটি হাসে ভাতের গন্ধে।

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা, আমার সকালের সূর্য
শিশিরগন্ধ, স্বরবর্ণ।
সবুজ অরণ্য ঘরে নবান্ন
বাউলের গান, রাঙাপথ
নিকানো উঠোন আলপনা আঁকা মন।
স্বাধীনতা ; আমার স্ফুলিঙ্গ চেতনা
অগ্নিশপথ।

আমার দেশ

মেকাইল রহমান, প্রধান শিক্ষক
বেগমপুর বিবিপুর হাইস্কুল, উত্তর ২৪ পরগণা

আমার গ্রামের পাড়ায় পাড়ায়
হিন্দু এবং মুসলিমে
সম্প্রীতি বজায় রাখি
পূর্ব থেকে পশ্চিমে।

দাদুর দাদু পূর্বপুরুষ
পরম্পরায় সাবেক কাল
গরিব-ধনীর শ্রেণি-ফারাক
হিন্দু-মুসলিম তালে তাল।

ভারতভাগ ও বঙ্গভঙ্গ
জাতবিচারের ইতিহাস
পাক-বাংলা কাশ্মির-ইস্যুর
আমার পাড়ায় নেইকো চাষ।

গুজরাটেতে দাঙ্গা হলো
সারা ভারত আগুন-আঁচ
দেশটা নাকি হিন্দুপ্রধান
সংবিধানের উহ্য ধাঁচ।

বাবরি মসজিদ ভাঙল যেসব
উগ্র হিন্দু বদরাগে
যুক্তি দিল রামের মন্দির
ওটাই ছিল সবার আগে।

আমার পাড়ায় দাঙ্গাহাওয়া
ঝড় হয়ে বহে না যে
হিন্দু-মুসলিম খুনোখুনি
সব্বারই বুকে বাজে।

এই পাড়াটি আমার দেশের
একটি পাড়া নয় তো নয়
ভালোই হতো দেশটি যদি
আমার পাড়ার নকল হয়।

প্রাপ্তির খোঁজে

বলাকাশ্রী চক্রবর্তী, শিক্ষিকা
নবাবগঞ্জ শ্রীধর বংশীধর উচ্চবিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগণা

দুঃস্বপ্ন স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়
মরুভূমি দাপটে হাঁটে বুকে।
স্বপ্ন আঁকা তবু কোন্ সুখে!
বাস্তব কটাক্ষে হাসে!
ক্ষুধাতুর খাদ্যে পায় বিষ
হজমও করে অহর্নিশ,
অবশেষে মৃতবৎ ঘোরে চারিপাশে!

সুবাসিত সম্পর্কের খোঁজে —
দমবন্ধ প্রাণ ধুঁকে ধুঁকে
সারাটি জীবন,
অবশেষে সিক্ত চোখ বোজে!

আবার, অতিমোহ, উচ্চাশার সিঁড়ি,
ধাপে ধাপে প্রতিযোগী ধায় —
অবশেষে ভোগরোগে
অনাঘ্রাত অমৃতের শোকে
জীবন হারায়!

কবি কমলেশ সেন সেই মানুষের কবি

Poet is a man for all that's

মানিককৃষ্ণ রায়, প্রাক্তন সহ-প্রধান শিক্ষক
পশ্চিম পুটিয়ারী সুখরঞ্জন বিদ্যামন্দির, *কলকাতা*

তোমার অবিশ্রান্ত অনুর্বর ভূমি আজ উর্বর।
শস্য-ফুল-আর পাখির গান আর আছে রোদ বৃষ্টি ঝড়
অবিচার
তোমার ঋণ শোধ হলেও ক্ষুধার্ত ছোবল আর ক্রূরতা
হয়নি শেষ।
তোমার লাল নিশানের ক্লান্ত ঠোঁট আকাশে বাতাসে যেন
শোষণের ব্লুপ্রিন্ট
লৌকিক আর্তনাদ বিষাক্ত বাতাস ক্ষান্ত হয়নি অনাঘাত।
তুমি আজ নেই.........
আছে তব কারাগারের ছবি আর আছে অজুত প্রতিবাদ
সেখানে ক্রোধ-ঘৃণা-অশ্রুর ভালোবাসা
আমরা আছি ঐ সব কর্ণিকা কলমে
কবি কমলেশ সেনকে নিয়ে।

কবিতা

প্রসেনজিৎ রায়, সহ-শিক্ষক
নন্দকুমারপুর উচ্চবিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

কবিতা, তোমার সুসময় নয় আজ —
সহজ এখন নয় সোজা পথে হাঁটা,
তবুও যাত্রা দিগন্তরেখা পানে —
সে পথে চললে পায়ে ফুটবেই কাঁটা।
শব্দচ্যুত আখরগুলোর সারি —
বোমা, বেয়নেট হয়ে আছড়ায় দেখি,
বাক্যবন্ধে বিপন্ন কাল কাঁদে,
সে কান্না দেখে কবিতা লিখতে শিখি।
ঘুমভাঙা কোনো মানুষের হাত থেকে,
কবিতা, তোমার আগুন যখন ঝরে —
বোমা, বেয়নেট তুচ্ছ যে তার কাছে,
বুশ-ব্লেয়ারেরা ললিত স্তোত্র পড়ে।
বাঁধভাঙা বানে ভাসায় জীবনবোধ —
কবিতা, কলম তোমায় তখন লেখে,
পণ্যায়নের বৃন্তচ্যুত ফুল,
তোমার রঙেই দুনিয়া রাঙাতে শেখে।
কোনোদিন যদি এমন সময় আসে,
কবিতা তোমায় পড়ছে না আর কেউ,
সূর্যের ওঠা বন্ধ সেদিন হবে,
সমুদ্রে ঝড় তুলবে না কোনো ঢেউ।
হাল না ছেড়েও করছি লড়াই দেখো —
আঁধারের বুকে প্রদীপের লুটোপুটি,
এই লড়াই-এর শেষটা রয়েছে বাকী,
কবিতা, তোমার বাতিল করছি ছুটি।

গল্প বলা চাঁদ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক
বাঘমুন্ডী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, *পুরুলিয়া*

ওগো গল্প বলা চাঁদ, তুমি গল্প বলো।
গল্প বলো প্রথম নিউক্লিয়াসের,
প্রথম মায়োসিসের।
ভাল্লাগে না শুনতে আমার
গল্প শুধু ক্লোনের।

ওগো গল্প বলা চাঁদ, তুমি গল্প বলো।
গল্প বলো প্রথম সৌরজগতের,
প্রথম বিশ্বআনয়নের।
ভাল্লাগে না শুনতে আমার
গল্প শুধু বিশ্বায়নের।

ওগো, গল্প বলা চাঁদ, তুমি গল্প বলো,
গল্প বলো প্রথম ভোরের আলোর,
প্রথম পাখির গানের।
ভাল্লাগে না শুনতে আমার
গল্প শুধু সিডি, অ্যালবামের।

ওগো গল্প বলা চাঁদ, তুমি গল্প বলো।
গল্প বলো প্রথম বৃষ্টি ঝরার দিনের,
ফুলের প্রথম পাপড়ি মেলার।
ভাল্লাগে না শুনতে আমার
গল্প শুধু বারুদ গোলার।

ওগো গল্প বলা চাঁদ, তুমি গল্প বলো।
গল্প বলো প্রথম আগুন জ্বালার,
পশুর সাথে জঙ্গলেতে প্রথম ঘর বাঁধার।
ভাল্লাগে না শুনতে আমার
গল্প শুধু ভায়োলেন্স আর জঙ্গীহানার।

ওগো গল্প বলা চাঁদ, তুমি গল্প বলো।
গল্প বলো গ্যালিলিও, কোপারনিকাসের,
বলো সত্যেন বোস, আইনস্টাইনের।
ভাল্লাগে না শুনতে আমার
গল্প শুধু ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের।
ওগো গল্প বলা চাঁদ, তুমি গল্প বলো।
গল্প বলো সক্রেটিস, রামকৃষ্ণের,
বলো প্রভু যীশু, মহম্মদের।
ভাল্লাগে না শুনতে আমার
গল্প শুধু ক্রুসেডের,
তুমি বরং গল্প বলো শুধুই উত্তরণের।

ঘাতক

বিপুলকুমার ঘোষ, শিক্ষক
ফতেপুর জুনিয়র হাইস্কুল, *নদীয়া*

অন্ধকার গাঢ় হয় ক্রমশ ....
মৃত্যুর বেদনা তবুও ডেকে আনে অঝোর শ্রাবণ
মানবতা হারিয়ে গেলে তাকে আর পাবো না
কোথাও। গভীর জলাশয়ে রক্ত হয়ে বৃষ্টি ঝরে
টুপটাপ টুপটাপ। পদ্মপাতায় জল ডেকে আনে
প্রিয় ছেলেবেলা — জিওল মাছের মতো
কিলবিলিয়ে ওঠে রাম রহিম মাইকেলের
অকৃত্রিম শৈশব। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকে ঘরের কানাচে।
সাবরমতীর বুকে জেগে ওঠে ঘাতকের বীভৎস মুখ!
রাতদুপুরে খুন হয় জোনাকির স্নিগ্ধ আলো।
ভাইয়ের স্নেহ পিছলে যায় —
অন্ধকার হয় গাঢ়।
আতপ গন্ধেরা অঝোর বৃষ্টির মতো ঝরে
কচুর পাতায় রয়ে যায় দু'ফোঁটা জল
মৃত্যুর গভীরতা ডেকে আনে অঝোর শ্রাবণ।

পরম্পরা

সিরাজুল ইসলাম

নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, *নদীয়া*

১

অবরুদ্ধ শব্দনদী কল্লোলিত ধমনীতে
শিউলি ভোরে ঘাসের ডগা থেকে
কুড়িয়ে নেব শিশির-মানিক
প্রজাপতি দিন আবার কবিতা হবে।

২

তোমার মুষ্টিবদ্ধ হাতকে
নীচে নামাতে পারিনি কখনো
শুধু শৌখিন পঙ্‌ক্তি মালায়
সাজিয়েছি বিলাসী পাণ্ডুলিপি।

এ মিছিলে সামিল হয়ে দেখি
কবিতা আমারও হাতকে করেছে
উর্ধমুখী প্রতিবাদী।

সংক্রমণ

স্বপনকুমার জোত্‌দার, *সহ-শিক্ষক*

বিষ্ণুপুর স্যার রমেশ ইনস্টিটিউশন, *উত্তর ২৪ পরগণা*

একদিন সমুদ্র দেখব ভেবেছিলাম কিন্তু
তোমার চোখের উদ্‌গত অশ্রু সমুদ্র হয়ে ঝরবে ভাবিনি।
একদিন পাহাড় দেখব ভেবেও
অনাহূত আমি তোমার পাহাড় মনের বাধা পেরোতে পারিনি।
কষ্টের পয়সা সঞ্চয় করে একদিন ঠিক করলাম
সবুজ অরণ্যে পাতার নাচন দেখতে যাব।
পথে নেমে দেখলাম অরণ্যের সমস্ত শ্যামলিমা গায়ে মেখে
শরতের উজ্জ্বল আকাশকে লজ্জা দিয়ে হেঁটে চলেছ তুমি।
বাড়ী ফেরার পথে দেখি
রামবাগান বস্তির নোংরা, পঙ্গু বাচ্চাগুলোকে কী অবলীলায়
কোলে তুলে খাওয়াচ্ছ তুমি।
তোমার চোখে সমুদ্র, মুখে পাহাড়ের প্রতিজ্ঞা।
এখন অরণ্যের শ্যামলিমসা আমার মধ্যে
ক্রমশ সংক্রামিত হচ্ছে।

রঞ্জিতকুমার সরকারের দুটি কবিতা

শিক্ষক, বহুলা শশী স্মৃতি উচ্চবিদ্যালয়, *বর্ধমান*

ফসলের কবিতা

সবুজ ফসলে উঠোন সাজাবে বলে
কৃষক-মেধার বহুমুখী ভাঙাগড়া
অপটু ডানার নভোসঞ্চারী ছলে
পাখির পিপাসা বেঁধেছিল গাঁটছড়া।

ঋণী ফসলের সাবলীল সামগানে
তোমাকে চিনেছে বিশ্বাসহীন হাওয়া,
বেকসুর দিন চিতা জ্বালে অভিমানে
হোমাগ্নিতেই শেষ হয় চাওয়া-পাওয়া।

ক্রান্তিকালের কেতন চিনেছে রাত
সর্পিল এই প্রণয়ের রীতিনীতি,
পার হয়ে যাবো চোরাগলি গিরিখাত
নিভৃত রক্তে অন্তঃক্ষরা প্রীতি।

তোমার উঠোনে ফল্গু-রক্তে আমি
উজাড় করেছি ফসলের সঞ্চয়,
জ্বালাময়ী ক্ষত উঁকি মারে দিনযামী
রঙিন মিনার — সেই তো তোমার ক্ষয়।

মানুষ চিনেছে শুধু

রুক্ষ নিঃস্ব মাঠজুড়ে খরার দগ্ধ শোকগাথা
চিত্রিত ছায়ায় কাঁপে, নিষ্পত্র বৃক্ষের ঋণভার
ক্লান্ত জীবন ছুঁয়ে শস্যহীন এই কাতরতা —
লালিত সবুজ ইচ্ছা হৃদয়ে তবুও দুর্নিবার।

এই রুক্ষতার বুকে লুকিয়েছে দুরন্ত মাদল
শ্যামল মাঠের স্মৃতি .... নবান্নের মুগ্ধ কলরব
আদিবাসী জনপদে বেজে ওঠে মুখর মাদল —
মানুষ চিনেছে শুধু শস্যের শাশ্বত উৎসব।

বটগাছ

চিন্ময় বিশ্বাস, সহ-শিক্ষক
উদয়রাজপুর হরিহরপুর হাইস্কুল, *উত্তর ২৪ পরগণা*

বহুদর্শী বটগাছটার নিচে দাঁড়ালেই
বাবাকে মনে পড়ে যায়।
মনে হয় — বাবার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছি পরম নিশ্চিন্তে।
কোথাও কোনও কোলাহল নেই,
ঘরে-বাইরে নেই কোনও বিষোদগার,
নেই কোনও অতৃপ্তির অনন্ত যন্ত্রণা।
আছে শুধু জমাট ছায়া,
আর ঝিরঝিরে হাওয়ায় বাবার ফিস্‌ফিসে গলা —
অনেকটা পথ হেঁটে এসেছিস খোকা,
আয় এবার একটু বোস,
টুকু জিরিয়ে নে।

বটমূলে ব'সে ব'সে কখন যে তন্দ্রা এসে
নিয়ে চলে গেছে বহুদূর ....
জেগে দেখি — খা খা রোদ্দুরে ভ'রে আছে চারিদিক।
দিগন্তের ওপার থেকে তারস্বরে চিৎকার ক'রে
বাবা বলছেন —
বটগাছ, আরেকটা বটগাছ খোকা—
তোর ছেলেপুলে তবে দাঁড়াবে কোথায় ?

অপু দূর্গা এখন

শুভাশিস সিংহরায়, শিক্ষক
গরলগাছা হাইস্কুল, *হুগলী*

অপুকে এখন নিয়মিত স্কুলে যেতে হয়
তার ছোট্ট কাঁধে চাপিয়েছি ভারি সিলেবাস
ফিরতে না ফিরতেই নিয়মমাফিক টিউটোরিয়াল
আর এক দফা হাতেলেখা আর হোমটাস্ক

এদিকে দূর্গার পড়াশোনা নাচের তালিম
আর ফাঁক পেলে কম্পিউটারের সামনে বসে
মনোযোগী পাঠ ডি টি পি, ইন্টারনেট কত কী
একটা হাত বোর্ডে আর একটা বিশ্বস্ত মাউসে

তবু মাঝে মাঝে যখন আকাশজুড়ে মেঘ
উড়ে যায় বক গাছটা দাঁড়াতে পারে না ঠিক
রামধনু ঝল্‌সায় ঢেকে দিয়ে দিগন্ত অর্ধেক
তখন কি শোনে অপু ? ব্যস্ত আঙুল কী বোর্ডে স্থির ?
নিশ্চিন্দিপুর থেকে ভেসে- আসা শব্দের রেশ
কু...উ...ঝিক....ঝিক কু..উ..ঝিক..ঝিক..ঝিক..ঝিক।

বাঁচার তাগিদে

লায়লুন নেহার বেগম

মনের দিগন্তে সঞ্চিত কালো মেঘ
ক্রমে গাঢ় লাল হয়ে উঠছে
ইশারা দেয়, ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ
শেষ হয়ে গেছে অশ্রুকণা
জেগে আছে আঁখির পাতায়
দুর্ভিক্ষের রূঢ় প্রতিচ্ছবি।

আর জেগে আছে,
আমাদের ঘরে ঘরে দ্রৌপদীর লজ্জা
আজো সে ইতিহাস
হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা জ্বলন্ত অক্ষরে,
প্রতিশোধ বৃশ্চিকের মত
দংশন করে যায় অহর্নিশ
জাগো দেশবাসী,
তৈরী হও
চালাও অভিযান
ভেঙে দাও দানবের আস্তানা
লুপ্ত হোক তাদের বংশ
জাগো মেহনতী, বঞ্চিত, নিঃস্ব মানুষ।

ঠিক একদিন

হীরেন পাল, সহ-শিক্ষক
রাজগ্রাম বিবেকানন্দ হিন্দু বিদ্যালয়, *বাঁকুড়া*

আমার আমার করতে করতে তুমি
ম্যারাথন দৌড়ে হাঁপিয়ে উঠেছো।
শুধু ক্লান্তি, দীর্ঘশ্বাস, কষ্ট কনকচাঁপার আশায়
খামোখা হাপিত্যেশ
অন্যায় আপোষ ও আত্মকেন্দ্রিকতাই বড় শত্রু আমার।
ভাবো, যতদিন থাকবো এই চরাচরে আর্ত মানুষের জন্যে
থাকবো ত্যাগে ও তিতিক্ষায় নিয়ত নিষ্ঠায় হাটবো
সত্য সংগ্রাম ও প্রেমই হবে আমার একমাত্র ব্রত ও হাতিয়ার।

দেখবে মনের এই অদম্য অস্থিরতা, ঘন কুয়াশার মত
মেঘ ভেঙে
অন্তরের অলিন্দে নীলাকাশ আর শাশ্বত সূর্যোদয়।
তবেই
চোখে আসবে ঠিক একদিন উজ্জ্বল উপস্থিতি
মানুষের হৃদয়ে তোমার।

এই ছেলেটা

বরুণচন্দ্র পাল, প্রধান শিক্ষক
কৃষ্ণনগর হাইস্কুল, *বাঁকুড়া*

চিবুক ছুঁয়ে শ্রাবণ নামে এমন দিনে
এই ছেলেটা সামলে রাখিস্ পেটের আগুন!

'খাই খাই' তোর বাতিক সারাবেলা
'স্বাধীনতা দিবসে'র অর্থ জানিস?
শহরজুড়ে টহল দিলে মিলিটারি
.....ভারি বুটের আওয়াজ.....
লুকোবার জায়গা আছে কোন্ পাতালে?

....কুয়াশায় ফুল কুড়োনোর স্বপ্ন আছে
সাদাভাতের গন্ধ আঁচে.....
ভোরের আলোয় হা-কাকেদের ওড়াওড়ি!

সামলে রাখিস্ পেটের আগুন এই ছেলেটা
এমন দিনে চিবুক ছুঁয়ে শ্রাবণ নামে....

ইছামতী কথা বলে

(আসন্ন জন্মদিনে বিভূতিভূষণকে মনে রেখে)

সুশীল মুখোপাধ্যায়, *অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাকর্মী*
নিমতা জীবনতোষ ঘোষ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,
উত্তর ২৪ পরগণা

ছন্দে তোমায় যায় না লেখা-জোখা,
নদীর জলে আরণ্যকে
জীবন খুঁজে দেখা।
অরণ্যেরই ঘন ছায়ায় ছায়ায় —
ক্ষুধায় অন্ধকারে
ডানা মেলে অপুর স্বপ্নমায়া,
এরই মাঝে রইলে বেঁচে তুমি
রইল বেঁচে আশায় সর্বজয়া।
ওই যে দেখি শিশুর মেলা কত,
বাজায় কারা কোথায় আমের ভেঁপু
ক্ষুধায় কাতর স্বপ্নে রঙীন খোকা
লাখো লাখো উদোম গায়ে অপু।
বনগ্রামে মানুষ এল কত.....
বন জঙ্গল কেটে বানায় বাস —
তাদের মনে দুঃখ ভারী বোঝা,
ছুটে বেড়ায় বেঁচে থাকার ত্রাস।
চক্ষু বোজে দুর্গা বর্ষাঘোরে
চক্ষু ভরা মৃত্যুনীলের ঘোর;
তবু আশায় আজও সবাই বসে —
চালকে*তে ঐ আসবে যে লাল ভোর।
ছিলেন তিনি বন পাহাড়ে রাজা,
গল্পে তাহার হীরে মানিক জ্বলে —
আরণ্যকের স্বপ্নে বেঁচে থাকেন,
ইচ্ছামতী তাঁহার কথা বলে।

★ চালকে — বনগ্রামের নিকটবর্তী গ্রাম, বিভূতিভূষণের পৈত্রিক বাসস্থান। চালকী বারাকপুর।

জয়নাল আবেদিনের দুটি কবিতা

বানিয়াখড়ি, *নদীয়া*

সকাল থেকে সন্ধেবেলা

সকাল থেকে সন্ধেবেলা
দেখে গেলুম, পেকে গেলুম
কী দেখেছি, আসা যাওয়া
শূন্যতা আর ভেঙে যাওয়া।

সকাল থেকে সন্ধেবেলা
কাঁপন দেখি, নাচন দেখি
শুরু থেকে শেষও দেখি
মুখও দেখি, হাজারো মুখ।

সকাল থেকে সন্ধেবেলা
খেলা দেখি ওড়ার খেলা
খেলা দেখি নেমে যাওয়া
নামতে নামতে গড়িয়ে যাওয়া।

পিছুটান

ভালোবাসা হয়েছো পাগল
তবু জানা ভালো,
চুম্বক কতটা দূরে সরিয়ে দেয়।

মোহ কেটে গেলে
নিজেকে বড় বিশ্বাসী, হিসেবী মনে হয়
পিছুটান থাকে।

বুকের পাঁজর পুড়ে ছারখার হয়
ডেকে ডেকে জিরোয়, থিতোয়, বহু বছরের
ঘুমে আবৃত থাকে।

নতুন ফসল

দীনবন্ধু গণ্
বাণীভবন হাইস্কুল, *কলকাতা*

এবার ফসল তুলতে হবে
তাল হারালে চলবে না
রক্ত ঘাম আর চোখের জলে
নতুন ফসল বোনা।

এই তো এখন হইল সময়
নিরাণ দিও ক্ষেতে
আগাছাদের উপড়ে ফেলে
চাপান দিও তাতে।
সময় থাকতে আল বান্ধিয়া
বেনো জলে রোখো
সজাগ চোখে দিনে রাতে
ঘাই আর ঘোগে দেখো
আগায় বগা মাজরা পোকা
মারতে দেরি করো না।
কত বান আর খরায় ফসল তুলতে দিল না
কত যে শ্রম ব্যর্থ হইল সে সব ভুলো না।
এই শরতে কাটতে হবে/নতুন সোনার ধান
আগে ভাগে দিয়ে রেখো/কাস্তেখানায় শান
ফসল তোলার আগে যেন/অলস নিদ্রা যেয়ো না।
রক্ত ঘাম আর.....
কেউবা খুশি কেউবা অবাক
কারোর চোখ টাটায়
কেউবা আবার নিজের ক্ষেতে
এমনি ফসল চায়
জেগে থাকো বন্ধু তুমি হাতটি রাখো হাতে
আগামী আষাঢ়ে ফসল রুইব একই সাথে।
এই বাংলার বীজে দেশে
ফলবে ফসল সোনা।
রক্ত ঘাম আর চোখের জলে
নতুন ফসল বোনা।

স্বপ্ন-তারা

দেবাশিস মণ্ডল, সহ-শিক্ষক
বরাচিরা পি বি হাইস্কুল, *পূর্ব মেদিনীপুর*

শ্রেণিকক্ষে একমনে পড়িয়ে যান মাস্টারমশাই
গাছের গুঁড়ির চাকার ইতিহাস থেকে জেট্ প্লেন
বাদ দেন না কিছুই, রাজরাজরার কাহিনি
যুদ্ধ-ধ্বংস, সাম্রাজ্যের অদল বদল
গল্পে, উদাহরণে, ব্যাখ্যায় বোঝান সবই
সামনের কয়েকটি বেঞ্চ ছাড়া বাকীরা থাকে নিস্তরঙ্গ।

ছেলেদের স্বপ্ন-তারাকে পাইয়ে দিতে
মাস্টারমশাই পড়িয়ে চলেন
ঝাঁসির রানির রণচাতুর্য — তরবারির আঘাতে আঘাতে
ব্রিটিশ সৈন্য কীভাবে ধরাশায়ী,
শোনে আর বয়ঃসন্ধির মন উত্‌লে ওঠে
কেউ কেউ অলক্ষ্যে ছবিতে মাথা ঠেকায়
রানি তখন হিউরোজের গুলিতে হয় আহত
ঘন্টা পড়ে। কপালে ঘাম মুছে বাইরে আসেন মাস্টারমশাই।

সূর্য ওঠা অস্ত যাওয়ার মতই পার হয় শীত গ্রীষ্ম বর্ষা
মাস্টারমশাইরা পড়িয়ে চলেন
বোঝান, বকেন, স্নেহ করেন। তারপর একদিন
স্কুল ছেড়ে ছেলের পৌঁছায় সংসারে
রূঢ় বাস্তবের ভিড়ে বয়ঃসন্ধির উত্তাল মনের
ছবির স্মৃতিটুকুও যায় হারিয়ে,
তখন ঢের নদী বয়ে যায়
লক্ষ্য থেকে দূরে চলে যাওয়া হয় বহু পথ
সেখান থেকে স্বপ্ন-তারাকে দেখাই যায়
নাগাল পাওয়া যায় না।

আর নয় রক্তপাত মৃত্যুর মিছিল

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
শিয়ালডাঙ্গা, মণিহারা, *পুরুলিয়া*

চাই না রক্তপাত পথে ঘাটে দাঙ্গা হত্যা মৃত্যুর মিছিল....

মৃত্যুর বিরুদ্ধে আজ কঠিন বিদ্রোহ
ভেঙে টুক্‌রো করে দেবো হত্যাকারীর হাত
রাইফেলের নল আর উদ্যত পিস্তল।

বহু রক্ত ঝরে গেছে মানুষের রক্তে ভেজা মাটি
সভ্যতার কলঙ্কিত ইতিহাস জন্ম দিয়েছে
অনেক অনেক মৃত্যু ছোবল মেরেছে
স্তম্ভিত হয়েছি দেখে সন্ত্রাস ও ধ্বংসের পাহাড়
পারমাণবিক স্পর্ধা স্তব্ধ করতে বুকে বুকে জাগছে শপথ।

সমস্ত অস্ত্রাগার জবর দখল করে গড়বো উদ্যান
রাইফেলকে বানাবো লাঙল
রক্ত সেচে উর্বরা মাটিতে হেসে উঠবে ফুলের ফসল
এক বুক ভালবাসা গায়ে মেখে তোমার আমার আর সবার সন্তান
বেঁচে থাকবে অন্ন জল রুটির সংসারে।

আর নয় যুদ্ধ কিংবা ধ্বংসের মহড়া
স্বপ্নগুলি ফুটে থাক শিমুলে পলাশে
উঠোনের লাউমাচায় হেসে উঠছে চাঁদ
চাঁদের আলোয় নাচছে চাষার সন্তান
জ্যোৎস্নায় ভরেছে মাঠ শস্য মুখে বেজে ওঠে গান।

চাই না রক্তপাত খুন দাঙ্গা মৃত্যুর মিছিল
মৃত্যুর বিরুদ্ধে আজ কঠিন বিদ্রোহ
শুরু হোক জীবনের নান্দিপাঠ যে জীবন ধরে আছে
শক্ত মুঠোর মধ্যে সৃষ্টির নিশান।

'শামসুর রাহমান' মানে 'আসাদের শার্ট', স্বাধীনতা আর একুশের ভোর

অশোক অধিকারী

'মন্দ বিরূপ একটি দেশ — যেখানে আমাদের স্বাস্থ্যদাতা উৎপন্নগুলোর আকার ক্ষুদ্র এবং বিকোচ্ছে চড়াদামে, সেখান থেকে আরও কষ্টের দিকে যাত্রা —
পাথুরে পথ ভাঙা। তারপর
সকলি যখন ব্যথিত তখনি আমরা শুনতে পাই বৎসরের ভুল সময়ে সঠিক সেই গান
— (ডব্লু এইচ অডেন ঃ ভাবান্তর শামসুল হক)

একটি ঐতিহাসিক অনিবার্যতা সমস্ত মৃত্যুকেই যে স্পর্শ করে যায় তা হয়ত সত্য নয়। কিন্তু স্পষ্ট সময়ের ধারাবিবরণ দিতে দিতে যে জীবন কখনও পিছন ফেরার স্বপ্নে আপাত ভঙ্গুরতাকে আশ্রয়লগ্ন করে তোলে না সে জীবন স্পর্শ করে যায় ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতাকে। দায়বদ্ধতাকে যদি বলি জীবনমুখী আঁচড়। যদি বলা যায় ভৌগোলিক দ্রাঘিমারেখায় থামতে পারি, কিন্তু কেন থামব কিংবা থামার আগে আরও একবার পরিশ্রমকে নমস্কার জানিয়ে আবার ক্ষয়িষ্ণু উত্তরাধিকারীর মতো আঁকড়ে বাঁচব পরম্পরা, তবে বোধহয় সেই বাঁচার মধ্যে আবহবিদের রোদ বৃষ্টি মেঘের অন্যমনস্কতা থেকে যায়। কখনও তারা সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ায়। আবার প্রতিবাদী শুকনো মাটির বুকে দাঁড়িয়ে ঐশ্বরিক দোলাচলকে রেয়াৎ না করে বৃষ্টিহীন ভূগোলের কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হয়। তাই সত্যদ্রষ্টা ঋষির আঙিনায় জীবন যত দুঃখময়ই হোক, আনন্দের স্তবগান, বেদনার গান জীবনজয়ের গানই অনুরণিত হয়ে ওঠে বারে বারে। একটি স্বাভাবিক এবং আন্তরিক প্রশ্ন বোধহয় সবসময়েই আমাদের উৎপন্ন সম্পদের দিকে তির্যকভাবে নিয়ে যায়। অভিমুখী টানের ইঙ্গিতে সক্ষম দুনিয়ার স্বপ্ন প্রতি মুহূর্তেই লালিত হয় প্রকৃত ইচ্ছায়। হাজার কথার ভিড়ে আঁচলে বাঁধার শব্দকথা বোধহয় একটাই। হাজার অনুভবের পর্দায় একটিমাত্র অনুভবই যথেষ্ট ভাবায় আমাদের। অডেনের উক্তির ভাবান্তরে তাই সকলি ব্যথিত, দগ্ধ, ক্ষতবিক্ষত ভুলের ঊর্ধ্বে আমাদের উঠে আসার প্রবণতাই গানের শুদ্ধ স্বরলিপি হয়। আর তখনই 'আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন/আমার ব্যথার পুজা হবে সমাপন' (রবীন্দ্রনাথ)।

কবি শামসুর রাহমানের চলে যাওয়ার শব্দে কথাকটি এমনিই এল। বুঝলাম এ জীবন শুধুমাত্র দায়িত্বপালনের যান্ত্রিকতায় স্তব্ধ কোনো কৃত্রিমতা নয়। এখানে নির্মাণ এসেছে ভালোবাসা থেকে। সে ভালোবাসা আন্তর্জাতিক। তাই কবি শামসুর সকল দেশের। সকল মানুষের। তাঁর লেখ্যভাষার মান্যতা সুদূরপ্রসারী। গ্রহণযোগ্যতা দীর্ঘ বল্লমের মতো সুচালো ও ধারালো। বিদ্ধ করে আমাদের আবিশ্ব অনুভূতির প্রসারতাকে। সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধের সমুজ্জ্বল ধারায় উজ্জীবিত তাঁর কবিতা তাঁর জীবন। তাই সচেতন পাঠকমাত্রই তাঁর কবিতার বই হাতে নিয়ে মনে মনে একটি স্তব উচ্চারণ করতে অনুপ্রেরণা পায়। যেখানে শামসুর মানে আমাদের কবিতার সহৃদয় অভিভাবক। আমাদের স্মৃতিভ্রংশের মধ্যে জেগে ওঠা পিতার উদ্বেগ। যেখানে তাঁর কবিতা পড়ে আমরা 'সকল শব্দার্থ শিখে নিয়েছি গোপনে'। বাংলাদেশের কবিদের কাব্যভাষা নির্মাণ প্রসঙ্গে সৈয়দ শামসুল হকের একটি আলোচনার সামান্য অংশ তুলে দেওয়া যেতে পারে ঃ

> 'বাংলাদেশের কবিদের পক্ষে পদ্য রচনা ছাড়াও একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। বাংলা নামে এই দেশটিতে সাতচল্লিশ সালে দেশবিভক্তির পর যে জনগোষ্ঠীকে আমরা পাই, তাদের যুক্ত করতে হয়েছে বাংলা কবিতার মূল ধারা ও আধুনিকতার সঙ্গে এবং এই কাজটি বিশেষভাবে পঞ্চাশের দশকের কবিদের যাঁদের আমি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বৎসরটিকে ধরে বাহান্নর সন্তান বলি — তাঁদের করতে হয়েছে। এবং তাঁদের সঙ্গে যুক্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে ঈষৎ পরে ষাটের দশকের কবিরা।

পৃথিবীতে আর কোনো দেশের আর কোনো ভাষার কবিদের অন্তত এমন দায়ভার ইতিহাসে আর কখনো বর্তেছে বলে আমার জানা নেই। বাঙলাদেশের বাঙালির গদ্যটিকেও যথেষ্ট যুক্তিবহ, আধুনিক করে তোলবার কাজটিও সম্পাদন করেছেন এই বাহান্নর সন্তানেরা'।

সুতরাং আমার আলোচনার প্রারম্ভে যে ঐতিহাসিক অনিবার্যতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলাম সেই সুরে সুর মিলিয়ে আবার এ অংশে কবুল করার একটি দায় স্বভাবতই বর্তে যায়। যা দিয়ে কবি শামসুরকে আমরা চিনতে পারি। তাঁর সাহিত্যকে দেখার, চেনার দৃষ্টিটি ফিরে পেতে পারি। কবি শামসুরের জীবন তাঁর কাব্যভাষা নির্মাণের এই বিক্ষত প্লাটফর্ম তাই ভঙ্গুর নয়। তা তাঁর কবিতার পাতা, কলমের লেখনী হয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। তবুও —

ক. সাতচল্লিশের দেশভাগ। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা। তারথেকেও দেশ ও নতুন প্রজন্ম গড়ার অনিবার্যতা।

খ. ১৯৫২ ভাষা আন্দোলন। যা শুধু ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে অর্থনৈতিক অবরোধ কাটিয়ে ওঠার আন্দোলনে পর্যবসিত। রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা বৈচিত্র্য সংস্কৃতির সর্বোপরি কৃষিপ্রধান জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ আন্দোলন।

গ. ভাষার হন্তারক ঔপনিবেশিক শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি। একই সঙ্গে ভাষা ও কৃষির সর্বনাশ। প্রতিবাদ। রক্তপাত। নয়া ঐতিহাসিক দুনিয়া বদল। ভাষার প্রাণরক্ষা।

ঘ. ১৯৭২-এর জয়যুক্ত আন্দোলন। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। আবিষ্কার। একটি জাতির সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস।

একজন সচেতন কবির কাব্যভাষা নির্মাণের কেনভাস এভাবেই দীর্ঘ হয়। যেখানে স্বাধীনতা মানে শুধু অধীনতামুক্ত স্বদেশের ছবি নয়। স্বাধীনতা মানে 'রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান/স্বাধীনতা তুমি ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি..../স্বাধীনতা তুমি/বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার..../যেমন ইচ্ছে লেখায় আমার কবিতার পাতা'। যা সহজে আর কবি শামসুরকে পিছনে তাকাতে দেয়নি। কী হবে ভাষা, শব্দ, বাক্য। কী হবে তাঁর কবিতার ভাষা। বিষয়বস্তু।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর একটি অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণায় আমার পূর্বকথার প্রসঙ্গগুলিকে কয়েকটি লাইনে সাজিয়ে দিয়েছেন — '.....সারা জীবনেও আমি শামসুর রাহমানকে তাঁর যুক্তিবাদী আদর্শ থেকে টলাতে দেখিনি। ধর্মের উর্ধ্বে উঠে সমস্ত মানুষের সমান অধিকার ও বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার সামান্য বিচ্যুতির বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে অন্যথা দেখিনি। কোনও প্রলোভন, কোনও শাসানিতেও তিনি মাথা নিচু করেননি।' সাহিত্য রক্ষার সঙ্গে নিজের লেখনীর পক্ষে এই সংগ্রাম শামসুর রাহমান আজীবন করে গেছেন। বাংলাদেশ নাম্নী এই দেশের অন্তরে লুকিয়ে থাকা জ্বালা যন্ত্রণা, শাসকশ্রেণির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ, হত্যা রক্তপাত যত তীব্র হয়েছে ততই ক্ষুরধার হয়েছে তাঁর ভাষা। মিছিলের উন্নভাগে সারারাত হেঁটে যাওয়া কিংবা রক্তাক্ত বন্ধুর লাশের পাশে দাঁড়িয়ে আগামীর সম্মান প্রার্থনা। প্রতিবাদী কণ্ঠের অজর কবিতা বারবার যুক্ত বাংলাকে সাহস জুগিয়ে গেছে। ১৯৪৭-এর পর থেকেই একদিকে মৌলবাদের উত্থান। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। ধর্মান্ধতা। একে একে বিভিন্ন সময়ের স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম বাংলাদেশের জন্মের আগে ও পরের পালাবদলের ইঙ্গিত যুক্ত বাংলাকে যেমন অহঙ্কারী করে তুলেছে সঙ্গে সঙ্গে একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রশক্তির জঘন্য পাশবিকতার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সে দেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিকরা একপ্রকার জমি দখলের তীব্র লড়াইতে অবতীর্ণ হয়েছে বারবার। সেখানে সাহিত্য টিকিয়ে রাখার আন্দোলন যেমন এসেছে তেমনই এসেছে অর্থনৈতিক অবরোধ কাটিয়ে ওঠার লড়াই। তাই শামসুর কখনোই দায়সারা নন। কখনোই শৌখীন সাহিত্যসেবী নন। হত্যা উল্লাসে মত্ত স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে দিশা তাঁর কবিতা। তাঁর প্রবন্ধ।

তিনি কবি না প্রেমিক। তাঁর কবিতায় প্রেম এসেছে না প্রতিবাদ। স্লোগান না নিছক ভাবলেশহীন অবয়ব। এসব নিয়ে একশ্রেণির কৈবল্যবাদী যুগে যুগেই বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করান সৃষ্টিশীল মানুষদের। যদি বলি সব ভালো কবিতাই তো প্রেমের কবিতা। সব ভালো গানই তো মনের আর মননের। সব ভাবনাই যা কিছু সত্যের কাছে দায়বদ্ধ তা সবই মানুষের জন্য। তাহলে আর সেই তথাকথিত ভাবনাকে নিয়ে আমাদের সমস্যা থাকে না। তাই শামসুর যখন লেখেন — 'গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের/জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট/উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায়' (আসাদের শার্ট) কিংবা 'আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা'। তখন আর আমাদের সেই তথাকথিত দোলাচল ভাবনা কবি শামসুরকে চিনে নিতে কোনো দ্বিধার আশ্রয় নিতে সাহায্য করে না। কারণ কবি এখানে সর্বজনীন স্পর্শে, প্রতিধ্বনিময় শহর বন্দরে, মাঠে প্রান্তরে বলে চলেন সত্য জীবনের কথা।

দায়বদ্ধতার কথা। আরও একস্থানে তিনি লিখছেন — 'কখনো আমার মাকে কোনো গান গাইতে শুনিনি/সেই কবে শিশু রাতে ঘুম পাড়ানিয়া গান গেয়ে/আমাকে কখনো ঘুম পাড়াতেন কিনা আজ মনেই পড়ে না' (কখনো আমার মাকে)। এখানেও সেই প্রকৃতি বাংলার নস্ট্যালজিয়ার মধ্য থেকে বারে বারে তিনি জন্মভূমিকেই আঁকড়ে বাঁচতে চেয়েছেন। এখানে দ্বিত্ব মা ধ্বনির সেই দীর্ঘস্বর কবি শামসুরকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাড়া করে ফিরেছে। তাই সক্রিয় মৌলবাদ যখনই আক্রমণ করেছে এই দেশ, এই কবিকে। তিনি তাঁর দেশজ অভিমানে শরীর এলিয়ে দিয়েছেন নক্সীকাঁথার মাঠে।

১৯২৯ সালের ২৩শে অক্টোবর পুরনো ঢাকার এক বর্দ্ধিষ্ণু এলাকায় কবি শামসুর রাহমানের জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯৫৫ সালে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে এম এ পাশ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। পড়াশুনোর পরিবেশ পরিবারে থাকার সুবাদে ছোট থেকেই সাহিত্যের প্রতি একটা গভীর অনুরাগ তাঁর মধ্যে জন্ম নেয়। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করার আগেই যুক্ত বাংলায় তাঁর সাহিত্য সম্পদের কিছু কিছু নিদর্শন পাঠক সম্প্রদায় খুঁজে পান। তার কারণ হিসাবে ৫-এর দশকের মধ্যসময় থেকেই তিনি এপারের কবিতা পত্রিকাগুলির সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেন। বিশেষত বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকা কিংবা পরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশ পেতে থাকে। মূলত ৫-এর দশকের কবি হিসেবেই তাঁর পরিচিতি ক্রমশ পাঠক সমাজে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এর বাইরে সাংবাদিকতায় তাঁর হাতেখড়ি। বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি অনার্স পড়ার সময় থেকেই এই নেশা তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াত। সেটি পেশায় রূপান্তরিত হয় এম এ পড়ার সময়। ঢাকার দুটি বিশেষ কাগজ 'দৈনিক বাংলা' ও 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'র সম্পাদক ছিলেন। এই সময় তাঁর সাহিত্যজীবন অন্য এক দিশা পায়। একদিকে কবিতার প্রতি সখ্য অন্যদিকে সাংবাদিকতার নেশা তাঁর জীবনে এনে দেয় এক নূতন অভিজ্ঞতা। বিস্তৃত হয় তাঁর লেখার কেনভাস। মিশতে থাকেন বিচিত্র পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সঙ্গে। ঋজু ও পরিশীলিত হতে থাকে তাঁর স্বদেশবোধ। সেই সময় থেকেই তাঁর সাহিত্যে নির্মিত হয় এক নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব শৈলী। আসে প্রতিবাদ আবার জীবনের পক্ষের প্রেম। যেখানেই আক্রমণ সেখানেই প্রথম সারিতে তিনি। যেখানে সামরিক উচ্ছৃঙ্খলতা সেখানেই ঝলসে উঠেছে তাঁর কাব্যভাষা। আন্দোলনে সামিল হয়েছেন তিনি। মৌলবাদের হত্যার হুমকিকে অগ্রাহ্য করে কথা বলে গেছেন। আক্রমণের মুখে পড়েছেন তিনি কখনও পরিবার। তবুও শামসুর রাহমানকে দমিয়ে রাখা যায় না। তাই বোধহয় তাঁর সাহিত্যে আমরা একই সঙ্গে প্রতিবাদ, মাটি আর মানুষের গানের স্বরলিপির সন্ধান পাই। সাহিত্যের দাসত্ব চুরি করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখনীতে শৌখিনতার গন্ধ কখনও পাওয়া যায়নি। 'আসলে শামসুর কবি। দুই বাংলার কাব্যরসিক বাঙালী পাঠকের কাছে তিনি মানবতাবাদী প্রতিবাদী এক কবিরূপেই বন্দিত। আপসহীন লড়াই-এ তাঁর ক্লান্তি নেই। শুধু লেখা নয়, প্রয়োজনে মিছিলে পা মেলান, বক্তৃতা দেন। তিনি মনে করেন কবিকেও সংগ্রামী হতে হবে। মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে। ঘরে বসে বৈপ্লবিক বাক্যরচনায় তিনি বিশ্বাসী নন। স্বৈরতন্ত্র মানতে পারেননি বলে চাকরিও ছেড়েছেন। কর্মে ও কথায় এই সত্য ও সততা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য'।

(তরুণ মুখোপাধ্যায় ঃ গণশক্তি ২৭শে আগস্ট, ২০০৬)

যুক্ত বাংলায় তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ষাট। যাদের মধ্যে 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে', 'নোয়ার উদ্দেশে গোলাপ', 'অবিরল জল ভ্রমি', 'বিধ্বস্ত নীলিমা', 'নিজ বাসভূমে', 'বন্দীশিবির থেকে', 'আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি', 'প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে', 'মাতাল ঋত্বিক', 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ', 'রাজনৈতিক কবিতা', 'নিরালোকে দিব্যরথ' ইত্যাদি কয়েকটির নাম করা যেতে পারে। এছাড়া 'অদ্ভুত আঁধার এক', 'এলো সে অবেলায়', 'অক্টোপাশ' ইত্যাদি উপন্যাসগুলিরও নাম করা যেতে পারে। যাঁরা শামসুর রাহমানের কোনো একটি কাব্যগ্রন্থের যেকোনো একটি কবিতা পড়েছেন তাঁরাই কবির কাব্যভাষা সম্পর্কে একটি সচেতন অভীক্ষায় গিয়ে পৌঁছেছেন। যা তাঁর স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। যা তাঁর রক্তাক্ত হৃদয়ের 'এলিগরি'। তাই একথা বললে কোনো অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলাদেশকে চিনতে শামসুর রাহমানের কবিতাই যথেষ্ট। হয়ত একটু ঈর্ষান্বিত শোনাবে। কারও কাছে। কিন্তু ১৯৫০ থেকে ২০০৬-এর ১৭ই আগস্ট এই দীর্ঘ পরিক্রমায় যে দেশ তাঁকে কখনও ক্লান্ত করেনি সে হলো তাঁর বাংলাদেশ। স্বদেশপ্রীতি। মুক্তিযুদ্ধের কালো দিনগুলিতে তাঁর এপারের বন্ধুরা যখন তাকে চলে আসার কথা বলেছেন তিনি তা সাদরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ মৃত্যুর বিভীষিকা, ক্ষয়ক্ষতি আর নিয়ত হত্যার মধ্যদিয়ে এই স্বদেশকে মুক্ত করার অন্য প্রতিবাদ রচনায় মগ্ন তিনি। এ যেন — 'আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি' এই স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ এক জীবনানন্দ। যিনি তিমিরবিলাসী হতে চাননি। হতে চান

তিমিরবিনাশী। এই তিমিরবিনাশী কবিকে কোনো পুরস্কারের অর্থমূল্য দিয়ে সাজানো যায় না। যুক্ত বাংলার মানুষের পাওয়া ভালোবাসাই তাঁর সাহিত্যের সম্পদ, অনুপ্রেরণা। তবুও ১৯৬৯ সালে তিনি আকাদেমি পদক পান। ১৯৭৭ সালে একুশে পদক। ১৯৯১ সালে স্বাধীনতা পদক। 'প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে' তিনি সেই 'মাতাল ঋত্বিক' যিনি সহজে উচ্চারণ করতে পারেন — 'আমার কোনো তাড়া নেই'। কারণ 'যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে' — 'দুঃসময়ের বৃত্তে' দাঁড়িয়ে তাকে চিনিয়ে দেন কীভাবে 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ'। গত ৭ই সেপ্টেম্বর নবজাগরণ আয়োজিত শামসুর স্মরণসভায় জীবনানন্দ সভাঘরে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণে বলেছেন — 'সঙ্কটের মুহূর্তে শামসুর রাহমান হয়ে উঠতেন দৃঢ়চেতা। যুক্তিসহ প্রতিবাদ করতেন।' যুক্ত বাংলায় কবিদের প্রতিবাদ আজ ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয়েছে সত্য। কিন্তু প্রেম ও প্রতিবাদের শামসুর আমাদের মনে সেই আকাঙ্ক্ষার বীজ আমৃত্যু বপন করে গেলেন। আর তাঁর 'আমি কেন সাম্প্রদায়িক হতে পারলাম না' শুধুমাত্র একটি আত্মকথন নয়। একটি দলিল। সাম্প্রদায়িক ভাবনাকে সম্পূর্ণ আলাদা আঙ্গিকে তিনি দেখিয়েছেন এ রচনায়। তাই শেষ করি তাঁর কবিতায় —

'স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসী বটের মিলিমিলি পাতা
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার পাতা'
(স্বাধীনতা তুমি)

'উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।
আমাদের দুর্বলতা। ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।'
(আসাদের শার্ট)

মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক কবি শামসুরের মৃত্যু ঃ এক যুগের অবসান

সোমনাথ সাধু
সহকারী-শিক্ষক, মগরা উত্তমচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়, হুগলী

দু'হাজার ছয় সনের সতেরই আগস্ট ৬-১০ মিনিটে চলে গেলেন মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক কবি শামসুর রাহমান। অবসান ঘটল একটি যুগের। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ২০০৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তিত হয়েছে বেশ কয়েকবার। মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে জন্ম হলেও জাতীয়তাবাদী সত্তাই যে প্রধান, তার প্রমাণ মিলেছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ঘটনায়। আর এই স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা কবি হলেন শামসুর রাহমান। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভাষা-আন্দোলনের একজন বড় যোদ্ধাকে আমরা হারালাম। মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার জন্য শুধু ওপার বাংলার মানুষ নন, এপার বাংলার মানুষও তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করে থাকেন।

তাঁর মৃত্যুতে বাংলার মা-মাটি-মানুষ ও মাতৃভাষার প্রতি যে ঐকান্তিক ভালবাসা ও অনুরাগের ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়, তাতে কোনো খাদ নেই। কালো রাত পোহাবার পর 'শিউলি শৈশবে' মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ধীরোদাও স্বরে 'পাখি সব করে রবে'র আহ্বানে কবির উন্মেষ মুহূর্তের সূচনা। মানবপ্রেমিক কবি তাই ইতিকর্তব্য নির্ধারণে জড়তায় জড়িয়ে পড়েননি। অন্যায়-অত্যাচার-শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী সত্তা নিপীড়িত ও অত্যাচারিত জনগণকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই করেছে। বলিষ্ঠ সংকল্পে তিনি মাথা নিচু করে থাকার কথা ভাবতে পারেন না—

তবে কি আখেরে আমি মাথা নত করে চলে যাব,
তখন জাজ্জ্বল্যমান দ্বিপ্রহরে নামিয়ে উষ্ণীষ ? যদি যাই
গাছপালা, নদীনালা, উদ্যান প্রান্তর, আর ধূসর পাথর
নীল আসমান, রোদ্দুরের
.... পায়রা, বাজপাখি, এমনকি
শালিক-চড়ুই আর শেয়াল-কুকুর
কাপুরুষ বলে দেবে তুমুল ধিক্কার।

কেবলমাত্র সংগ্রামী চেতনাই নয়, সময়-সচেতনার এক প্রলিপ্ত রূপ তাঁর কবিতায় দেখা গেছে। আবার কখনো কখনো কবির এই সময় সচেতনতা ইতিহাস-চেতনায় সমৃদ্ধ লাভ করেছে। কবি জীবনানন্দের যেমন 'হাজার বছর ধরে পথ' মানস-ভ্রমণে হেঁটেছিলেন ; কবি শামসুর রাহমানও চলে গিয়েছেন খ্রীস্টজন্মের পূর্বে, আরও আগে যখন ইতিহাস রচনা শুরু হয়নি—

"প্রাগৈতিহাসিক
পানি প্রত্যুষের
গাল বেয়ে নামে আর গাছের সবুজ
চোখ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব দুঃখীর অশ্রুর মতোই
টপ টপ করে পড়ে শিশিরের জল।"

চিত্রকল্প (image) রচনার ক্ষেত্রে কবি শামসুর রাহমানের আত্মপ্রত্যয় চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ করেছিল। যুগে যুগে 'চাঁদ' যেমন কবিদের কাছে রূপমুগ্ধ পরিবেশ সৃজনে সহায়তা করেছিল, তেমনি তা আবার দুর্ভিক্ষ-মহামারীর সংগ্রামী পরিবেশে হয়ে উঠেছিল 'ঝলসানো রুটি' বা 'কাস্তে'। কবি শামসুরও গোলাপকে একইরকমভাবে স্থাপন করেছেন মুক্তি-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে—

ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, এবার আমি
গোলাপ নেবো।

(ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা)

মুক্তিপ্রেমী কবি শামসুর রাহমান

মোঃ কুতুবুদ্দিন মোল্লা

শিক্ষক, সরিষা হাইস্কুল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

"তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খান্ডবদাহন?
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর গেল হরিদাসীর।"[১]

বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা-পিয়াসী এই কবি শামসুর রাহমান আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। প্রণব চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন— "...১৯৭১-৭২-এর পাক তানাশাহীর বিরুদ্ধে বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম, নৃশংস অত্যাচার নির্যাতন, জয়লাভ কবিকে উজ্জীবিত করেছে। আবার নিজ বাসভূমেই মৌলবাদের মধ্যযুগীয় বর্বরতা সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে কবিকণ্ঠ বিদ্রোহী হয়েছে। বারবার কবিকে জীবনহানির হুমকি সহ্য করে থাকতে হয়েছে। গত বছরের ১৭ই আগস্ট মৌলবাদী বিস্ফোরণ ঘটেছিল বাসস্থানে আর এ বছর ১৭ই আগস্ট দু'বাংলার কবিতার মানচিত্র থেকে চিরবিদায় গ্রহণ।..."[২]

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ-ষাট দশকের বাংলাদেশের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি শামসুর রাহমানের জন্ম রাজধানী ঢাকার মাহুতটুলিতে ২৪শে অক্টোবর, ১৯২৯। পিতা আলাহাজ্জ মুখলেসুর রাহমান, মাতা মোসাম্মাৎ আমিনা বেগম। তিনি পিতার দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান। এগার ভাই-বোনের মধ্যে তিনি চতুর্থ সন্তান। তাঁর জন্ম এবং শিক্ষাদীক্ষাও অখন্ড বাংলায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দাঙ্গা ও বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। নিজের দেশকে দু'বার—একবার ইংরাজদের কাছ থেকে আর একবার পশ্চিম পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীন হতে দেখেছেন তিনি। দেশ ভাগ হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে থাকা তাঁর কবি-চর্চায় অন্তরায় হয়েছিল। কেননা, সেই সময়টা পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের পক্ষে বড়োই মন্দার যুগ ছিল। উগ্র ইসলামিক আদর্শের প্রচার, ধর্মের জিগিরে বিভক্ত হয়ে গড়ে ওঠা পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেবার পরিকল্পনা প্রভৃতি কবিতার জগৎকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী ঢাকায় পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী জনাব নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার কথা ঘোষণা করলে পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ববঙ্গ)-এর সমগ্র জনগণ জাতি-ধর্ম-দল নির্বিশেষে ছাত্র-শিক্ষক অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবীরা সম্মিলিত হয়ে প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের দিন ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিলে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছিল। ফলে যে সংঘর্ষ বেঁধেছিল তাতে পুলিশের হিংস্র আক্রমণে জঙ্গি বর্বরতা লজ্জা পেয়েছিল। লাঠি, টিয়ার গ্যাস, গুলি অবাধে চালিয়েছিল তারা। ৩০০ জন আহত, ২০০ জন বন্দী ও শহীদ হয়েছিল জব্বার, বরকত, রফিক প্রমুখ। এইভাবে নানা সময়ে সংঘর্ষে-প্রত্যক্ষ যুদ্ধে হতাহতে অনেক বলিদানের শেষে ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাকিস্তানী ফৌজ আত্মসমর্পণ করে এবং জন্ম নেয় এক স্বাধীন স্বতন্ত্র বাংলাদেশ রাষ্ট্র—যার রাষ্ট্রভাষা বাংলা। কবি শামসুর রাহমান এই সময়-পটভূমিতে প্রতিবাদী কণ্ঠে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং কবিতা রচনায় বিপ্লবীদের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা, পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও তীব্র ক্ষোভ তাঁর এই সময়কার কাব্য-কবিতার বিশেষত্ব হয়েছিল।

কবি শামসুর রাহমান ১৯৪৫ সালে ১৬ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলেও পাঠ অসমাপ্ত থাকে। ১৯৫৩ সালে স্নাতক হন বটে, তবে স্নাতকোত্তর ক্লাসের পড়া অনার্স পড়ার

মতোই অসমাপ্ত থেকে যায়। পেশায় সাংবাদিক হলেও সাহিত্যসাধনা ছিল তাঁর নেশা। ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজ'-এ সাংবাদিক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন, তারপর যোগ দিয়েছিলেন বিখ্যাত বাংলা দৈনিক পত্রিকা 'দৈনিক পাকিস্তান'-এ ; পরে এই পত্রিকার নাম হয়েছিল 'দৈনিক বাংলা'। পরে তিনি এই পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং আরও পরে সম্পাদক হয়েছিলেন। নাগরিক জীবনের হতাশা, যন্ত্রণা, বিক্ষোভ এবং সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সমস্যাসংকুল বিষয়গুলি সংগ্রামী জনতার পক্ষ অবলম্বন করে রূপায়িত করেছেন তিনি তাঁর কাব্যে। তিনি প্রায় পঞ্চাশ-ষাটখানা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। ছোট বোনের মৃত্যুতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছিন্নমুকুল' অনুসরণে কবিতা লিখে ছেলেবেলায় তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু। জীবনানন্দ দাশের অনুসরণে রচিত তাঁর প্রথম কবিতা '১৯৪৯' সোনার বাংলা পত্রিকার প্রকাশিত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' ১৯৬০ সালে রচিত। প্রসঙ্গত তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী উল্লেখ্য বিষয়—

কাব্যগ্রন্থ ঃ

১) প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০)
২) রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩)
৩) বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৭)
৪) নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮)
৫) নিজ বাসভূমে (১৯৭০)
৬) বন্দীশিবির থেকে (১৯৭২)
৭) দুঃসময়ে মুখোমুখি (১৯৭৩)
৮) ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা (১৯৭৪)
৯) আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি (১৯৭৪)
১০) এক ধরনের অহংকার (১৯৭৫)
১১) আমি অনাহারী (১৯৭৫)
১২) শূন্যতায় তুমি শোকসভা (১৯৭৭)
১৩) বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে (১৯৭৭)
১৪) প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে (১৯৭৮)
১৫) ইকায়ুসের আকাশ (১৯৮২)
১৬) উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ (১৯৮২)
১৭) মাতাল ঋত্বিক (১৯৮২)
১৮) কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি (১৯৮৩)
১৯) নায়কের ছায়া (১৯৮৩)
২০) এক ফোঁটা কেমন অনল (১৯৮৩)
২১) আমার কোন তাড়া নেই (১৯৮৪)
২২) যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে (১৯৮৪)
২৩) অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই (১৯৮৫)
২৪) হোমারের স্বপ্নময় হাত (১৯৮৫)
২৫) ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই (১৯৮৫)
২৬) শিরোনাম মনে পড়ে না (১৯৮৫)
২৭) টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে (১৯৮৬)
২৮) ধূলায় গড়া শিরস্ত্রাণ (১৯৮৬)
২৯) দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে (১৯৮৬)
৩০) অবিরল জলভূমি (১৯৮৬)
৩১) আমার কজন সঙ্গী (১৯৮৬)
৩২) ঝর্ণা আমার আঙুলে (১৯৮৭)
৩৩) স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার (১৯৮৭)
৩৪) খুব বেশি ভালো থাকতে নেই (১৯৮৭)
৩৫) মঞ্চের মাঝখানে (১৯৮৮)
৩৬) বুক তার বাংলাদেশের হৃদয় (১৯৮৮)
৩৭) হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো (১৯৮৯)
৩৮) গৃহযুদ্ধের আগে (১৯৯০)
৩৯) সে এক পরবাসে (১৯৯০)
৪০) খন্ডিত গৌরব (১৯৯২)
৪১) ধ্বংসের কিনারে বসে (১৯৯২)
৪২) হরিণের হাড় (১৯৯৩)
৪৩) আকাশ আসবে নেমে (১৯৯৪)
৪৪) এসো কোকিল, এসো স্বর্ণচাঁপা (১৯৯৫)
৪৫) উজাড় বাগানে (১৯৯৫)
৪৬) তুমিই নিঃশ্বাস, তুমিই হৃৎস্পন্দন (১৯৯৬)
৪৭) মানবহৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই (১৯৯৬)
৪৮) তোমাকেই ডেকে কোকিল হয়েছি (১৯৯৭)
৪৯) কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার দিকে
৫০) ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুঁকছে
৫১) হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল (১৯৯৭) ইত্যাদি।

শিশুতোষ গ্রন্থ/ছড়া ঃ

১) এলাটিং বেলাটিং (১৯৭৫)
২) ধান ভানলে কুড়ো দেব (১৯৭৭)
৩) গোলাপ ফোটে খুকীর হাতে (১৯৭৭)
৪) স্মৃতি শহর (১৯৭৯)

অনূদিত গ্রন্থ ঃ

১) ফ্রস্টের কবিতা (১৯৬৫)
২) খাজা ফরিদের কবিতা (১৯৬৯)
৩) Shamsur Rahaman : Selected Poems

translated by Kabir Chowdhury (1975)

সংকলন ও শ্রেষ্ঠ কবিতা :

১) প্রেমের কবিতা (১৯৮১)

২) শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭৬, ১৯৮৫)

৩) শামসুর রাহমানের রাজনৈতিক কবিতা (১৯৯৩)

৪) শামসুর রাহমানের প্রেমের কবিতা (১৯৯৩)

প্রবন্ধ গ্রন্থ : আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ (১৯৮৬)

উপন্যাস গ্রন্থ : ১) নিয়ত মন্তাজ

২) অদ্ভুত আঁধার এক ৩) এলো সে অবেলায় ইত্যাদি।

"কবি শামসুর রাহমান কাব্যজীবনের শুরুতে আত্মকেন্দ্রিক ভাবের দ্বারা পরিচালিত হন। তবে তিনি বুদ্ধির বিচারে কবিতার মূল্যায়নের পক্ষপাতী। ফলে প্রথম দিকে কবির আত্মচেতনার বিকাশ ঘটেছে অস্পষ্ট জটিলতা ও দুর্বোধ্য ভাবপরিমন্ডলকে কেন্দ্র করে। তাঁর কবিমানসের এই প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে একালের বুদ্ধিবাদী কবিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছে।"[৩]

আধুনিক কবিদের মতো শামসুর রাহমানের কবিতায়ও আত্মগত ভাবের প্রাধান্য আছে; তবে তাতে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে হৃদয়বৃত্তির পরিচর্যা ব্যাহত হয়নি। তিনি ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করতেন না। সতত মৌলবাদীদের রোষদৃষ্টির মধ্যে পড়তেন। স্বদেশ ও স্বভাষা সাধনা তাঁর জীবনব্রত; সাংবাদিকতা তাঁর পেশা হলেও কবিতা তাঁর নেশা এবং এই কবিতার মধ্যেই তিনি অমরত্ব কামনা করেছিলেন। তাঁর প্রায় ৭৭ বছর আয়ুষ্কালে ৪৬ বছরের কাব্যসাহিত্য সাধনায় কী কী বিশেষত্ব প্রকাশিত হয়েছে তা সংক্ষেপে সূত্রাকারে উল্লেখ করা যেতে পারে—

১) স্বদেশপ্রীতি শামসুর রাহমানের মন, মনন ও মানসিকতার এক অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য।

২) তাঁর স্বাদেশিকতায় দেশজ ঐতিহ্যের বিকশিত সৌন্দর্য ধারা প্রকাশিত।

৩) তাঁর স্বদেশচেতনায় দেশীয় জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

৪) তাঁর স্বদেশচেতনা শুধু স্বদেশপ্রীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিবিধ যুগীয় সমস্যা, সংকট, বিভ্রান্তি তাঁর সংবেদনশীল কবিচিত্তকে আন্দোলিত করেছে।

৫) বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, মুক্তি সংগ্রাম প্রভৃতি উত্তপ্ত পটভূমিতে তাঁর কাব্য-কবিতায় দেখা গিয়েছে প্রতিবাদ, স্বদেশ ও ভাষানুরাগ।

৬) পরিশ্রুত ভাষা ব্যবহার, কবিতায় নতুন নতুন ব্যাকরণের প্রয়োগ, নতুন সংবেদনশীলতা, অভিনব কলাকৌশল, ভবিষ্যৎ জীবনবোধের ইঙ্গিত, সময় বা স্বকাল চেতনা প্রভৃতি তাঁর কবিতার বিশেষত্ব। স্বয়ং কবির স্বীকারোক্তি—"... আমার কবিতা হয়ত আত্মকেন্দ্রিক ছিল। আমার কবিতা সে সময় প্রতিবাদী ছিল না। তবু আমার অবস্থান সবসময় ছিল বামপন্থার দিকে।... আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে মার্কসবাদী কিংবা কমিউনিস্ট বলি না। কারণ একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট হওয়া কঠিন।...কিন্তু হ্যা, আমি বরাবরই প্রগতির সপক্ষে আছি।"[৪]

৭) তিনি সময়ের মুখোমুখি কবি। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার; তাঁর জীবনে, কর্মে ও রচনায় আছে সমকালীন অভিজ্ঞতা, আঘাত ও সামাজিক দায়বদ্ধতা। তিনি দায়বদ্ধ কবি ও সময়ের ঋত্বিক।

৮) তাঁর কবিতায় দিনযাপনের ক্লান্তি, আত্মহননেচ্ছা প্রত্যক্ষভাবে আলবেয়ার কাম্যুর 'মিথ অব সিসিফাস' তথা অ্যাবসার্ডিটি তত্ত্বের আলোয় উদ্ভাসিত।

৯) শাসকশক্তি স্বদেশ ও মাতৃভাষা প্রেমীদের 'লাশ' বানাতে চায়; সেই লাশ সমাধিস্থ করার স্থান নেই বলেই কবির প্রশ্ন—"এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়?" মানবদরদী, আত্মোৎসর্গীকৃত মানুষ স্মরণীয় ও বরণীয় বলেই কবির আন্তরিক ঘোষণা—এ লাশ মাটিতে, পাহাড়ে বা সাগরে পড়ে থাকার নয়, হৃদয়ে রাখার, স্মৃতির সরণীতে শাশ্বত করে রাখা—

> "তাইতো রাখি না এ লাশ আজ
> মাটিতে পাহাড়ে কিম্বা সাগরে,
> হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই।"[৫]

১০) সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ-ধর্মান্ধতা-কুসংস্কার-স্বৈরাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে ক্লান্তিহীন-আপোষহীন সংগ্রাম, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সম্প্রীতি, নৈতিকতা, শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধ প্রভৃতির সার্থক প্রকাশ দেখা যায় তাঁর রচনায়।

১১) পরাধীন দেশের শাসন-শোষণ-পীড়ন জনিত বেদনা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রচনায়।

১২) বাঙালী, বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের প্রতি তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ঐকান্তিক আন্তরিকতা ও ভালোবাসা আছে বলেই তিনি পাকিস্তানী সেনানীর বর্বরতায় ও নারকীয়তায় ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত পটভূমিতে প্রতিবাদমুখর ভাষায় লিখেছেন—

> "দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে ঐ নয়াবাজার
> আমাদের চৌদিকে আগুন,
> গুলির ইস্পাতী শিলাবৃষ্টি অবিরাম।"[৬]

১৩) কবি 'ঝাকের কই' হয়ে গতানুগতিকতার চোরা-স্রোতে মিশে যেতে পারেননি, আত্মোপলব্ধিতে সত্যকেই বুঝে নিতে চেয়েছিলেন—

"কাজ করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, কাজ করছি,
খাচ্ছি দাচ্ছি, চকচকে ব্লেডে দাড়ি কামাচ্ছি, দু'বেলা
পার্কে যাচ্ছি, মাইক্রোফোনী কথা শুনছি,
ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাচ্ছি।"[৭]

মানবপ্রেমী স্বাধীনতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন—

"গলায় রক্ত তুলেও তোমার মুক্তি নেই।
হঠাৎ-আলোয় শিরায় যাদের আবির্ভাব।
আসবেই ওরা ঝড়ের পরের পাখির ঢেউ।"[৮]

আর 'দুঃস্বপ্নের একদিন' কবিতায় দেখা যায় তারই হৃদয়বিদারী শিহরণ, সখেদ-কাতর-দুঃস্বপ্ন—

"দোহাই আপনাদের, সেই পাখির
টুঁটি চেপে ধরবেন না, হত্যা করবেন না বেচারীকে।"[৯]

১৪) অত্যাচার-অনাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলে কবি বাঁচার অদম্য প্রয়াসের কথা বলেছেন—

"আমিও বাঁচতে চাই, চাই পড়ো-পড়ো বাড়িটাকে
আবার করাতে দাঁড়।"[১০]

১৫) তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের তপস্যা কখনো বিফলে যায় না। অনেক বলিদানের পর অবশ্যই স্বাধীনতা আসবেই—

"পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাঙলায়
তোমাকেই আসতে হবে, হে স্বাধীনতা।"[১১]

১৬) মাতৃভাষা প্রীতি তাঁর প্রাণের সত্তায় বিরাজমান—

"নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো
আমার সত্তায়।
মমতা নামের প্লুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড়
ঘিরে রয় সর্বদাই।"[১২]

১৭) ২১শের ভাষা আন্দোলনে হরতাল-পটভূমি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতায়—

"রাজপথ নিদাঘের বেশ্যালয়, স্তব্ধতা সঙিন হয়ে বুকে
গেঁথে যায় ; একটি কি দুটি
লোক ইতস্ততঃ
প্রফুল্ল বাতাসে ওড়া কাগজের মতো ভাসমান।"

হরতালের পরিণতিও প্রকাশিত হয়েছে এই কবিতায়—

"চকিতে বদলে গেছে আজ,
আপাদমস্তক
ভীষণ বদলে গেছে শহর আমার।"[১৩]

১৮) রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ প্রমুখের ঐতিহ্যের স্বীকরণে ও স্বীকৃতিতে তিনি এবং তাঁর কবিতা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছে। বাংলা ভাষা ও স্বাধীনতার মুক্তি প্রসঙ্গে তা স্মরণীয়—

"স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল, ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা—
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।"[১৪]

শামসুর রাহমানের কাব্য-কবিতা নিয়ে প্রথম গ্রন্থ-রচয়িতা কবি-প্রাবন্ধিক-সমালোচক হুমায়ুন আজাদ মন্তব্য করেছেন—"স্বাধীনতাকে তিনি সাজিয়েছেন নানা রঙে-রূপে-সুরে, আর সেই রঙ-রূপ-সুর তিনি সংগ্রহ করেছেন বাঙলার স্বপ্ন-নিসর্গ-জীবন থেকে ;"[১৫]

১৯) পরিবর্তিত যুগে যুবক-যুবতীদের উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা, বিপথগামিতা-জনিত কারণে পারিবারিক জীবনের মালিন্যে দিশেহারা হয়ে কবি জীবনের অভিশাপের দিকটিও এঁকেছেন—

"যুবকেরা আড্ডাবাজ, মেয়েরা আহ্লাদী প্রজাপতি,
মক্ষিরাণী, সংসারে কেবলি বাড়ে শিশুর বাহিনী।..."[১৬]

২০) মানুষের দুঃখ ও বন্দীদশা মোচনের কথা আছে তাঁর কথায়, কর্মে ও রচনায়। তাঁর কবিতায় আছে আন্তর্জাতিকতার স্পর্শ।

২১) কবিতা যে হৃদয়ের গভীর তলের রসাবেদন, তা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতায়—

"এই ইঁট সুরকির ভেতর যদি নিজেকে গুঁড়িয়ে দাও, তবে
হয়তো বা পেয়ে যাবে একটি কবিতা।"[১৭]

অথবা—"আমার মুখের রেখাবলী
তুলে নিতে পারো
নিজের মুখাবয়বে, তবে
হয়তো বা পেয়ে যাবে একটি কবিতা।"[১৮]

২২) তিনি মনে করতেন শুধু প্রচারধর্মিতা নয়, দায়িত্ব সচেতন দায়বদ্ধ কবিকে শিল্পীও হতে হবে এবং রচনায় শিল্পগুণ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। নিজেকে তিনি

'শিল্পের শহীদ' আখ্যা দিয়েছিলেন। শিল্পীকে সৎ, ধৈর্যশীল ও নিরলস পরিশ্রমী হবার কথা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কবিতায়—

"দেখছি ক'দিন ধরে গৃহিনীর হাতে তৈরি হচ্ছে অনুপম একটা চাদর।
সতত এবং অনলস যে অধ্যবসায়
শিল্পীকে সফল করে তারই যুগ্মতায়
সে একটা চাদর সেলাই
করলো ক'দিন ধ'রে।..."[১৯]

২৩) যুগচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অচলায়তনকে ভেঙে প্রগতিশীলতার প্রবর্তন ও স্থায়িত্ব দান করাকে তিনি কবি-শিল্পীর দায়িত্ব বলে মনে করতেন। তাঁর স্পষ্টোক্তি—"আমি কবিতার কাছে দায়বদ্ধ, সমাজের কাছে দায়বদ্ধ, আমি শিল্পের কাছে দায়বদ্ধ। আমার এই দায়বদ্ধতা থেকেই আমি লিখি।"

২৪) কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্তার অন্যতম আশ্রয়—উদ্দীপন বিভাব—

"আমার দিনকে তুমি দিয়েছ কাব্যের বর্ণচ্ছটা
রাত্রিকে রেখেছো ভ'রে গানের স্ফুলিঙ্গে, সপ্তরথী
কুৎসিতের ব্যূহ ভেদ করবার মন্ত্র আজীবন
পেয়েছি তোমার কাছে।..."[২০]

তিনি অকাতরচিত্তে বলেন—

"আমার মননে
রাবীন্দ্রিক ধ্যান জাগে নতুন বিন্যাসে
এবং মেলাই তাকে বাস্তবের তুমুল রোদ্দুরে
আর চৈতন্যের নীলে কতো স্বপ্ন-হাঁস ভাসে
নাক্ষত্রিক স্পন্দনে সর্বদা।"[২১]

২৫) কবি শামসুর রাহমান প্রেমের কবিও। তাঁর কবিতায় শাশ্বত প্রেমের বাণী যেমন আছে, তেমনি আবার যৌনতাও আছে। এপার বাংলার কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার প্রমুখেরা প্রকাশ্যে যৌনজীবন ও কর্মের অলজ্জ বর্ণনা দিয়েছেন, ওপার বাংলার কবি শামসুর রাহমানের মধ্যেও দেখা যায় সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারের পাশে যৌনতা ও প্রেমের যুগলবন্দী রচনা।

কবি শামসুর রাহমানের প্রেমচেতনা কখনো কখনো আবার স্বদেশচেতনার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। জন্মভূমিকে জননী ও প্রিয়তমা দুই রূপেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন—

"তোমার চোখ, তোমার কেশভার
ঝলসে ওঠে আমার চোখে শুধু।
কে আশাবরী শোনায় বারবার,
হৃদয়ে জ্বলে স্মৃতির মরু ধূ ধূ।
....
কিন্তু মেয়ে তোমাকে ভালোবেসে
হৃদয়ে চাই জন্মভূমিকেই।"[২২]

কিংবা কবি যখন বলেন—

"কখনো আমার মাকে কোনো গান গাইতে শুনিনি।
সেই কবে শিশু রাতে ঘুম পাড়ানিয়া গান গায়ে
আমাকে কখনো ঘুম পাড়াতেন কিনা আজ মনেই পড়ে না।"[২৩]

তখন বোঝা যায় কবি এখানে তাঁর মায়ের বিষণ্ন মূর্তিকে অবলীলায় ছড়িয়ে দিয়েছেন দেশমাতৃকার বিষাদকাতর ভাবকল্পের মধ্যে। কবি মা, মায়ের ভাষা ও স্বাধীনতা—এই তিনটি শব্দকে নতুন বাংলাদেশ গড়ার পেছনে অপ্রতিরোধ্য শক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কবির প্রেমচেতনা ক্ষুদ্র ব্যক্তিসীমায় আবদ্ধ না থেকে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সমস্ত দেশে ও মানবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বিশিষ্ট সমালোচক তরুণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

"ধরা-অধরা প্রেমে কবি তাঁর জন্মভূমিকে বরণ করেন। হৃদয়ভূমিতে অভিষিক্ত হয় সেই দেশ, সেই ভাষা, সেই নারী। এই মাটিতেই জন্ম নিয়ে কবি শেখেন বাঁচার মানে। প্রিয় নারীকে ভালবেসে বুঝে যান জীবনের মানে। তাঁর চিন্তায়, চেতনায় ও সত্তায় এভাবেই অভিন্ন হয়ে যায় প্রিয়তমা ও জন্মভূমি।..."[২৪]

কবি শামসুর রাহমান নিছক বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গের) কবিমাত্র নন, তিনি অখন্ড বাংলার কবি, তিনি সবার কবি, প্রিয় কবি। বিষয়ের বৈচিত্র্যে, অভিনবত্বে, স্বতঃস্ফূর্ততায়, সময় ও সমকাল সম্পর্কে প্রখর অভিনিবেশে তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থই সমাদৃত। তিনি বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের আত্মীকরণ অনায়াসে ঘটিয়েছেন যেমন, তেমনি তাঁর অবিরাম বিচিত্র প্রয়োগ-কৌশলে, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় চিন্তার ও অনুভূতির জগতে তা বিস্তৃতি ঘটেছে। ব্যক্তিগত কাব্য ও সামাজিক কাব্যের অসামান্য সমন্বয় ঘটেছে তাঁর কাব্যরচনায়।

কবি শামসুর রাহমান কেন দুই বাংলার জনখ্যাত কবি তা পরিস্ফুটনের জন্য আরও কয়েকটি কথা বলে আমাদের বক্তব্য আপাতত শেষ করা যেতে পারে—

১) তিনি কলাকৈবল্যবাদে বা কবিতা-বিলাসিতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। ঊষর ও সমকালে আক্রান্ত মানবিক মূল্যবোধের দায়িত্ব এড়িয়ে তিনি 'উটপাখি' জীবন কাটাতে পারেননি।

২) বাংলাদেশের কবিতায় যে এক পরম্পরাগত ধারার

জন্ম হয়েছে তার প্রধান ও অন্যতম প্রত্যক্ষ উৎস তাঁর কবিতা। তাঁর কবিতার অবিরল বৃষ্টিধারায় বাংলা কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে সিক্ত ও সরস হয়েছে এবং তাতেই নতুন কাব্যশস্য সৃষ্টির অনুকূল উর্বর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

৩) তাঁর কবিতায় প্রায়ই প্রতিধ্বনিত হয়েছে নতুন কণ্ঠস্বর। বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতায় পালাবদলের ভিত্তি-স্থাপয়িতা তিনিই। পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের গ্রহণ, আত্মীকরণ ও স্বনিষ্ঠতায় বিকশিত হবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি।

৪) মানবতার অপমান, বীরের আত্মোৎসর্গ, স্বৈরশাসকের উদ্ধত অনাচারে-অজাচারে তাঁর কণ্ঠস্বর নিয়ত উচ্চকিত হয়েছে জ্বালাময়ী কবিতার উজ্জ্বল চরণে।

৫) রাজনীতির কলুষতা ও ক্ষুদ্রতা-নীচতা থেকে দূরে সরে থেকেও তিনি জাতিকে দিয়েছেন এক বিরল নৈতিক নেতৃত্ব। ফলে মৌলবাদীদের অন্ধরোষের শিকার হয়েছিলেন তিনি বারেবারে। তিনি সর্বান্তঃকরণে চেয়েছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশ।

৬) তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীনতা—ব্যক্তিস্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ভাবনা ও লেখার স্বাধীনতা।

৭) তিনি কী লিখবেন, কেন লিখবেন, কাদের জন্য লিখবেন বা লিখছেন তা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন তাঁর কবিতায়।

৮) আধুনিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র শহরকে নিয়ে তিনি লিখলেও পল্লীপ্রকৃতির আবহ থেকে বিচ্যুত হননি।

৯) তিনি মনে করতেন সৃজনশীলতাই প্রতিভা এবং প্রেরণা হলো প্রস্তুতি।

১০) জীবনের সঙ্গে গূঢ় ও প্রত্যক্ষ অচ্ছেদ্য সম্পর্কের দলিল তাঁর কবিতা। অসাধারণ অকপট স্বচ্ছতায় তিনি নিজেকে উন্মোচিত করেছেন তাঁর কবিতায়।

'জীবনে মোহন মহান স্বপ্ন' প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আজীবন লিখে যেতে চেয়েছিলেন—"যদি বেঁচে যাই একদিন আরো/ লিখবো," মৃত্যুই তাঁকে সেই স্বপ্ন সার্থক হতে না দিলেও তিনি এখন পর্যন্ত যা লিখে গেছেন, তাতেই তিনি অবশ্যই কালে কালে মানুষের হৃদয়ে অমর প্রতিষ্ঠা পাবেন।

*১= 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা', "বন্দীশিবির থেকে," "শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা," দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৮৭

*২= 'গণশক্তি' ২৭শে আগস্ট, ২০০৬, রবিবার

*৩= বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ), আজহার ইসলাম, অনন্যা (বাংলাদেশ), পৃষ্ঠা-৮৪৪

*৪= সাক্ষাৎকার/বাংলা প্রগতি কবিতার নানা প্রত্যন্ত, নীতীশ বিশ্বাস ও মুকুলেশ বিশ্বাস সম্পাদিত।

*৫= 'এ লাশ আমরা রাখবো কোথায় ?' "নিজ বাসভূমে", "শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা", পৃষ্ঠা-৮২

*৬= 'তুমি বলেছিলে', "বন্দীশিবির থেকে", তদেব, পৃষ্ঠা-৯২

*৭= 'দুঃস্বপ্নের একদিন', "নিজ বাসভূমে", তদেব, পৃষ্ঠা-৮৪

*৮= 'আত্মজীবনীর খসড়া', "প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে", তদেব, পৃষ্ঠা-২০

*৯= 'দুঃস্বপ্নের একদিন', "নিজ বাসভূমে" তদেব, পৃষ্ঠা-৮৪

*১০= 'টেলেমেকাস', "নিরালোকে দিব্যরথ", তদেব, পৃষ্ঠা-৬৭

*১১= 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা', "বন্দীশিবির থেকে", তদেব, পৃষ্ঠা-৮৮

*১২= 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', "নিজ বাসভূমে", তদেব, পৃষ্ঠা-৭১

*১৩= 'হরতাল', "নিজ বাসভূমে", তদেব, পৃষ্ঠা-৭৭,৭৯

*১৪= 'স্বাধীনতা তুমি', "বন্দীশিবির থেকে", তদেব, পৃষ্ঠা-৮৮

*১৫= "শামসুর রাহমান ঃ নিঃসঙ্গ শেরপা", কবি হুমায়ুন আজাদ, ঢাকা, ১৯৮৩

*১৬= 'বাড়ি', "বিধ্বস্ত নীলিমা", তদেব, পৃষ্ঠা-৫৪

*১৭= 'একটি কবিতার জন্যে', "আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি",

*১৮= তদেব, পৃষ্ঠা-১১৬

*১৯= 'একটা চাদর', "নিরালোকে দিব্যরথ", তদেব, পৃষ্ঠা-৬১

*২০= 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', "রৌদ্র করোটিতে", তদেব, পৃষ্ঠা-৪৩

*২১= 'ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯', "নিজ বাসভূমে", তদেব, পৃষ্ঠা-৭৩

*২২= 'জন্মভূমিকেই', "যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে," তদেব, পৃষ্ঠা-২২৭, ২২৮

*২৩= 'কখনো আমার মাকে', "বিধ্বস্ত নীলিমা", তদেব, পৃষ্ঠা-৫৬

*২৪= "কবি শামসুর রাহমান", অধ্যাপক তরুণ মুখোপাধ্যায়, 'এবং মুশায়েরা', কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬২

পি বি শেলির কাব্য ও কবিতা 'ব্যর্থ দেবদূতের উজ্জ্বল ডানা ঝাপটানি'

অশোক পাল

সহ-শিক্ষক, বেড়ী-গোপালপুর আদর্শ বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগণা

পি বি শেলি : ঝড়ের পাখি

১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব সমগ্র বিশ্বের সচেতন মননে যে তুমুল তুফান তুলেছিল তা ইংল্যান্ডের দু-কূল ভাসিয়ে ইংরাজি সাহিত্যে এক নতুন জোয়ার এনেছিল। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী এবং তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ইংরেজ কবি-সাহিত্যিকদের আলোড়িত করেছিল। ফরাসি বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বের প্রধান তাত্ত্বিক রুশোর দর্শন রোম্যান্টিক যুগের কবি ব্লেক, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলেরিজ ও শেলির মত কবিদের প্রভাবিত করেছিল।

ফরাসি বিপ্লবের ঝোড়ো ভাবধারায় সবচেয়ে বেশি আলোড়িত হয়েছিলেন যে ইংরেজ কবি তিনি পার্সি বিশি শেলি। ফরাসি বিপ্লবের ঋত্বিক রুশোর ভাবতত্ত্ব, দার্শনিক গডউইনের বিপ্লবী তত্ত্ব ও প্লেটোর 'non-personal spirit of good' ইংরাজি কবিতার অগ্নিহোত্রি কবি শেলির জটিল মানস সংগঠনে সাহায্য করেছিল। স্ব-বিরোধী অথচ আদর্শবাদী কবি তাই স্বপ্ন দেখেছেন এক শোষণ-বঞ্চনাহীন সুখী সমাজের।

বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ

সামাজিক-রাজনৈতিক অনুশাসন, জড় বিশ্বাস ও গতানুগতিক সাহিত্যরীতি, যন্ত্রশিল্প-নির্ভর সভ্যতার অমানবিক নিয়ন্ত্রণ চূর্ণ করে ইন্দ্রীয়াতীত শুদ্ধতার প্রতীকী জগতে উত্তরণে ফরাসি বিপ্লবের ঝোড়ো উত্তেজনায় যে বাঁধন-ছেঁড়া কবিরা তাঁদের লেখনীকে শাণিত করেছিলেন কবি শেলি তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

সমকালীন যুগ-যন্ত্রণা, সামাজিক দুর্দশা ও শোষণ-পীড়ন প্রত্যক্ষ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা কবি শেলির ধূমায়িত বিপ্লবী চেতনাকে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গে পরিণত করেছিল। তাঁর 'The Revolt of Islam' কাব্যটি হলো অত্যাচারী শাসকদের দমন-পীড়নের হাত থেকে মানবমুক্তির মহান জয়গাঁথা। এই কবিতায় এক চরম অরাজক পরিস্থিতিতে ধর্মান্ধ শাসকগোষ্ঠীর প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কাহিনির নায়ক-নায়িকা Cythna ও তার ভাই Laon। চারিদিকে যখন দারিদ্র্য, মন্বন্তর-মহামারী, মানুষের মর্যাদা যখন ভু-লুণ্ঠিত, তখন ধর্মের নামে শাসকগোষ্ঠী 'বিধর্মী'দের নির্মমভাবে অত্যাচার করতে থাকে। এরকমই এক পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসে Cythna ও Laon। ধর্ম-ব্যবসায়ী পুরোহিতদের নির্দেশে তাদের পুড়িয়ে মারা হয়। কবি বিশ্বাস করেন, স্বাধীনতাকামী বীরযোদ্ধাদের মৃত্যুতে সব শেষ হয়ে যায় না, তাঁদের রক্তস্রোতে তৈরি হয় বন্ধনমুক্তির এক নতুন সোপান। এই কাব্যের মুখবন্ধে কবি শেলি নিজেই বলেছেন — "In the view of kindling within the bosoms of my readers a virtuous enthusiasm for those doctrines of liberty and justice."

শেলির কবিসত্তার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'Prometheus Unbound'-এ। গ্রীক নাট্যকার এসকাইলাসের কাহিনি অবলম্বনে রচিত এই নাট্যকাব্যে দেবরাজ জিউসের আধিপত্যবাদ, স্বেচ্ছাচার ও অপশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মানবসত্তার প্রতীক প্রমিথিউস গর্জে ওঠে। তাকে সমর্থন জানায় তার জননী আর্থ ও স্ত্রী এশিয়া। স্বৈরতন্ত্রী, পীড়নকারী শাসকের পতনের মধ্যদিয়ে সূচিত হয় বিপ্লব-প্রাণিত মানবাত্মার মুক্তির মহামূর্চ্ছনা। একই সুরের অনুরণন ঘটেছে 'Hellas', 'Queen Mab' ইত্যাদি কাব্যে।

বিপ্লবের নবালোকে ফ্রান্স যখন উদ্ভাসিত তখন ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিবিদ্‌দের শীতল প্রতিক্রিয়া ও নিস্তেজ নীরবতা কবিকে

ক্ষুব্ধ করেছিল। তাই তিনি লিখলেন —

"Last came Anarchy, he rode
On a white horse, splashed with blood;
He was pale even to his lips
Like death in the Apocalypse."
(The Masque of Anarchy)

রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়নে পীড়িত ইংল্যাণ্ডের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের প্রতি অভিমানহত কবি প্রশ্ন করেছেন —

"Men of England, wherefore plough
For the lords who, lay ye low?
....
Wherefore feed and cloth and save,
From the cradle to the grave,
Those ungrateful drones who would
Drain your sweat-nay drink your blood
(Song to the Men of England)

তাঁর 'England (1819)' কবিতায় শোষকশ্রেণির চরিত্রকে তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন —

"Rulers who neither see, nor feel, nor know
But leech-like to their fainting country cling
Till they drop, bleed without a blow."

এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিতে কবি উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন —

"Rise like Lions after slumber
In unvanquishable number
Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you
Ye are many – they are few."

কবির এই আহ্বান শুধু ভাবাবেগ নয়, তাঁর যুক্তি ও বিশ্বাস ও অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে আসা স্বাধীনতাপিয়াসী হৃদয়ের অকৃত্রিম।

পি বি শেলি ঃ স্বপ্নের ফেরিওয়ালা

প্লেটো-গডউইন কবি শেলির চোখে স্বপ্নের যে মায়াঞ্জন লাগিয়ে দিয়েছিলেন তা কবিকে করে তুলেছিল স্বপ্নবিলাসী। স্বপ্নচারী কবি তাই হয়ে উঠেছিলেন 'a poet of hope in despair'। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন একদিন এই সমাজের সমস্ত অত্যাচার-অনাচার, শোষণ-পীড়ন, বঞ্চনা-লাঞ্ছনা, আভিজাত্যগর্বী প্রাতিষ্ঠানিক বুর্জোয়া মনোভাব ধ্বংস হবে, গড়ে উঠবে ন্যায়-সাম্য ও সমৃদ্ধ এক নতুন পৃথিবী।

ভাবুক ও স্বপ্নদর্শী কবি শেলির কবিতায় তাই ধরা পড়ে এক অপার্থিব মেঘলোকের ছোঁয়া। সেই কারণেই কবি দুর্জয় মানবশক্তির আধার প্রমিথিউসের পরাজয় কল্পনাও করতে পারেননি। তাঁর স্কাইলার্ক তাই সাধারণ কোনো পাখী নয়, 'Epipsy chidion'-এর এমিলিয়াও রক্তমাংসে গড়া সাধারণ কোনো মানবী নয়। পার্থিব জগতের সীমায়িত গণ্ডির মাঝে অধরা মাধুরী। 'Ode to Autumn'-এর প্রকৃতি যেন আশাহত কবির মনচ্ছবি। 'Ode to the West Wind'-এ রোম্যান্টিক কবি যেন জীবনযুদ্ধে পরাজিত এক নায়ক যিনি জীর্ণ পাতার মত হাওয়ায় উড়ে চলেছেন। জীবনের পুষ্পকাননে গোলাপ তুলতে তিনি যেন ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। তিনি বলেছেন — "I fall upon the thorns of life! I bleed!". হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছে এই ক্ষত, বেদনা আর নিরাশাটাই সব —

'Our sweetest songs are those that tell us
saddest thought.'

পরক্ষণেই তাঁর মন পাড়ি দিয়েছে স্কাইলার্কের সঙ্গে —

"Higher still higher
From the earth thou springest
Like a cloud of fire
The blue deep thou wingest
And singing still dost soar and
Soaring ever singest."

এক স্বপ্নিল ভাবনায় পশ্চিমা বাতাস (West Wind)-এর 'wild spirit'-এর কাছে করুণ আর্তি জানিয়ে কবি বলেন —

"Drive my dead thoughts over the universe
Like withered leaves to quicken
a new birth!
....
Scatter, as from an unextinguished hearth
Ashes and sparks, my works among
mankind."

শেষ পর্যন্ত স্বপ্নের ফেরিওয়ালা কবি হিমমৃত্যুর মধ্যেও দেখতে পেয়েছেন আগামী বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ —

"Be through my lips to unawakened earth

The trumpet of a prophecy! O wind,
If winter comes, can spring be far behind?"

ব্যর্থ দেবদূতের ডানা ঝাপটানি

কবি শেলির কবিমানস আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্বে প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। মানবজীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা, মানবপ্রেমের অপূর্ণতা, সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়িত্ব, মরণশীল, রোম্যান্টিক কবিকে পীড়িত করেছে। তাঁর স্বভাব-অস্থিরতা, উদ্দামতা ও সুউচ্চ আদর্শবোধ একদিকে যেমন তাঁকে নবআনন্দে জাগ্রত করেছে, নবালোকে উদ্ভাসিত করে স্বপ্নবিলাসী করে তুলেছে, অপরদিকে বাস্তবের অভিঘাতে সেই স্বপ্নপূরণের অক্ষমতা ও ব্যর্থতা তাঁকে হতাশ করেছে, অব্যক্ত বেদনায় বিদীর্ণ করেছে। তবুও ম্যাথু আর্নল্ডের গগনবিহারী দেবদূত তাঁর উজ্জ্বল, অক্লান্ত ডানা ঝাপটে যাত্রা করেন নতুন আশার, তিমির বিদারী নবপ্রভাতের অরুণালোকে।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

1. English Literature its History – W J Long
2. Shelley's Major Poetry – C Baker
3. The Works of P B Shelley – The Words Worth Poetry Library
4. P B Shelley : An evaluation – Ramji Lall
5. ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস — কুন্তল চট্টোপাধ্যায়
6. ইংরাজী সাহিত্যের রূপরেখা — সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়।

ভ্রম সংশোধন

'এস টি এফ আই-এর আহ্বানে আগামী ২২শে নভেম্বর সংসদ অভিযানের' গুরুত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধ যা 'শিক্ষা ও সাহিত্য' সেপ্টেম্বর, ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে তার কয়েকটি ভ্রম সংশোধন করে নিচে দেওয়া হলো ঃ

- পাতা ১০৫১, কলম-২, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ লাইনের 'রাষ্ট্রকে' কথাটি বাদ দিয়ে পড়তে হবে।
- পাতা ১০৫২, কলম-১, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের চতুর্থ লাইনের 'বলা হয়েছিল' কথাটি বাদ দিয়ে পড়তে হবে। একই পাতায় ২য় কলমের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় লাইনে পড়তে হবে '৫০ শতাংশের কম'। আর তৃতীয় লাইনে পড়তে হবে '১০ শতাংশের কম' আর
- পাতা ১০৫৩, কলম-১, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের তৃতীয় লাইনের 'যথেষ্ট' কথাটি বাদ দিয়ে পড়তে হবে। ঐ পাতার কলম-১-এর পঞ্চম পরিচ্ছেদের চতুর্থ লাইনে '২০০১'-এর জায়গায় পড়তে হবে ২০০২।
- পাতা ১০৫৪ কলম-১, চতুর্থ পরিচ্ছেদের পঞ্চম লাইনে 'বিলকে'-এর জায়গায় পড়তে হবে 'বিলের'। একই পাতায় ২য় কলমের চতুর্থ পরিচ্ছেদের ১৭ নম্বর লাইনে 'এখন'-এর জায়গায় পড়তে হবে 'এমন' এবং পরের লাইনে দ্বিতীয়বার লিখিত 'তারা' কথাটি বাদ দিয়ে পড়তে হবে।
- পাতা ১০৫৭, কলম-১, তৃতীয় পরিচ্ছেদের চতুর্থ লাইনে বাক্যটি পড়তে হবে ঃ 'নিয়মিত পূর্ণ সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না'
- সম্পাদকীর দ্বিতীয় পাতার প্রথম লাইনে 'বিপন্ন শৈশব—একটি পর্যালোচনা'র স্থলে একটি 'জ্বলন্ত সমস্যা ঃ কিছু ভাবনা' পড়তে হবে।

সম্পাদক
শিক্ষা ও সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের শিশুপ্রেম : শিক্ষায়-গানে-কবিতায়

অসিতকুমার ভৌমিক
সহ-প্রধানশিক্ষক, উষুমপুর আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগণা

'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দেখতে কেমন ছিলেন?' — এমন প্রশ্ন যদি শিশুদের করা হয়, তাহলে তারা সমস্বরে উত্তর দেবে, — রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একমুখ সাদা ধব্‌ধবে দাড়ি-গোঁফওয়ালা অধিক বয়স্ক একজন মানুষ, যাঁর চোখ দু'টি ছিল অনেক বেশি উজ্জ্বল। বাস্তবিকই কবিগুরুর বার্ধক্যের সৌম্যকান্তি ছেলে-বুড়ো সবার কাছে সুপরিচিত। তার কারণ, কবির বয়স যতই বেড়েছে, ততই তাঁর রূপে এক মোহময় সৌন্দর্য ধরা দিয়েছে। তাঁর চোখ দুটিতে প্রকাশ পেয়েছে বহুমুখী ভাবনায় সমৃদ্ধ এক অপরূপ দিব্যভাব, আর তার সাথে অসীম মমতাভরা ভালোবাসার বৈভব। তাই আপাতদৃষ্টিতে কবিকে বৃদ্ধ মনে হলেও তাঁর অন্তরটি ছিল শিশুদের মতোই সজীব ও প্রাণোচ্ছল। হয়তো এ কারণেই শিশুদের কাছে কবি হয়ে উঠেছিলেন অতি আপনার জন। বড়োরা যখন কবিকে সমীহ করে পরম শ্রদ্ধাভরে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে চলতেন, শিশুরা তখন সব বাধা পেরিয়ে কবিকে আপন করে তাঁর সাথে দুষ্টুমিভরা হাসিখুশির কথায় মত্ত থাকত। আসলে, ছোটো বলে শিশুদের দূরে সরিয়ে রাখার যে মানসিকতা অনেক বড়োর মধ্যে দেখা যায়, কবির মধ্যে তা আদৌ ছিল না। তিনি শিশুদের 'ভবিষ্যতের সৃষ্টিকর্তা' জ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন। তাই শিশুদের কেউ অবজ্ঞা করলে কবি নিজের হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করতেন। শিশুর বিমর্ষ মুখ তাঁকে পীড়িত করত। হয়তো এ কারণেই কবির কাছে শিশুরা হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত আদরের, পরম ভালোবাসার এক একটি সম্পদ। কবির কাছে নিষ্পাপ শিশুরা অনাঘ্রাত ফুলের মতো মনে হতো। অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিতে শিশু আর ফুল ছিল পরস্পরের সমার্থক।

শিশুদের ফুলের মতো মনে করতেন বলেই রবীন্দ্রনাথ বলতেন, "অনেক যত্ন না করলে ফুলবাগান তৈরি হয় না। ফুল ফুটলেও তা রাখতে বা কোথাও তা পাঠাতে খুব যত্ন না করলে চলে না। অথচ শস্য বা বীজ বস্তাবন্দী করে রাখলেও কোনো ক্ষতি নেই ; যেমন তেমন করে অবহেলা করলেও আমাদের ক্ষতি হয় না ; আমাদের জন্য ভাবনা নেই। কিন্তু ওরা যে ফুল, ওদের সেবা চাই, স্নেহ চাই, যত্ন চাই। অথচ ফুলের মধ্যেই অরণ্যের সব ভবিষ্যৎ। শস্য-ফল-বীজ-ছাল-কাঠ — সবারই মূলে ওই সুকুমার ক'টি ফুল। তাদের অযত্ন করার অর্থই হলো আত্মঘাত।" আসলে, রবীন্দ্রনাথের মনটা ছিল শিশুমনের মতোই সরল ও কোমল। তাই শিশুরা তাঁকে ঘিরে গল্পে-গানে-কবিতায় নিজেদের মনের খোরাক খুঁজে পেত। এই কারণেই শিশুরা কবির কাছে বশীভূত হতো সহজেই। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে চীন-ভ্রমণের সময় হাংচাউ নামে একটি মনোরম হ্রদের তীরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে কবির অন্তরঙ্গতার কথা। দোভাষীর মাধ্যমে কবি দিব্যি বাচ্চাদের সাথে নানা গল্পে মশগুল হয়ে উঠেছেন। এমন সময় এক শিশু বলে উঠলো, 'আমরা ছোটো বলে বড়োরা কেউ তোমার কাছে আসতে দিতে চায় না। তাতে নাকি তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটবে!' একথা শুনে কবি জানিয়েছিলেন তিনি ছোটোদের সঙ্গ বেশি পছন্দ করেন। এটা যে নিছক কথার কথা ছিল না, তার পরিচয় কবি দিয়েছিলেন ঐ ছোটোদের একটি সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করার মাধ্যমে। কবি বলেছিলেন — 'আমি কিনা কবি, তাই ফুল ভালবাসি। এই যে আমি আজ তোমাদের মধ্যে বসেছি — মনে হচ্ছে যেন আজ ফুল বাগানের মধ্যেই বসে আছি। তাই খুব ভালো লাগছে। আমার দেশে শান্তিনিকেতনে তোমাদের মতো সব শিশুদের নিয়ে আমি কিছুকাল থেকে একটা ফুলের বাগান করেছি। সেখানে তোমাদেরও নিমন্ত্রণ রইলো। যদি কোনোদিন যাও, তবে দেখবে সেখানেও তোমাদের মতো নানান ফুলের দল দিনে দিনে ফুটে উঠেছে। তোমরাই তো সত্যিকার ফুল। তোমাদের জনে জনে নানা রঙের শোভা। তাই দেখছি আর মন খুশি হয়ে উঠছে। খুশি হচ্ছি, আবার তখনই মনে মনে উদ্বেগও হচ্ছে ফুল বড়ো সহজে নষ্ট

হয়, মলিন হয়। তাই উদ্বেগ হয় পাছে তোমরা নষ্ট হও বা মলিন হও। ফুল নষ্ট হলে ফল বীজ কিছুই হয় না। তোমরাই যে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। বড়ো দুর্দিন আসছে। তাই আশীর্বাদ করি ও প্রার্থনা করি যেন কিছুতেই তোমরা নষ্ট না হও। তবেই একদিন না একদিন তোমরা বড়ো হয়ে পৃথিবীকে সব দুঃখ দুর্গতি থেকে রক্ষা করতে পারবে।'

শিশুদের প্রতি কবিগুরুর এই আস্থা ও ভালোবাসা এবং একই সাথে তাদের জন্য দুর্ভাবনা বুঝিয়ে দেয় তাঁর মনোজগতে শিশুদের অবাধ প্রবেশের স্বাধীনতা ছিল। এইসব শিশু কোনো দেশকালের সীমানায় সীমাবদ্ধ ছিল না। যে কোনো দেশের শিশুদের মনকে তিনি সহজে আকর্ষণ করতে পারতেন। সেখানে ভাষার দুর্বোধ্যতা মেলামেশার পথে অন্তরায় হতো না। আসলে কবির মনটাই ছিল স্নেহময় শিশুর মতো। তাই দেশ-বিদেশের শিশুর দল সহজেই কবিকে কাছে পেতে পারত। এই যে পারস্পরিক অন্তরঙ্গতা, তা থেকেই কবির হৃদয়ে যে অনুভূতি জেগেছিল, সেই অনুভূতি দিয়ে কবি হয়ে উঠেছিলেন শিশুসাহিত্যিক। তাঁর কাছে শিশুসাহিত্য ছিল প্রকৃত অর্থেই সাধনার সম্পদ। শিশু-পাঠকদের মনোরঞ্জনে তাঁর কোনো ঘাটতি ছিল না। শিক্ষা ও আনন্দের সমাবেশে কবির লেখনী থেকে শিশুদের জন্য যে সৃষ্টিসামগ্রী বেরিয়ে এসেছে, তাতে কবিকে কেবল একজন সাহিত্যিক মনে হয় না, মনে হয় তিনি একজন শিক্ষকও। এই লেখক-শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ একসময় ভেবেছিলেন, তিনি ছোটোদের জন্য লেখায় বেশি সময় দেবেন। সেইমতো তিনি অন্তরে অন্তরে শিশুর দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়ে লিখেছিলেন কবিতা, ছড়া, সহজপাঠ, আর একের পর এক গান। এই সময়ে (১৯১৯) তিনি প্রমথ চৌধুরীকে এক পত্রে লিখেছিলেন, "...... যৌবন-মধ্যাহ্ন পেরিয়ে আমার আয়ু চিরশ্যামল শিশুদিগন্তের দিকে নেমেছে। আমার মনিব এসেছেন শিশু হয়ে, পুরস্কারও পাচ্ছি। তার কাছে শাস্তি অল্প, শান্তি যথেষ্ট ; কিন্তু ছুটি একটুও নেই। সেইজন্য এখান থেকে তোমাদের জয় কামনা করি, কিন্তু তোমাদের তালে তালে পা ফেলে তোমাদের অভিযানে চলব, এখন আমার সে অবকাশ নেই। আগামীকাল যারা যুবক হবে, আমি তাদের সঙ্গ নিয়েছি।"

রবীন্দ্রনাথ শিশুদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধে যে-সব গ্রন্থ লিখেছেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো 'সহজপাঠ', যা শিশুপাঠ্য রূপে পরিচিত। গ্রন্থটি দু'টি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে আছে ১০টি পাঠ এবং দ্বিতীয় খন্ডে রয়েছে ১৩টি পাঠ। প্রথম খন্ডে শিশুর বর্ণ-পরিচিতি, আর দ্বিতীয় খন্ডে শিশুদের ভাষাজ্ঞান সৃষ্টির প্রচেষ্টা। গ্রন্থটিতে মদনমোহন বা বিদ্যাসাগরের প্রাইমার-রীতি অনুসরণ না করে প্রাথমিকভাবে সাহিত্যরস সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুদের আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। 'সহজপাঠ'-এর গদ্যে চলিত রীতি অনুসৃত হয়েছে, আর কবিতায় আছে সাধু ও চলিতের সংমিশ্রণ। পরবর্তী সময়ের কাব্যেও রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য কবিরা এই মিশ্রণরীতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে 'সহজপাঠ'-এর গদ্যে ব্যবহৃত চলিত রীতি মানে কেবল ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্তকরণ নয়, একই সাথে আছে প্রচলিত সহজ সরল শব্দ, আছে গ্রাম-প্রকৃতির চিত্র। যেমন — কাক, ফল, মাঠ, ধান, খাল, ডিঙি, বক, মৌমাছি, মধু, মৌচাক, মাছ, মাছি ইত্যাদি। কবিতার ক্ষেত্রেও কবি গ্রামীণচিত্রকে তুলে ধরেছেন। যেমন — 'আঙিনায় কানাই বলাই/রাশি করে সরিষা কলাই/বড় বউ, মেজ বউ মিলে/ঘুঁটে দেয় ঘরের পাঁচিলে'। এছাড়া 'আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে' কবিতাতেও রয়েছে পল্লীর চিত্র। অবশ্য 'সহজপাঠ'-এ শহরের চিত্র একেবারেই নেই, তা বলা যায় না। আছে কলকাতার বর্ণনা, আর্মানি গীর্জার কথা ইত্যাদি। এই কারণে জনৈক সমালোচক বলেছেন, 'সাহিত্যের রস ও ভাবনায়, শিশুর আদিগন্ত প্রসারিত কল্পনা আর সীমাহীন আনন্দবোধ সহজপাঠ গতানুগতিক প্রাইমারও নয়, পাঠ্যপুস্তকও নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা কখনো দাবী করেননি। সহজপাঠ এদিক থেকে এক অভিনব শিশুসাহিত্য'। এই সহজপাঠ সম্পর্কে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এককালে বাঙালী ছেলেকে ভাষার রাজ্যে প্রবেশাধিকার দেন, আমাদের যুগে রবীন্দ্রনাথ ভাবের রাজ্যে, ছন্দের আনন্দলোকে শিশুর মনকে মুক্ত করিলেন"। এই কারণে 'সহজপাঠ' পাঠ্যপুস্তক হলেও শিশুমনকে তা গভীরভাবে আকর্ষণ করে।

শিক্ষা সম্পর্কে ভাবনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা ও সংযমকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। 'সংযম' বলতে তিনি 'আত্মপ্রতিষ্ঠা'কে বুঝিয়েছেন। আর 'স্বাধীনতা' মানে উচ্ছৃংখলতাকে বোঝাতে চাননি। অবশ্য শিশুদের আনন্দোচ্ছ্বাস বা উদ্দামতাকে আপাতদৃষ্টিতে উচ্ছৃংখলতা মনে হলেও রবীন্দ্রদৃষ্টিতে তা ছিল শিশুদের সহজ মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তাই তিনি শিশুদের শিক্ষায় 'সংযম' বলতে আনন্দপ্রকাশের মধ্যে সংযমকে বোঝাতে চেয়েছেন। এজন্য তিনি শিশুদের দুষ্টুমিকে কখনও শাসনের দ্বারা দমন করতে চাননি। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, কবি তাঁর বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের দুষ্টু ছেলেদের ক্ষমার সাথে অগাধ স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে বশ মানানোর পক্ষপাতী

ছিলেন। তিনি বুঝতেন, কঠিন শাস্তি দিয়ে বা রূঢ় তিরস্কারে শিশুদের অপরাধপ্রবণ মনকে কখনও সংশোধন করা যায় না। অনেকের ধারণা, শিশুরা 'আদরে বাঁদর হয়' ; কবি কিন্তু এ মতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর অভিমত ছিল, একগুঁয়ে দুষ্টু ছেলেদের কড়া শাসন করলে তাদের দুষ্টুমি বা একগুয়েমি বেড়ে যায় ; শাস্তি পাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলে শাস্তির জন্য ভয় বা লজ্জা আর থাকে না। এই কারণে কবি তাঁর বিদ্যালয়ে শিশুদের দুরন্তপনায় শাস্তিবিধানের বিরোধী ছিলেন।

এই শিশুদরদী মন নিয়েই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন শিশুসাহিত্য। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে তাঁর 'নদী' কবিতাটির কথা, যেখানে শিশুদের সাথে বড়োদেরও মনের খোরাক মেটানোর মতো অনেক বিষয় রয়েছে, আছে গুরুগম্ভীর বক্তব্যের পরিবর্তে পরিচিত পরিবেশের চিত্র। যেমন 'মেঘের উপর মেঘ করেছে/রঙের উপর রঙ,/মন্দিরেতে কাঁসরঘন্টা বাজল ঠঙ্ ঠঙ্'। অথবা — 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।' বলা বাহুল্য, এখানে শিশুর কথা নেই, কিন্তু শিশুদের ভালো লাগার চিত্র রয়েছে। কবি উপলব্ধি করেছিলেন, 'অন্তরের মধ্যে যে-শিশু আছে, তারই খেলার ক্ষেত্র লোক-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, যুক্ত করবার জন্যে'। — এই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'শিশু' এবং 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যের অধিকাংশ কবিতায়। এইসব কবিতায় শিশুদের প্রতি কবির নিবিড় সম্ভ্রমবোধ এবং অম্লান ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে। শিশুরা বয়সে অল্প হলেও তারা যে উপেক্ষিতের দলে নয়, সে কথাটাই রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন। এই কারণে 'বীরপুরুষ' কবিতাটি শিশুমনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। কবিতায় বীর ছেলে যখন তার মাকে বলছে, "এতলোকের সঙ্গে লড়াই করে/ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে।/আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে/বলছি এসে, 'লড়াই গেছে থেমে'।/তুমি শুনে পাল্‌কি থেকে নেমে/চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমার কোলে।/ বলছ, 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল,/কী দুর্দশাই হতো তা না হলে।" — তখন শিশুমনের বীরত্ববোধের সাথে তার অভিযানপ্রীতি এবং একই সাথে শিশু ও তার মায়ের নিবিড় ভালোবাসার সম্পর্কটি অনবদ্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে। জনৈক সমালোচক তাই সঠিকভাবেই বলেছেন — "খোকার বীরত্ব, ডাকাতদলের সঙ্গে তার একক যুদ্ধ আর সেই অবিস্মরণীয় বর্ণনার শেষে, তার পৌরুষের পুরস্কার হিসেবে মাতৃমুখের মিষ্টি চুম্বনটির যে বর্ণোজ্জ্বল উপস্থাপনা, তার কোনো তুলনা বাংলা শিশুসাহিত্যে আর নেই।"

শিশুদের ভালোবেসে তাদের জন্যে লেখালেখির ব্যাপারটি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা রবীন্দ্রনাথ বেশি করে উপলব্ধি করেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ভ্রমণকালে। তিনি বুঝেছিলেন যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির কারণে ওখানে ভোগের প্রাচুর্য থাকলেও ঐ ভোগবাদে নিমজ্জিত মানুষের মন, বিশেষকরে শিশুমন কিছুতেই তৃপ্ত হতে পারছে না। কবি অনুভব করেছিলেন, 'দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট আবিষ্কার করে তার চিত্তের জন্য এত বড়ো আকাশের ফাঁকাটা দরকার'। এই উপলব্ধি ও জীবনসত্য কবি মূর্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁর বিশ্বভারতীর জীবনধারার মধ্যে। নিয়মের কারাগারে শিশুর মন কখনও তৃপ্ত হয় না। সে পেতে চায় মুক্তির স্বাদ। এই মুক্তি কাজ এড়িয়ে নয়, 'কাজকে খেলা কিংবা খেলাকেই কাজে' রূপান্তরিত করে পাওয়া সম্ভব। তাই কবি 'শিশু ভোলানাথ'-এর প্রথম কবিতায় লিখেছেন — 'আপনি সৃষ্টিকে ধ্বংস হতে ধ্বংসমাঝে মুক্তি দিস্ অনর্গল,/খেলারে করিস রক্ষা, ছিন্ন করি খেলনা-শৃঙ্খল'।

আলমোড়া বেড়াতে যাওয়ার সময় রবীন্দ্রনাথ সাথে নিয়েছিলেন নন্দলাল বসুর আঁকা বেশ কয়েকটি ছবি, যেগুলি দেখতে দেখতে আপন কল্পনায় শিশুদের জন্য কবি লিখেছিলেন 'ছড়ার ছবি'। এই গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন, 'এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্য লেখা। সবগুলো মাথায় এক নয় ; রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয়নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর, ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে'। এই কাব্যের অনেক কবিতাই কাহিনিমূলক। এগুলিতে রয়েছে জীবনের কথা, মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কথা। কোনোটিতে রয়েছে আপসহীন ভাবনার কথা। যেমন, 'মাধো' কবিতার মাধোকে বিদ্রোহের মূর্ত প্রতীক হিসেবে কবি দেখিয়েছেন। কারখানায় মালিকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘটী শ্রমিকদের পাশে থেকেছে মাধো ; মালিকের সুবিধাবাদী প্রস্তাবকে সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে বলতে পেরেছে, '....... সাহেব আমি বিদায় নিলেম কাজে ;/অপমানের অন্ন আমার সহ্য হবে না যে।' বস্তুত এই ধরনের কবিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিশুমনে বিদ্রোহের বীজ বপন করতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন শিশুকাল থেকে ছেলেমেয়েরা যুক্তবাদী হোক্। এই লক্ষ্যে তিনি লিখেছিলেন ছোটোদের বিজ্ঞান শিক্ষার বই 'বিশ্বপরিচয়'। এই বইটি সম্পর্কে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে কবি লিখেছিলেন, 'শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভান্ডারে না হোক্, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক'। এই কারণে তিনি বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়কে শিশুদের বোঝার উপযোগী করে প্রকাশ করেছিলেন। কবির অভিমত ছিল, এতে তাঁর ভালোবাসার শিশুরা যেটুকু বিজ্ঞান শিখবে, সেটাই যথেষ্ট ; আর যে অংশ বুঝবে না, সে অংশ তাদের অভিভাবকরাই বুঝিয়ে দেবেন। তিনি বলেছিলেন, 'বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার'। আর এরজন্য তিনি পান্ডিত্য প্রদর্শনের বিরোধী ছিলেন।

শিশুদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসার মণিমুক্তো ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর লেখা অনেক গানে। কবির শৈশবকালে শিশুদের উপযুক্ত গানের অভাব ছিল। রূপকথা আর ছেলে-ভুলানো ছড়াই ছিল তখনকার শিশুদের একমাত্র সম্বল। শৈশবের সেই অভাববোধ থেকে তিনি শিশুমনে আনন্দ দিতে লিখেছিলেন গান। তাই তো আজকের শিশুরা গাইতে পারে ছুটির গান, আনন্দের গান, মুক্তির গান। এককথায়, 'সংগীত-মণি-মাণিক্যের অম্লান শতনরীতে' কবি শিশুদের কণ্ঠকে করেছেন সুসজ্জিত। এইসব গানে কবির শৈশবের না-পাওয়ার নানা কথাও সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। যেমন, কবির শৈশব ছিল ভৃত্যরাজতন্ত্রের কঠিন শাসনে গন্ডিবদ্ধ। কবি বড়ো হয়ে বুঝেছিলেন, যেকোনো শিশুর কাছে অমন শৈশব খুবই বেদনাবহ। তাই তাঁর গানে ধ্বনিত হয় বাঁধন টুটে মুক্ত হওয়ার তান। কবির নিজের শৈশবের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে একালের শিশুদের মধ্যে তিনি দেখতে চাননি। তাই শিশুদের কণ্ঠে দিয়েছেন শিশুমনের কথা — 'ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে,/তারে আজ থামায় কে রে......'। কবির শৈশবেও ছিল বাইরের জগতের প্রতি অপরিসীম আকর্ষণ। 'জীবনস্মৃতি'-তে তিনি লিখেছেন, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর 'মিলনের উপায় ছিল না ; তাই উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল'। এই আকর্ষণেই কবি লিখেছেন — 'হারে রে রে রে রে আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে —/যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে...'। প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা শিশুমনকে প্রলুব্ধ করে, তাকেই কবি নানাভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁর সংগীতের ঝর্ণাধারায়।

রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন, শিশুরা কোনো কাজে হার মানতে চায় না। শিশু যখন তার দু'টি টলমল পায়ে 'হাঁটি-হাঁটি পা-পা' করে এগিয়ে যায়, তখন বারে বারে অকৃতকার্য হলেও সে পরাস্ত হয় না। কারণ, সে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ডাককে অবহেলা করতে পারে না। শৈশবের ঐ সফল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কৈশোরকেও অনুপ্রাণিত করতে থাকে। তাই তো কবির কথাতেই সে গেয়ে ওঠে — 'সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।/বাধা বাঁধন নেই গো নেই.....'। খেলার প্রতি শিশুর সর্বাধিক আকর্ষণের কথা কবি জানতেন। তিনি বুঝতেন, খেলাই তাদের জীবনের মাঝে প্রাণের স্ফুরণ, খেলাই তাদের প্রাণের মাঝে আনন্দের ঢেউ। তাই তো শিশুরা খেলতে বড়ো ভালোবাসে। আর এই খেলার মধ্যদিয়েই কাজ করাকেও তারা সার্থকরূপ দিতে চেয়ে গেয়ে ওঠে — 'মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ জানিস্ নে কি ভাই!/তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।/খেলা মোদের লড়াই করা, খেলা মোদের বাঁচা মরা,/খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই.....'।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের গভীরতম স্তর থেকে আবিষ্কার করেছিলেন যে, শিশুমনের সবচাইতে কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি হলো তাদের ছুটির অবসর। শরতের আগমনে দেবী দুর্গার হাত ধরে আসে ছুটির রৌদ্র। বর্ষার বিদায়ের সাথে শরতের আগমনে ধরিত্রী যে সোনালি স্নিগ্ধতায় স্নাত হয়, তাতেই মিশে যায় শিশুদের ছুটির আনন্দ। এই আনন্দ উপভোগের সাথে শিশুমন গুনগুনিয়ে গেয়ে ওঠে — 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি। আহা, হা, হা, হা।/আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। আহা।/কী করি আজ ভেবে না পাই, পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,/কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে জুটি। আহা, হা হা হা......'।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরকে জানার সর্বোৎকৃষ্ট সহজতম মাধ্যম হলো তাঁর গান। কবি নিজেও তাঁর বিশাল সৃষ্টিসম্ভারের মধ্যে গানকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন — 'ফুলের দিনে দিয়েছি রচি গান/ সে গানে মোর জড়ানো প্রীতি/সে গানে মোর রহুক স্মৃতি/আর যা কিছু হউক অবসান'। তাই যখন আমরা দেখি তাঁর গানের পশরায় শিশুদের মনের কথাকে তুলে ধরতে অনেক গানের সমাবেশ, তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না শিশুদের প্রতি ভালোবাসায় তিনি কত বেশি আন্তরিক ছিলেন। এই আন্তরিকতার কারণেই তিনি শিশুদের মনের সাথে প্রকৃতির রঙ মিশিয়ে লিখেছেন বেশ কিছু গান, যেগুলির কথা যেমন মন-মাতানো, সুরও

তেমনি হয়েছে রঙ ধরানো। তাই চঞ্চলমতি শিশুরা আজও কবির গানের মধ্যে তাদের মনের আনন্দের খোরাক খুঁজে পায়।

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বুঝেছিলেন, হৃদয় এবং মন অর্থাৎ অনুভূতি আর বুদ্ধি যদি একত্রে বিকশিত হয়, তবেই শিশুদের মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করে। তাই তিনি কেবল পুঁথিসর্বস্ব বিদ্যার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে শিশুদের সুকুমার বৃত্তিগুলির যথাযথ পরিচর্যার জন্য উন্মুক্ত আকাশতলে উদার প্রকৃতির কোলে লেখাপড়ার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। এর প্রমাণ রয়েছে তাঁর শান্তিনিকেতনের বনমহোৎসব, বসন্তোৎসব, ঋতু উৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্যে, যে-সব অনুষ্ঠানে শিশুরা হৃষ্টচিত্তে অংশ নিতে পারত। আসলে, রবীন্দ্রনাথ শিশুদের কথা সবচেয়ে বেশি ভাবতেন বলেই তাঁর যাবতীয় পরিকল্পনায় বা সৃষ্টিসম্ভারে শিশুরা অনেকখানি জায়গা পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, '.....শিশুদের ওপরে তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) অগাধ টান। এমন কি যারা কিছু বোঝে না, সেই খুব কচি শিশুদেরও জন্যে কী লেখা যেতে পারে তাও তিনি ভাবেন। এ দেশের আগেকার আর কোনো কবির সম্বন্ধে এ কথা বোধহয় বলা যায় না ; কিন্তু কবিদের জীবন এইরকম হওয়া উচিত — রামধনুর সাতটি রঙের ভিতর দিয়ে তার গতি। সব বয়সের মানুষ নিয়েই কবিদের থাকতে হবে'। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন এবং নিশ্চিতভাবেই জেনেছিলেন, শিশুদের ছেড়ে কবি হওয়া যায় না। তাই তো তাঁর মননে ও সৃষ্টিতে শিশুপ্রেমের এত বর্ণময় সমাবেশ।

সদস্যবন্ধু এবং লেখক-পাঠকদের প্রতি

★ ২০০৫ সালের ২৬শে জুন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্যালয় ইউনিট থেকে জোন, মহকুমা, জেলা ও রাজ্য সব স্তরের কমিটি সদস্যদের 'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র গ্রাহক হতে হবে। এ বিষয়ে সবাইকে যত্ন নিতে হবে, নজর রাখতে হবে।

★ আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের সংখ্যাগুলি বিগত বছরের মতই যথাক্রমে 'নভেম্বর বিপ্লব' এবং 'কথা সাহিত্য' সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। উৎসাহী লেখকদের এই বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য লেখা পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে। লেখা পাঠানোর সময় লেখকবন্ধুদের পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি মেনে ফুল-স্কেপ কাগজের একদিকের পৃষ্ঠায় লিখে তার ফটোকপি (Xerox Copy) নিজেদের কাছে রেখে মূল লেখাটি পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

★ ফটোকপি, টাইপ অথবা ছাপা অক্ষরে লেখা এবং অন্যত্র প্রকাশিত লেখা না পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যদি পাঠান তাহলে ঘোষণা করতে হবে যে, আপনার ঐ লেখা অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য পাঠাননি।

সম্পাদক
শিক্ষা ও সাহিত্য

দন্ডদানের সীমানা ডিঙিয়ে সহানুভূতির অন্বেষণ

বাদল ভট্টাচার্য

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়ার প্রথা সনাতন। অতীতে পাঠশালার শিক্ষকরা নানা কারণে ছাত্রদের শাস্তি দিতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন প্রহার করলে ছাত্রদের অধ্যয়নশীলতা বাড়বে ও বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ থাকবে। গুরুমশাইদের এই মানসিকতা প্রাকৃতিক নিয়মের মত এতই পরিব্যাপ্ত ছিল যে তা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল — "Spare the rod and spoil the child" সে কালের গুরুমশাইদের নিষ্ঠুর আচরণ ছাত্রদের মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করত। দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় গুরুমশাই ও ছাত্রদের সেই সম্পর্ক উল্লেখ করে লিখেছেন **"ছাত্ররা গুরুমশাইকে যম স্বরূপ জ্ঞান করিতেন।"** শিক্ষার্থীর মনে ভীতির সঞ্চার হলেই তারা শিক্ষকের পাঠগ্রহণে সক্ষম হবে ও বিদ্যালয়ের নিয়মাধীন হবে, শিক্ষকের এই মনোভাবকে বিদ্রুপ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন **"ফোনগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত ও কতকটা পরিমাণে মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরী করা যেতে পারে।"**

আধুনিক শিক্ষার রূপকার পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর পাঠশালার জীবন থেকে দেখেছেন, সে কালের গুরুমশাইরা ছাত্রদের প্রতি কী রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন। তাই তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যাতে গুরুমশাইদের যম না ভাবে এবং শিক্ষকরাও যাতে ছাত্রদের অসহায় জীব না ভেবে মানুষ বলে মনে করেন সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। বিদ্যাসাগর জীবনীকার চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন — **"শিক্ষকগণের উপর আদেশ ছিল যে তাঁহারা বালকগণকে প্রহার করিতে পারিবেন না। মিষ্ট কথায় শান্তভাবে সকলকে বিদ্যালয়ের নিয়মাধীন করিতে বলিতেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, স্কুল বিভাগের শিক্ষকগণ সে নিয়ম পালন করিতেন না। আমাদের জনৈক বন্ধু সেকালে তাহার বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। অপর শিক্ষকগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ওই আদেশ পালন করিতেন না। তিনিও করিতেন না, প্রয়োজনমতো বালকগণকে প্রহার করিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুসন্ধান করাতে তিনি তাহা স্বীকার করেন। এই অপরাধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচারে তাহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়।"** ছাত্রদের আত্মমর্যাদায় আঘাত দিতে পারে, তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত হতে পারে, এরকম কোনো শাস্তি বা নিষ্ঠুর আচরণের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথও ছাত্রদের দৈহিক শাস্তি দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাশ্রমের ছাত্রদের দৈহিক শাস্তি না দেওয়ার নিয়ম চালু করেন। শান্তিনিকেতনের সূচনাপর্বে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব সে সময়ের শিক্ষকেরা সহজে মেনে নিতে পারেননি ; শিক্ষকদের নানা অনুযোগ তাকে শুনতে হয়েছে। দৈহিক শাস্তিদানের মধ্যে যে ক্রূরতা রয়েছে রবীন্দ্রনাথ তা বিলক্ষণ জানতেন। তাই তিনি লিখেছেন —**"আমার নিজের একটি স্কুল আছে এবং সেখানে ছাত্ররা নানা প্রকার অপরাধ করিয়া থাকে কারণ, অপরাধ করা ছাত্রদের এবং ক্ষমা না করা শিক্ষকদের ধর্ম। যদি আমাদের কেহ তাহাদের ব্যবহারের ক্রুদ্ধ ও ভীত হইয়া বিদ্যালয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় অসহিষ্ণু হন ও তাহাদিগকে সদ্যই কঠিন শাস্তি দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন, তখন আমার নিজের ছাত্র অবস্থার সমস্ত পাপ সারি সারি দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে থাকে।"**

অতীতের আচার্য কাহিনি কেবলই বেদনাবিধুর এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। আচার্যদের গৌরবের কাহিনিও প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। **"শাসন করা তারই সাজে,**

সোহাগ করে যে।" অতীতের শিক্ষকদের আন্তরিকতা, ভালবাসা, সহমর্মিতা ও স্নেহের যে ফল্গুধারা ছাত্রদের প্রতি বর্ষিত হত, তা আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আগ্রাসী ভোগবাদ ও আত্মসর্বস্বতার যুগেও অতীতের আচার্য কাহিনি শিক্ষানুরাগী মানুষের কাছে উজ্জ্বল ধ্রুবতারা। সম্প্রতি নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত আচার্য কাহিনির দ্রুত নিঃশেষিত হওয়া শুভ ইঙ্গিত বহন করে। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় দুটি আচার্য কাহিনি এই নিবন্ধে উল্লেখ করছি। অধ্যাপক প্রমথ নাথ বিশী উত্তরকালে শান্তিনিকেতনে তার ছাত্রাবস্থার উল্লেখ করে বলেছেন —"............শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের মারিবার নিয়ম ছিল না। কিন্তু কখনো যে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই এমন নয়। কখনও কোনো ছেলে মার খাইলেও কেহ কিছু মনে করিত না, কারণ শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যে যথার্থ স্নেহের সম্বন্ধ ছিল তাহাতে মারের দাগ মনের মধ্যে পৌঁছাত না।" শিক্ষকের অপার স্নেহের উল্লেখ করে তিনি যে চিত্র উপস্থিত করেছেন তা এমন — "জগদানন্দবাবু একটি ছেলেকে কিল না চড় কী যেন মারিয়াছিলেন। ইহার ফল জগদানন্দবাবুর পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া উঠিয়াছিল। জগদানন্দবাবুকে দেখিয়া আমরা ভয় করিতাম ; কিন্তু তাহার মনটি স্নেহ-ভালবাসায় পূর্ণ ছিল। তর্জন গর্জন যতই করুন, বর্ষণ কদাচিৎ করিতেন। সেই ছেলেটিকে মারিয়া তাহার মনে বড় কষ্ট হইল ; তিনি কিছুক্ষণ পরে তাহাকে ডাকিয়া তাহার হাতে খানকয়েক বিস্কুট দিলেন। উহাই তাহার কাল হইল। এই সংবাদ ছাত্রমহলে রটিবামাত্র তাঁহার কাছে মার খাইবার জন্য সকলেই উমেদারি আরম্ভ করিল। কিন্তু কি বিপদ! তিনি যে আর কাহারো গায়ে হাত তোলেন না! ছেলেটাকে জিজ্ঞেসা করিলাম, 'বিস্কুটের বাক্সটা তো দেখিয়াছিলে, কতগুলা ছিল?' সে বলিল 'বাক্স প্রায় ভরা'। চলো চলো, জগদানন্দবাবুর বাড়ির দিকে চলো। তিনি হয়তো তখন নিরিবিলি বসিয়া আকাশের গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া পুস্তক রচনায় নিযুক্ত, যে সব দূরগ্রহ তার দরজায় চপেটাঘাতের উমেদার হইয়া ধর্না দিয়েছে তাহাদের প্রতি কি তাঁহার মন আছে! অবশেষে হতাশ হইয়া নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে আমরা ঘরে ফিরিলাম।" অধ্যাপক বিশী যে ভাবে তাঁর শিক্ষক জগদানন্দ বাবুর চারিত্রিক মহত্ত্ব বর্ণনা করেছেন তার মূলে রয়েছে ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের স্নেহ, ভালবাসা ও সহানুভূতি।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায় 'ক্লাসে ভাল ছেলে ছিলুম'। গৃহশিক্ষক রাখার মত পিতার সংগতি ছিল না। স্কুলের হেডমাষ্টার জগবন্ধু ঘোষ মহাশয় তাঁর বাবাকে বলেন, "আপনার ছেলে এবার এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ভাল করবে, আমাদের নাম রাখবে, এই আশা করি। আপনি চিন্তিত হবেন না। পরীক্ষার তিন চার মাস বাকি আছে, আমি এখন থেকে রোজ সন্ধ্যায় ওকে দুই ঘন্টা ইংরাজি পড়াবো, সংস্কৃতটাও একটু দেখিয়ে দেবো। কোনো চিন্তা করবেন না। মাইনের কথাই নেই। ভাল করে পাশ করলে আমাদের সার্থকতা।"

তর্কবাগীশ গুরুমহাশয়রা তর্ক তুলে বলবেন, অতীতে পাঠশালায় শাস্তি দেওয়া হত বলে এখন ডেমোক্রেসির যুগে কি তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে? প্রশ্নটা অতীত ও বর্তমানের নয়। প্রশ্নটি শিক্ষাদর্শনের। অতীতের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ছিল মূলত গুরুনির্ভর। অতীতে শিক্ষকই ছিলেন শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু এবং বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রক্রিয়াই ছিল তাঁর ইচ্ছাধীন। তখন শিক্ষককে সমগ্র জ্ঞানের আধার হিসাবে বিবেচনা করা হত এবং তিনি তাঁর সেই জ্ঞানাধার থেকে ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করতেন। শিক্ষক যেভাবে যতটুকু জ্ঞান শিক্ষার্থীদের দিচ্ছেন, শিক্ষার্থীরা তা বিচার বিশ্লেষণ না করে গ্রহণ করত। শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকেরই ছিল পূর্ণ কর্তৃত্ব। ছাত্র কেবল নিষ্ক্রিয়ভাবে পঠন গ্রহণ করত। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক শিক্ষাবিদেরা শিক্ষাকে 'শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক' বলে বিবেচনা করেন। তাঁদের মতে শিক্ষার উপাদানগুলির মধ্যে শিক্ষার্থীর গুরুত্ব সবথেকে বেশি ; বিদ্যালয়, শিক্ষক ও পাঠক্রম এইসব উপাদানের সক্রিয়তা হবে শিক্ষার্থীভিত্তিক। এই ব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা হবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান আহরণ ও চরিত্র গঠন প্রক্রিয়াকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করা। অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষাদর্শনে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা চালকের নয়, সহায়কের।

প্রথাবদ্ধ শিক্ষা শুরু হয় বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষায়। এই স্তরে শিক্ষার্থীরা পরিবারের মধ্যে থেকে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে। এই বয়সে শিক্ষা শুরু হয় অনুকরণের মাধ্যমে। বয়স্কদের আচরণ শিক্ষার্থীরা অনুকরণ করে। প্রথমে এই অনুকরণ হয় অভ্যন্তরীণ, তারপরে বাহ্যিক। প্রখ্যাত মনোবিদ **J.R. Devitz & S. Ball** তাঁদের **Phychology of the educational process** বইয়ে উল্লেখ করেছেন *"The*

Generality of imitation in learning is obvious and extends from the acquisition of verbal behaviours in young children through the acquisition of skills relating to complex motor tasks." অনুকরণের দ্বারা শিক্ষার্থী সমাজে কীভাবে জীবনযাপন করতে হয়, কীভাবে শিষ্টতা প্রকাশ করতে হয় তাও শেখে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য 'Learning skill' বা 'শিখন দক্ষতা' অনুকরণ ছাড়া সম্ভব হয় না। আর বিদ্যালয়ে শিক্ষকই একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে শিক্ষার্থীরা তাঁর সামাজিক পদমর্যাদার জন্য সবসময় অনুকরণ করবার চেষ্টা করে, এবং তাঁর সবরকম বৈশিষ্ট্যই অনুকরণ করতে চায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবের পাঠশালার শিক্ষার অভিজ্ঞতার কথা উত্তরজীবনে লিখতে গিয়ে বলেছেন, **"ইহা বেশ দেখিয়াছি, শিক্ষকের প্রদত্ত বিদ্যাটুকু শিখিতে শিশুরা অনেক বিলম্ব করে, কিন্তু শিক্ষকের ভাবখানা শিখিয়া লইতে তাহাদিগকে কোনো দুঃখ পাইতে হয় না। শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে যে সমস্ত অবিচার, অধৈর্য, ক্রোধ, পক্ষপাতপরতা ছিল, অন্যান্য শিক্ষনীয় বিষয়ের চেয়ে সেটা অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলাম। সুখের বিষয় এই যে, কাঠের রেলিঙের মতো নিতান্ত নির্বাক ও অচল পদার্থ ছাড়া আর কিছুর উপর সেই সমস্ত বর্বরতা প্রয়োগ করিবার উপায় সেই দুর্বল বয়সে আমার হাতে ছিল না। কিন্তু যদিচ রেলিং শ্রেণির সঙ্গে ছাত্রের শ্রেণিতে পার্থক্য যথেষ্ট ছিল, তবু আমার সঙ্গে আর সংকীর্ণচিত্ত শিক্ষকের মনস্তত্বের লেশমাত্র প্রভেদ ছিল না।"** সুতরাং বাল্যস্তরে শিক্ষা তখনই সার্থক হবে যখন শিক্ষক তাঁর ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন নিজের কর্মকুশলতা, সমবেদনামূলক মনোভাব এবং জীবনাদর্শের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সতত প্রভাবিত করতে পারবেন। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে অনুকরণ যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, ঠিক তেমনি একটি কথা মনে রাখা দরকার, সব অনুকরণই সবসময় ভাল হয় না। শিক্ষার্থীরা যাতে সামাজিক ভাল গুণগুলি আয়ত্ত করতে পারে তারজন্য শিক্ষককে বিশেষ নজর রাখতে হবে এবং যে গুণগুলি শিক্ষার্থী অনুকরণ করেছে তা বিশ্লেষণ করবার শিক্ষাও যাতে তারা অর্জন করতে পারে সে দিকেও শিক্ষকের দৃষ্টি থাকা উচিত। এই স্তরের শিক্ষার্থী অনেক সময় সহপাঠীদের আচরণ অনুকরণ করে। শিক্ষার্থীদের এই আচরণকে উৎসাহিত করতে হবে কারণ, এই অনুকরণ যৌথ জীবনের বৈশিষ্ট্য। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দলবদ্ধভাবে থাকবার সুযোগ বেশি বেশি করে সৃষ্টি করা উচিত, যাতে তারা দলবদ্ধভাবে বাঁচার শিক্ষা আয়ত্ত করতে পারে। দলগত জীবনের ভাল দিকের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ জন্মায় তারজন্য শিক্ষককে উপযুক্ত শিক্ষণ কৌশল আয়ত্ত করতে হবে।

মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাল কৈশোর। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এত বেশি দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন হয় যে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। মনোবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ একে Strain & Strife-এর কাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বিখ্যাত মনোবিদ **Dorothy Rogers** তাঁর **The Psychology of adolescence** বইতে কৈশোরের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন— *"Adolescence, viewed as a socio-cultural phenomenon, is the period in his life when society ceases to regard a person as a child but does not yet accord him full adult status, role and function."* কৈশোরের শিক্ষার মূল কথাই হলো সহানুভূতি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে-সব ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে তাদের প্রায় সকলেই কৈশোরের স্তরের। 'ফ্যামিলি কালচার' থেকে ক্রমে ক্রমে 'পীয়ার কালচার' অর্থাৎ সমবয়সী সমাজে প্রবেশ করতে চায়। বয়সের এই পরিবৃত্তিকালীন সময়ে ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতার, সামাজিক নিরাপত্তার, আত্মপ্রকাশের, জ্ঞানের, দুঃসাহসিক অভিযানের, নৈতিক ও জীবনদর্শনের চাহিদা দেখা দেয়। পরিবারের জ্যেষ্ঠদের এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দায়িত্ব হলো কিশোরদের এইসব চাহিদাগুলিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে সঠিক পথে চালিত করা। ইংলন্ডে **Hadow Committee** কৈশোরের শিক্ষা সম্পর্কে দিক্‌নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন— **"কৈশোরের জোয়ারের মুখে জীবনতরী যদি ঠিকমতো পরিচালনা করা যায়, তা হলে তারা জীবনে ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে পারে।"** শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর পাঠে অমনোযোগ, চঞ্চলতা বা অবাধ্যতার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা কখনও কখনও শিক্ষার্থীদের শাস্তি অতীতেও দিতেন, এখনও দিয়ে থাকেন। এই ধরনের শাস্তির মূল উদ্দেশ্য থাকে শ্রেণিকক্ষে পাঠপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য শিক্ষার্থী যাতে শ্রেণিকক্ষের নিয়ম মেনে চলে এবং শাস্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর আচরণও যাতে সংশোধিত হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দণ্ডদানের অনুসৃত এই পদ্ধতি সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ সাধারণত শোনা যায় না, তবে যখনই এই শাস্তিদান সংশোধনের পরিবর্তে শিক্ষকের 'ব্যক্তিগত ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে চিহ্নিত হয় তখনই শিক্ষক-পদত্ত-শাস্তি

'বর্বরতা'য় পর্যবসিত হয় এবং মনুষ্যত্বের অপমান হয়। 'ছাত্র পাঠে মনোযোগী নয় বলে তাঁদের শাস্তি দিতে হয়' অতীতের এই একমাত্রিক বিশ্লেষণ আধুনিক শিক্ষাদর্শন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য কি? অতীতের ন্যায় শিক্ষার্থী আজ আর শ্রেণিকক্ষে 'নিক্রিয়' শিক্ষাগ্রহণকারী নয়। আধুনিক শিক্ষাদর্শন অনুযায়ী সে শিক্ষাপ্রক্রিয়ার 'সক্রিয়' উপাদান। শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষার অন্যান্য উপাদান, বিশেষত পাঠদানকারী শিক্ষকের দক্ষতা (শিক্ষণ কৌশল, বিষয় সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব) শ্রেণিকক্ষে পাঠে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের কতটা আকর্ষিত করছে তাও বিশ্লেষিত হওয়া জরুরি। কোঠারী কমিশন প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে তির্যক মন্তব্য করে বলেছেন— "......a majority of teachers teach mechanically and listlessly". এই প্রশ্নে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নির্মোহ আত্মানুসন্ধান বর্তমান সময়ের দাবী।

একই সমাজে স্বাচ্ছন্দ্যে পালিত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দারিদ্র্য ও ক্ষিণ্ণতার মধ্যে যে ছেলেমেয়েরা অস্বাস্থ্যে, বিরক্তিতে বড় হয়ে উঠছে, তাঁরা একই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। তাঁদের সকলের মানসিক গঠন ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোধ সবসময় সরলরেখায় চলবে এ কথা ভাবা উচিত নয়। অথচ তাঁরা একই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। সমাজে যেমন শ্রেণিবৈষম্য রূঢ় বাস্তব, বিদ্যালয়ে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রেও তার ছাপ পড়াই স্বাভাবিক। তাই বিদ্যালয়কে 'সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ' বলা হয়। সুতরাং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উচিত ছাত্রছাত্রীদের আচরণগত বৈসাদৃশ্যগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্লেষণ করা, এবং তদনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের সংশোধনের পন্থা-পদ্ধতি অনুসরণ করা।

সাম্প্রতিককালে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্র-ছাত্রীদের যে নিষ্ঠুরতম শাস্তি দিচ্ছেন তা মূলত পড়াশুনায় অক্ষমতা বা শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলাহীনতার কারণে নয়, শ্রেণিকক্ষের বাইরে আরোপিত শৃঙ্খলা রক্ষার নাম করে এই বর্বরতার প্রয়োগ হচ্ছে। যদিচ ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের সহানুভূতি ও স্নেহস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হন, তাহলে শিক্ষকরাও যে তাদের শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত হবেন, এই সাধারণ যুক্তিবিন্যাস কি দণ্ডদানকারী শিক্ষককুল হৃদয়ঙ্গমে অক্ষম? ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের নিয়মাধীন করার জন্য বা শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্য যাঁরা বর্বর দন্ডদান করছেন, কর্মক্ষেত্রে তাঁদের শৃঙ্খলা রক্ষার নজির কি গৌরীশৃঙ্গ? কেন মুষ্টিমেয় শিক্ষকের অবিমৃশ্যকারিতার দায় সমগ্র শিক্ষক সমাজকে বইতে হবে? যদিচ বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজে রূঢ়বাচনের চল নেই, তবুও সেই সংকীর্ণ চিত্তের শিক্ষকদের প্রতি ক্রোধে বিস্ফোরিত হয়ে বলতে হয় — আপনি আচরি ধর্ম, পরেরে শিখাও।

অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়, বিগত তিন দশক ধরে যে অগণিত ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় প্রবেশ করছে, তাদের এক বড় অংশের মাতাপিতৃপুরুষেরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম শোষণ বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। চরম দরিদ্রতার কারণে তাঁদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও ছিল অধরা। আজ তাঁদের ঘরের ছেলেমেয়েরাই দলে দলে বিদ্যালয়গুলিতে আসছে। এরা প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। পরিবারের আর্থিক অনটন ও পশ্চাদপদ সামাজিক কারণে এই শিক্ষার্থীরা বিত্ত ও বিদ্যায় উন্নত সামাজিক স্তর থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের মত দ্রুত পড়াশুনা আয়ত্ত করতে পারছে না। তাঁদের যেমন বাড়িতে পড়া বুঝিয়ে দেওয়ার কেউ নেই এবং আর্থিক অনটনের কারণে তাঁরা গৃহশিক্ষক রাখতে অক্ষম, তেমনি গৃহপরিবেশও তাদের শিক্ষার অনুকূল নয়। এই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনজনিত সমস্যাগুলি ধৈর্য্যের সাথে অনুধাবন করে শ্রেণিকক্ষেই তার সিংহভাগের সমাধান করে দিতে হবে। কর্তব্যবোধের তাড়নায় নয়, আন্তরিক ইচ্ছায় ও সমাজবোধের আনন্দেই শিক্ষকদের এই কাজ করতে হবে।

সমস্যা কেবল শুধুমাত্র প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের নয়, সমস্যা অন্যত্রও রয়েছে। অতীতে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের অভিভাবকেরা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের পঠন-পাঠনে সাহায্য করতে পারতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগান্তকারী পরিবর্তনের প্রভাবে পাঠক্রমের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে, ফলে এখন পিতামাতা বা অভিভাবকেরা আর তাঁদের সন্তানদের পড়াশুনায় বিশেষ সাহায্য করতে পারছেন না, কারণ ছেলেমেয়েদের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি তাঁদের অনেকের কাছেই অপরিচিত। ফলে পারিবারিক শিক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে অভিভাবকদের কর্তৃত্ব আগের তুলনায় সীমিত। এই সমস্যার সমাধানের জন্য সমাজের বিভিন্ন বর্গের অভিভাবক নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষের বিকল্প হিসাবে গৃহশিক্ষকের আশ্রয় নিচ্ছেন!

আমাদের রাজ্যে প্রতিবছর বিদ্যালয় স্তরে ছাত্রছাত্রী ভর্তির গড় ও প্রান্তিক বৃদ্ধির হার বেশ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে যে পরিকাঠামো বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল তা করা সম্ভব হয়নি। এখনও আমাদের রাজ্যে এককক্ষ

ও দু'কক্ষ-বিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ৮৮৭১ এবং ১৩,৬১৬টি। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত যথাক্রমে ৫২ঃ১, ৫৫ঃ১ এবং ৬৯ঃ১ অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরে ৫২জন ছাত্রপিছু ১ জন শিক্ষক, মাধ্যমিক স্তরে ৫৫ জন ছাত্রপিছু ১ জন শিক্ষক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ৬৯ জন ছাত্রপিছু ১ জন শিক্ষক রয়েছেন। আমাদের রাজ্যে ছাত্র-শিক্ষকের এই অনুপাত অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশ বেশি। শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এই অনুপাত একটি বড় অন্তরায়। শিক্ষাক্ষেত্রে একদিকে কেন্দ্রীয় বাজেট বরাদ্দের কার্পণ্য ও স্থবিরতা অন্যদিকে রাজ্য বাজেটের উল্টো রথযাত্রায় এই রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যাগুলি একটু একটু করে বাড়ছে। ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাতের ভারসাম্যহীনতা, শ্রেণিকক্ষ ও বিক্ষণাগারের স্বল্পতা, নৈমিত্তিক ব্যয়ের আকীর্ণ অভাব আমাদের রাজ্যে শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে সামান্য হলেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। এই সমস্যাগুলি রাজ্য সরকারের অজানা নয়। আমাদের স্থির বিশ্বাস, কেন্দ্র বৈরী হলেও শিক্ষাদরদী রাজ্য সরকার তাদের আর্থিক অনটন সত্ত্বেও এই সমস্যাগুলি দ্রুত নিরসনের জন্য সচেষ্ট হবে। ১৯৯২ সালে রাজ্য সরকার দ্বারা গঠিত শিক্ষা কমিশনের ১৯.১১২ নম্বর অনুচ্ছেদের সুপারিশ বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে চালু করা সম্ভব কি না তা বিবেচনা করা দরকার। কিন্তু যে-সমস্ত বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে উপযুক্ত পরিকাঠামো ও প্রয়োজনানুগ শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন সেই সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠনের মান যদি উন্নত না হয়ে অধোগামী হয় তাহলে সমাজ শিক্ষকদের দুয়ো দেবে। বিদ্যালয়গুলিকে সামাজিকভাবে আরও অর্থবহ করে তুলতে সরকার বিদ্যালয়গুলির পরিচালন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রীকরণ করেছেন। আশা করা গিয়েছিল নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে, পঠন-পাঠনের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবেন। তিনদশক পরে মূল্যায়ন করার সময় হয়েছে, সরকারের এই লক্ষ্য কতদূর সাফল্য পেয়েছে! নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের উন্নয়ন, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার ক্ষেত্রে যতটা সংবেদনশীল দায়িত্ববান হওয়া প্রয়োজন তারা তা করতে পেরেছেন কি?

ভুবনায়নের ঢেউ গোটা সমাজকে আন্দোলিত করছে। এই তথাকথিত ভুবনায়নের ফসল ভোগবাদের দাপটে মানুষের প্রচলিত মূল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায়বোধ, সামাজিক অবস্থান আজ বিলীয়মান। এই সংকট শুধু আমাদেরই দেশে নয়, এই মানসিক বৈকল্যের হাত থেকে নিস্তার পায়নি পশ্চিমি উন্নত দেশগুলি। একজন আমেরিকান ছাত্র নির্বিকার ভাবে বলতে পারছে—"গাড়িতে চাপা দিয়ে আমার দাদুকে মেরে ফেলতে পারলে যদি দশহাজার ডলার পাওয়া যায়, তবে আমি তা করতে রাজি।" এই আগ্রাসী ভোগবাদ আজ সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত। শিক্ষক-শিক্ষিকা যেহেতু এই সমাজেরই 'সামাজিক জীব', স্বভাবতই তারাও এই আগ্রাসনের শিকার। পরিবার ও সমাজ বিশ্লিষ্ট হয়ে আনন্দ সম্ভোগের মধ্যে দিয়ে জীবনকে উপভোগ করার যে জীবন দর্শন সমাজের বুকে কুচকাওয়াজ করছে, আর এই দর্শনের ফেরিওয়ালারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাফল্য ও বিত্তের মগ ডালে পৌঁছে দেবার জন্য নানান উপদেশবারি বর্ষণ করছেন — নিজের ভালর জন্য সমাজবিবেককে জীর্ণবস্ত্রের মত পরিত্যাগ করতে হবে, শাঠ্য শিখতেই হবে, অনৃতভাষণে দক্ষ হতে হবে। সমাজবিবেকের দিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সকলে না হলেও কেউ কেউ এই উপদেশামৃত তদ্‌গতচিত্তে পান করছেন। তোতাপাখির দেশ আমাদের। ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে আছি, কী জানি ওরাই হয়তো একদিন গর্বিত সাফল্যে বলবে— 'গোপাল বড় সুবোধ বালক, যা পায় তাই খায়।'

তথ্যসূত্র ঃ

১) রবীন্দ্র রচনাবলী
২) বিদ্যাসাগর : চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩) রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন : প্রমথনাথ বিশী
৪) আত্মকথায় ছাত্রজীবন : বারিদবরণ ঘোষ
৫) Phychology of the educational proces : J.R. Devitz & S. Ball
৬) The Phychology of adolescence Dorothy Rogers
৭) Report of the Education Commission, 1992, Govt. of West Bengal
৭) বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ : ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৮) Report of the Education Commission, 1964-66, Govt. of India
৮) প্রবন্ধ সংগ্রহ : অশোক মিত্র
৯) মেট্রোপলিটন মন — মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ : বিনয় ঘোষ
১০) Elementary Education in India – Where do we stand : Analytical report 2004, NIEPA
১১) Statistics of Sarba Siksha Abhiyan (SSA), Govt. of West Bengal - 2005.

আমাদের স্কুল তাহাদের স্কুল

দীননাথ সেন

ইতালির বারবিয়ানা একটি দূর জনবসতি। এখানে একটি স্কুল গড়িয়া উঠিয়াছিল, দেশভাগের পর পূর্ববাংলার মানুষ এবাংলায় আসিয়া ছ্যাঁচাবেড়া টালির ছাউনি দু'খানা ঘরকে স্কুল যেমন বানাইয়াছিল। বস্তুত স্কুল সংগঠনের এমন আশ্চর্য তৎপরতা ঐতিহাসিক।

বারবিয়ানার স্কুল তেমন পাকাপোক্ত কোনও স্কুল নহে, যেমন তেমন একটি স্কুল। এই স্কুলে পড়িয়াছিল এমন আটজন ছাত্রের লেখা একটি চিঠি—আপনাকে বলছি স্যার—পৃথিবীর অনেক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বইটির এমন একটি মর্মবাণী আছে যাহা মানুষকে প্রণোদিত করে, সামাজিক বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ করিবার বীণা বাদন করে। স্কুল এবং লেখাপড়ার গোড়ায় গলদটি কী? এবং সেটির প্রতিকারের কথা না ভাবিয়া কেবল এড়াইয়া যাইবার ও ধামাচাপা দিবার স্কিম ও প্ল্যানিং করিয়া যাইতে থাকিলে শিক্ষা সকলের জন্য না হইয়া কতিপয়ের জন্যই হইতে থাকিবে। বস্তুত শিক্ষার এই লক্ষ্য হইয়া যাইবে সংকীর্ণ ও স্বার্থপর।

এইরূপ শিক্ষা সমাজের বৃহত্তম অংশের নিকট অবাঞ্ছিত। অবশ্যই অমঙ্গলকর। একজন 'খারাপ' ছাত্র যখন 'ফেল' করিয়া স্কুল ছাড়ে তখন সে আসলে শিক্ষার পিঠে লাথি মারিয়া চলিয়া যায়। তাহার পরবর্তী কার্যসূচি তখন হইয়া উঠে শিক্ষাবিরোধী ও শিক্ষাবিধ্বংসী। বারবিয়ানা স্কুলের দৃষ্টান্ত শিক্ষাপরিকল্পক (এবং সমাজ সংগঠক) দিগকে গৃহীত কর্মসূচির পুনর্বিবেচনার জরুরি করিয়া তোলে।

বইটির বক্তব্যকে আমরা আমাদের শিক্ষার কাজে লাগাইতে চাই। বইটিতে আটছাত্রের চিঠির প্রাপকদিগের একটি প্রতিক্রিয়াও দেওয়া হইয়াছে। পত্রোত্তরের দুইটি কথা প্রায় আমাদের কথারও প্রতিধ্বনি হইয়া উঠিতে পারে। কথা দুইটি এই ঃ

একমাত্র একটা নিখুঁত স্কুলই পারে নতুন নতুন মানুষ, নতুন নতুন সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করতে। নিখুঁত স্কুল বলে কিছু হয় না।

বইটির অনুবাদক আমাদের জানাইয়াছেন — এই বইয়ের 'আমি' আটজন তরুণ লেখকের (যারা বারবিয়ানা স্কুলের ছাত্র ছিল) সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব, আর 'আপনি' হলেন ওই ছাত্রদের শিক্ষকবৃন্দের মিলিত সত্বা।

এই বইটিকে আমরা গুরুত্ব দিয়া দেখিতে চাই কারণ এ দেশে ও একালে পাওয়া যাইবে বারবিয়ানার সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা প্রাসঙ্গিক প্রতিচ্ছবি। শিক্ষা নিয়ামকদের গভীরভাবে যাহা বিবেচ্য হওয়া উচিত সেইটা হইল সমাজের দুই শ্রেণির মানুষের মতো দুই প্রকার স্কুলের দ্বন্দ্ব-বিরোধের ক্ষেত্র। পিছাইয়া পড়াদের আগাইয়া যাইবার উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টিও তাহাদের বিবেচ্য হওয়া জরুরি।

একপ্রকার স্কুল আছে যাহাদের সচ্ছলতা, চটকদার আধুনিকতা বারে বারে বুঝাইয়া দিতেছে ওইসব স্কুলের পড়ুয়াদের ঃ আমাদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হইবে "তাহাদিগকে' ডিঙাইয়া যাওয়া। বুদ্ধির জোরে বা মেধার জোরে কুলাইয়া উঠিতে না পারিলে টাকার জোরে ও ক্ষমতার জোরে কাজটি সম্পন্ন করিতে হইবে। 'তাহারা' অবশ্যই সাধারণ স্কুলের পিছাইয়া থাকা পড়ুয়ারা। কাজটি সুসম্পন্ন করিবার কৃৎকৌশল বিশেষজ্ঞগণ প্রণয়ন করিয়াছেন।

শিক্ষার বিভেদকে জিয়াইয়া রাখিবার কয়েকটি কর্মসূচি এইপ্রকার ঃ সমাজসেবা, যাহার মধ্যে থাকিবে পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ শহরের বস্তিতে। তবে কদাচ বলিবে না বস্তিগুলি বস্তি হইবার কারণ কিম্বা ওইগুলিকে উন্নত বাসযোগ্য স্থানে পরিণত করার কথা। বস্তি ঝুপড়ি রাখিয়া দেওয়া, আসলে তো বৈষম্যেরই লালন পালন। ফুটপাথবাসী ছেলেমেয়েদের সাক্ষরতা কর্মসূচি চাই, কিন্তু ওইসব ছেলেমেয়েদের জন্য রীতিমত অন্ন-বস্ত্র-আবাস-শিক্ষার আন্দোলনের কথা মুখেও আনিও না। যেন মুখ দিয়া বাহির না হয়—উহারা গরিব বলিয়াই আমরা ধনী।

ওই স্কুলগুলির দরজা এই শিশুদের জন্য বন্ধ। কীভাবে? সকলেরই ইহা জানা, তবু আর একবার মনে করা যাক। তার

আগে আবার একটু বারবিয়ানায় ফিরিয়া যাই যেখানে ছাত্ররা বলিতেছে—

১। একটা ঘরের মধ্যে পাঁচটি ক্লাস একসঙ্গে চলছে। তার মানে আমি পেয়েছি আমার প্রাপ্য শিক্ষার পাঁচভাগের একভাগ মাত্র।

২। আমার শিক্ষক তো আমার বাবা-মাকে বলেই দিলেন—মিথ্যে পয়সা খরচ করছেন এর পেছনে। মাঠে পাঠান ওকে, চাষ করে খাক। লেখাপড়া ওরজন্য নয়।

৩। এ কেমন স্কুল ? শিক্ষক নেই, ডেস্ক নেই, ব্ল্যাক বোর্ড নেই, বেঞ্চ নেই। কতগুলো বড় বড় টেবিল। তারই উপর পড়া।

৪। বই আছে নানারকম। কিন্তু প্রত্যেক বইয়ের একটা করে মাত্র কপি। ছেলেরা হুমড়ি খেয়ে সকলে মিলে পড়ছে সেগুলো।

৫। তাদের মধ্যে যারা বড় তারাই অন্যদের পড়াচ্ছে।

উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি হইতে আমরা বুঝিয়া লইতে পারি স্কুল বলিতে বোঝায় বারবিয়ানা তেমন কোনও স্কুল নয়। এটি শুরু করিয়াছিলেন পাদ্রি ডন লরেঞ্জো মিলানি। ফেলকরা এবং তিক্ত অভিজ্ঞতাবশত যাহারা আদপেই স্কুলে যায় না, মায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো আট-দশটি ছেলেকে লইয়া এই স্কুলের গোড়াপত্তন ১৯৫৪ সালে। ১৯৬৭ সালে মিলানির মৃত্যুর পর বারবিয়ানা বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু বারবিয়ানা কনসেপ্ট বাঁচিয়া থাকে। প্রাক্তন বারবিয়ানার ছাত্ররাই নতুন বারবিয়ানা শুরু করে। কাঠামো প্রায় একইরকম।

উপরিকাঠামোর চেহারা আমরা আঁচ করিতে পারি বারবিয়ানার। এইবার দেখা যাক স্কুলের ভিতরটা।

৬। সপ্তাহে ছ'সাতদিন, দিনে আটঘন্টা পড়া আর লেখা।

৭। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সমস্যাবলি নিয়ে অনুশীলন আর সে সব সমস্যার ভেতরে ঢোকার চেষ্টায় কাটে অনেকটা সময়।

৮। এখানে পরীক্ষায় নম্বর দেওয়া হয় না, পাশ-ফেল ব্যাপারটাই নেই।

৯। ভীষণ শৃংখলা আর তর্ক-বিতর্ক।

১০। যার বাড়িতে পড়ার পরিবেশ নেই, যে অলস বা পিছিয়েপড়া তাকে সবাই যত্ন করতে শুরু করত।

১১। ছুটি বলতে কিছু নেই। এমনকি রবিবারেও নয়। এতে কারো কোনো আপত্তি ছিল না।

১২। শিক্ষকও ভুল করত, কিন্তু তাতে ক্ষতি হত না। সকলে মিলে লেগে যেত সে ভুল শোধরাতে।

১৩। একসাথে সমস্যার সমাধান করতে পারলে সহমর্মিতা বাড়ে। মনে হয় অন্যের সমস্যা আমারও সমস্যা। একা একা সমাধান করা একধরনের স্বার্থপরতা।

উল্লিখিত সূত্রগুলি ক্লাশরুমের পঠন-পাঠনের প্রক্রিয়ার একটা আন্দাজ দিল। আমরা দেখিলাম এই স্কুলে ছাত্ররাই শিক্ষক। কোনো ছাত্রই ফেলনা নহে কারণ সকলেই ইহা সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে দুর্বলতম ছাত্রটি ন্যূনতম মানে উন্নীত হইবার পূর্বে কাহারও মান উন্নত হইল না। শিক্ষা তাই এখানে প্রকৃতই সর্বাঙ্গীন ও সর্বজনীন।

আমরা ইহাও বুঝিলাম একা একা কোনো সমস্যার সমাধান করিয়া ব্যক্তিগত বেস্টবয় হইবার গৌরব এখানে ধিকৃত ও পরিত্যক্ত। সকলে মিলিয়াই সমাধান এবং শিক্ষা ও সহমর্মিতা সহযোগিতা একাকার। বস্তুত চাইল্ডসেন্ট্রিক লার্নি কিম্বা পিয়ার লার্নিং প্রভৃতি এখনকার প্রক্রিয়া তখনই বারবিয়ানায় শুরু ও সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পড়াশুনার প্রতি অরুচি ও অনাগ্রহ জন্মিলে তখনই পড়ুয়া স্কুল-ছুট হইয়া থাকে, ছুটি হইলেই কারামুক্তির আনন্দ পাইয়া থাকে। বারবিয়ানা দেখাইয়া দিল স্কুল-ছুট পড়ুয়াই নিজের মতো করিয়া শিখিবার সুযোগ পাইবামাত্র শিক্ষার আঙিনায় এমনভাবে প্রবিষ্ট হইয়া যায় যখন শিখিবার আনন্দ আর ছুটির আনন্দে কোনো তফাৎ থাকে না। তাই বারবিয়ানার সবাই সপ্তাহে সবদিনই স্কুলে আসে। শিক্ষার লক্ষ্য এখানে নম্বর-পাশ-ফেল-প্রমোশনের মতো আবর্জনাতুল্য ধারণা নহে, শিক্ষা এখানে জানিবার কৌতূহল সৃষ্টি ও তাহার তৃপ্তি, শিক্ষা এখানে সমস্যার সম্মিলিত সমাধানের সাফল্য অর্জন। আমরা অতঃপর ইহা দেখিয়া লই শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক সম্বন্ধে বারবিয়ানার পোড় খাওয়া পড়ুয়ারা কী ভাবে।

১৪। আপনারা যেন আমাদের শত্রুপক্ষ। আমাদের ঠকানোই যেন আপনাদের কাজ।

১৫। আপনারা কঠিন কঠিন প্রশ্ন করে অবান্তর সমস্যা সাজিয়ে ছাত্রদের বিপদে ফেলেন কেন ? ছাত্রদের 'ভালো'র জন্য ?

১৬। জিয়ানি আর সানন্দ্রের বয়স বেড়ে যাচ্ছিল। তারা নিজে বদলাচ্ছে কিন্তু তাদের পাঠ্যবিষয় বদলাচ্ছে না। ফলে বিষয়গুলো ক্রমে তাদের কাছে নেহাত ছেলেমানুষি হয়ে পড়ছিল।

১৭। ভাষা তো সৃষ্টি করে গরিব মেহনতি মানুষ। তারপর চিরদিন সেই ভাষাকে নতুন নতুন সংযোজনে সমৃদ্ধ করে তোলে। আর, বড়লোকেরা কতগুলো নিয়মে সে ভাষাকে

বাঁধে, যাতে অন্যভাবে কথা বললেই 'ভুল ভুল' বলে তাচ্ছিল্য দেখানো যায়, অথবা ভাষাজ্ঞানের অভাবের অজুহাতে পরীক্ষায় ফেল করানো যায়।

এখন আমাদের প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থায়ও এই সমস্যাগুলি প্রকট। যিনি প্রশ্নপত্র রচনা করেন তিনি তাঁহার ভাষায় নিজস্ব উচ্চতর জ্ঞানবুদ্ধির নমুনা দেখাইতে যত আগ্রহী, কী জানিতে চাহিবার জন্য প্রশ্নটি রচিত সেটি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা থাকে না। ফলে ওই প্রশ্ন পরীক্ষার্থীর নিকট দুর্বোধ্য ও ভীতিপ্রদ হইয়া উঠে। তাহারা তখন মনে করে শত্রু তাহাদের নিপাত করিবার খেলায় মাতিয়াছে।

প্রশ্ন মানে তো সমস্যা। সেই সমস্যাসমূহ কীভাবে সমাধান করিতে হয় তাহা তাহাকে শেখানো হয় নাই। বড়জোর নোট বইতে অন্যজন যে সমাধান করিয়া দিয়াছে। তাহাই সে মুখস্থ রাখিতে পারে নাই। ফলে পরীক্ষায় তাহাকে বলা হইতেছে। তাহা করা আর সম্ভব হইতেছে না। ফলে ফেল। যাহা আগের কাজটি করা হয় নাই বলিয়াই পরের কাজটি সে করিতে পারিতেছে না। এবং ইহার নাম পরীক্ষায় ফেল, স্কুল হইতে ঘাড় ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিবার প্রক্রিয়া।

বস্তুত ইহা একটি চ্যালেঞ্জ অনগ্রসর পড়ুয়াদের নিকট। বারবিয়ানার পড়ুয়ারা দেখাইয়া দিয়াছে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা কীভাবে করিতে হয়।

বারবিয়ানার দৃষ্টিতে দেখিলে চোখে পড়িবে এ দেশেও ধনী-গরিব, বিদ্বান-মূর্খ, সফল-ব্যর্থ উৎপাদন করিবার প্রচুর কারখানা। এই কারখানার নাম স্কুল। এখানে যাহা হয় তাহার নাম শিক্ষা। কারখানার বাহিরেও প্রচুর ছেলেমেয়ে থাকিয়া গিয়াছে। ড্রপ আউট, আউট অফ স্কুল, পথশিশু, শিশুশ্রমিক প্রভৃতি নানা নামে ইহারা চিহ্নিত। ইহাদের দেখা যায় আস্তাকুঁড়ে, পথের ধুলোয়, বস্তি ঝুপড়িতে। ইহাদের কারো হাতে ভিক্ষাপাত্র, কারো মুখ অবাঞ্ছিত শ্রমের যন্ত্রণায় কাতর ; কেহবা অসামাজিক লালসার শিকার। মানবদরদি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ইহাদের দেখিয়াই আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন—

.....এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে/দিতে হবে ভাষা ;
এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে/ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

ওই আবেদন দেড়শো বৎসর পরেও আবেদনই রহিয়া গিয়াছে। গুরুভক্তরা কেহই 'মূকের মুখে ভাষা' দিতে পারেন নাই, 'ভগ্ন বুকে আশাও ধ্বনিয়া তুলিতে' পারেন নাই, অথবা পারিতে চাহেন নাই, কেবল রবীন্দ্রজয়ন্তীকে গম্ভীর গুরুভক্তিতে ভাসাইয়া দিয়াছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবর্তিত বিদ্যালয়ে তো নয়ই, শিক্ষাসত্রেও বীরভূম বোলপুরের 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে' ভাষা দিবার সুব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন এমন তথ্য নাই।

শিক্ষাবঞ্চিত ওইসব শিশু একবিংশ শতাব্দীতেও শিক্ষা প্রবর্তকদের হৃদয়কে তেমন টলাইতে পারিল না। অশিক্ষা নিরক্ষরতা যে পরাধীনতার জন্ম দেয় তাহা এইড্স হইতেও মারাত্মক। প্রতিবাদ বা আন্দোলনের কোনো কথা ইহারা ভাবিতেও পারে না। পারিলে ইহাদের মিছিল দেশের দীর্ঘতম মিছিল হইয়া শিক্ষার রক্তক্ষয়ী রণক্ষেত্র করিয়া দিত, চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারিত শিক্ষিত ভাগ্যবানদের ইহকাল পরকাল।

ফুটপাথে, পথের ধূলায় নির্বাসিত শিশুদের জননীরা কেবল তাহাদের জন্মই দিতে পারে, তারপর তাহাদের আর কিছু করিবার থাকে না আত্মজ শিশুর করুণতম পরিণতির সাক্ষী হওয়া ছাড়া। বাদ বাকি যাহা তাহা পরে হয় ও পরে করে।

মানবের এই অবাঞ্ছিত বিনাশপ্রক্রিয়া কেমন করিয়া সম্পন্ন হইতেছে সে বিষয়ে গবেষণা সম্মেলন-কমিটি প্রভৃতি যে সমস্ত কর্মকান্ড তাহা বুদ্ধিমানগণের অর্থোপার্জনের উপায় হইয়া উঠে। তাহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কাহারা তাহাদের দরিদ্র ও নিরক্ষর বানাইল তাহাদের চিহ্নিত করা বা তাহার অবসানের জন্য সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়া নহে, সেবা কোম্পানি গঠন করিয়া জনসেবার কেনাবেচায় তৎপর হওয়া। যাহারা দারিদ্র্য আর নিরক্ষরতার স্রষ্টা সেবা কোম্পানিগুলি তাহাদের বিরুদ্ধে ট্যাঁ ফুঁ করেন না, কারণ ইঁহারা উঁহাদের দ্বারাই কোনো না কোনোভাবে পোষিত ও পৃষ্ঠপোষিত।

শিক্ষা-কারখানার বাহিরের দৃশ্য দেখিতে দূরদৃষ্টি লাগে না। কিন্তু কারখানার ভিতরের দৃশ্য দেখাও জরুরি। আসুন ভিতরে উঁকি মারি।

এদিকে গরিব শিশুরা। তাহাদের একবেলা খাদ্যেরও জোগান দিতে হইতেছে, এতটাই অভাব তাহাদের ঘরে। তাহাদের জন্য চলিতেছে 'সর্বশিক্ষা'র ওপর চালাকি, নন-ফর্মাল শিক্ষার দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার প্রোগ্রাম, শিক্ষা যাহা 'উনো ভাতে দুনো বল' থিয়োরি। 'পথশিশুর শিক্ষা'র গোড়ার কথা শিশুকে আগে পথের ভিখারি বানাইয়া তাহাদের শিক্ষার সিন্নি বিতরণ, শিশুশ্রমিকের শিক্ষা আসলে সারাদিন অবৈধ হাড়ভাঙা খাটুনির পর শিক্ষার শিক্ষা প্রহসন। নিমন্ত্রিতদের ভোজনের শেষ রবাহুতদের জন্য যেন ভুক্তাবশেষ। তখন কাহারও মনেই থাকে না, কেহ স্বীকারই করিতে চাহে না যে সমাজের নীচুতলারা কোনো বহিরাগত নহে, তাহারাও স্বাধীন দেশেরই নাগরিক এবং দেশের সম্পদের সমান অধিকার

তাহাদেরও প্রাপ্য।

উপরতলারা এই সমস্ত বোঝেন না জানেন না তাহা নহে। তবে তাঁহারা এও জানেন নীচুতলা না থাকিলে উপরতলা থাকে না। তবে নীচ-উপর সমানতলে আনিবার প্রক্রিয়ায় আন্তরিক হইবার নামে উপরতলার হৃৎকম্প হয়। সেজন্য তাঁহারা নূতন দপ্তর ও বিভাগ বসাইয়া, পদাধিকারী হইয়া যে পরিকল্পনা ও রূপায়ণ করিতে থাকেন তাহাকে বড়জোর বলা যায় নীচতলার অসন্তোষ দমন-প্রকল্প। তোমরা আর একটু ভালো থাকো, তবে আমাদের সমান ভালো থাকিবার কথা যেন তোমাদের মনের কোণে স্থান না পায়। আবাসন, স্বাস্থ্য, খাদ্য, পরিবেশের মতো শিক্ষার ক্ষেত্রেও সুযোগের সমানাধিকার কখনই বাঞ্ছিত বা ন্যায্য হইতে পারে না — এই দর্শন আর্যযুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তবু বলিতে ও লিখিতে হইতেছে — মেরা ভারত মহান।

বেসরকারি বুদ্ধিমান এন জি ও-রা আরও ধূর্ত। তাহাদের দারুণ অফিস টফিস, প্রশ্নাতীত আচরণবিধি, বহুবর্ণ বাজেট রিপোর্টের ফিরিস্তি, সাফল্যের বার্ষিক খতিয়ানের চোখ ধাঁধানো নথি। দেখিলে মনে পড়িয়া যায় তোতা কাহিনির রাজার শালা-মামা-পন্ডিত-স্যাঁকড়া প্রহরীদের কথা। খাঁচার তোতাদের অবস্থার তেমন কোনো অদল-বদল হয় না। নিরক্ষরতা, অন্নাভাবের পর্বত এতটুকু টলে না—তাহার রিপোর্ট তাঁহারাই দাখিল করেন জাতিসংঘের অধিবেশনে, আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনে, হয়তবা এ বাবদে আন্তর্জাতিক অনুকম্পা ও দান খয়রাত পাইবার আশায়।

তবু ধনী দেশ গরিব দেশের এন জি ও-দের মুক্ত হস্তে দান করিয়া থাকেন। কারণ গরিব খেপিয়া উঠিলে ধনীর নাভিশ্বাস উঠে। ইহা পৃথিবীর প্রামাণ্য ইতিহাস। সেজন্য এই বিপদ হইতে মুক্ত রাখিবার ও মুক্ত হইবার যাবতীয় কৃৎকৌশলের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন, নীরবতার সংস্কৃতিকে অব্যাহত রাখিবার বিশেষজ্ঞ পরামর্শ। উন্নত দেশের উৎপাদিত দ্রব্যাদি ক্রয়ক্ষমতা বাড়িবার জন্য যতটা শিক্ষা আবশ্যক ঠিক ততটুকুই বড়জোর বাড়িতে থাকুক, তার অধিক নহে। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য দুই-চারিক হাজার ডলার ঢালিতে ক্ষতি কী? বিনিময়ে দুই-চারি লক্ষ ডলার যে পাওয়া যাইবে।

সরকারি ও সরকারি পোষকতায় বিধিবদ্ধ বিদ্যালয়গুলিও কী এমন হাতি ঘোড়া? দিল্লির সি বি এস ই, আই সি এস ই তো কেবল পরীক্ষাগ্রহণ ও সার্টিফিকেট বিতরণের বড় বাজার। এখানে ধনীর মাঝারি/দুর্বল মেধার সন্তানগণ বিদ্যা ক্রয় করিবার জন্য আসেন কেন-না এখানে বিদ্যা ক্রয়যোগ্য পণ্য। কোনোমতে একটি সার্টিফিকেট ও ইংরেজি বুলি রপ্ত করা, তৎপর স্বদেশের প্রতি কাঁচকলা প্রদর্শন করিয়া বিদেশ হইতে ফোরেন বিদ্যাক্রয় ও সমাজের কেউকেটা হইয়া বসা—এই লক্ষ্যেই ধাবিত ইহাদের ভূত ভবিষ্যৎ।

এদেশের অল্পবিত্ত ও মাঝারি বিত্তের জন্য রহিয়াছে সরকার-পোষিত বিদ্যালয়গুলি। সরকারি সচ্ছলতা সীমাবদ্ধ, তাই এই বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার আয়োজন অপ্রতুল। কিন্তু এখানকার শিক্ষকদের অনেক কিছুই আছে। আছে ভালো বাঁধা বেতন, চাকরির নিরাপত্তা, পেনসন এবং একটি মজবুত সংগঠন।

কেবল ইহাই নহে, অনেকেরই আছে শিক্ষা পরিচালনার গভীর জ্ঞান ও চমৎকার শিক্ষণ পদ্ধতি। আছে পিছাইয়া থাকাদের প্রতি অকৃত্রিম আন্তরিকতা। বস্তুত এই উন্নত চরিত্রের শিক্ষকগণই গড়িয়া তুলিয়াছেন একটি সচেতন, প্রগতিশীল, উদারচিত্ত বাঙালি সমাজ। চিরকাল ইহারা স্মরণীয় ও বরণীয়।

কিন্তু বাকি অংশ?

বারবিয়ানার ছাত্রদের মতই তাঁহাদের নিকট আমাদের অনাদৃত অবহেলিত পড়ুয়াদের কয়েকটি প্রশ্ন এভাবেই উঠিয়া আসে :

—স্যার, আপনি আমাকে ভালো করিয়া চিনিতে চেষ্টা করিয়াছেন? আমি কোথায় থাকি, কেমন করিয়া আমাদের সংসার চলে এসব জানেন কি?

—স্যার, হাজিরা খাতায় আমার নামের পাশে যে সংখ্যাটা আছে সেটিই তো দিনে একবার আপনি ডাকেন। আমার নাম তো ডাকেন না। আমার নাম বোধহয় আপনি জানেনই না স্যার।

—আমি কোনোদিন ক্লাসে সামনের সারিতে বসি নাই। আমাদের মতো যাহারা তাহারা ধরিয়াই লইয়াছি স্যারের কাছাকাছি বসিবার অধিকার কেবল ভালো ছেলেদেরই। আমরা বরাবর পিছনেই পড়িয়া থাকি সসংকোচে সমাজে ও স্কুলেও। দু'একবার আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া কীরকম জড়োসড়ো হইয়া গিয়াছি। আপনি নিতান্ত তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া ও নির্দিষ্ট জন্তু জানোয়ারদের সঙ্গে এক করিয়া দেখাইয়া হেনস্থার একশেষ করিয়াছেন।

—স্যার, আমরা যে কত খারাপ সেটাই কেবল আপনি বলিয়াছেন, বলিয়াছেন আমরা কিছু জানি না, আমাদের দ্বারা কিছু হইবে না। এইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন আপনি। সুতরাং ফেলই কেবল করিয়া গিয়াছি। এবং কিছুদিন

পর স্কুল হইতে বিতাড়িত হইয়াছি। আমিও লেখাপড়া নামক নির্যাতন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি।

—স্যার, কত আশা করিয়া আসিয়াছিলাম আপনার কাছে। লেখাপড়া শিখিব, আপনি পিতার শাসন ও উৎসাহ দান করিয়া আমাকে মানবরূপ সম্পদ করিয়া তুলিবেন!

—স্যার, সেই আশা পূরণ হইল না, হইবার আশাও নাই। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাবা সেদিন আমাকে বলিয়াছিলেন — আমরা মুখ্যু সুখ্যু, আমাদের বাপ-ঠাকুরদা কেবল স্কুলের ভাঙা সারাইয়াছে, স্কুলে ভর্তি হইতে পারি নাই। তুই তো তবু ভর্তি হইয়াছিস, দুই-চারিটা বই খাতা নাড়াচাড়া করিয়াছিস। ইহার অধিক আর কপালে নাই। কী আর করিবি? সবই ভাগ্য।

—স্যার, আমিও ধরিয়া লইলাম চেষ্টা, যত্ন, ইচ্ছা ছাড়াও আরও একটা জিনিস লাগে লেখাপড়া শিখিবার জন্য, যাহা আমার নাই, তাহা কপাল।

—তবে স্যার, এখন আমার দু'একটি কথার জবাব আপনি যদি দেন তাহা হইলে আমরা আমাদের ভাগ্য অদৃষ্ট সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি।

—আমরা কী কী জানি না তাহাই তো কেবল দেখিয়াছেন। কিন্তু কী কী আমরা জানি তাহা আপনি জানিবার কি চেষ্টা করিয়াছেন? কেন করেন নাই?

—স্যার, আপনাদের কাজ কি কেবল ভালো ছেলেদের ভালো করা? তাহা হইলে খারাপ ছেলেদের জন্য শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নাই?

—স্যার, সরকার কি নির্বাচিত ছেলেদের শিখাইবার জন্য আপনাদের নিযুক্ত করিয়াছেন? আমরা তাহা হইলে যাইব কোথায়? আমরাও তো এ দেশের নাগরিক।

—স্যার, আপনি কেবল কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিয়া আমাদের ঠকান। ক্লাশ যেন যুদ্ধক্ষেত্র আর এখানে আমরা যেন আপনাদের শত্রুপক্ষ এবং আমাদের পরাজয়েই আপনাদের সাফল্য! ইহা কি আপনারা শিক্ষার স্বার্থে করিতেছেন?

—স্যার, সকলের জন্য শিক্ষা কি আপনি সমর্থন করেন না? যদি করেন তাহা হইলে সেই 'সর্ব' হইতে আমরা বাদ পড়ি কেন?

—স্যার, মনে হয় আপনি অনেক পন্ডিত, অনেক কিছুই জানেন। কেবল জানেন না খারাপ ছেলেদের কী করিয়া শিখাইতে হয়। তাহা হইলে আপনাকে যোগ্য শিক্ষক বলা হইবে কেন? কেনই বা অযোগ্য শিক্ষক আদৌ নিযুক্ত হইবেন? দোষ হইলে ক্ষমা করিবেন।

—স্যার, আপনিই কেবল সারাক্ষণ বলিয়া যান, বকিয়া যান। আমাদের তো মুখ খুলিতেই দেন না। যে প্রশ্ন আপনি করেন সে প্রশ্ন বাজারের নোট বইতে আছে, যে উত্তরে আপনি সন্তুষ্ট সে উত্তরও নোট বইতে আছে। তাহাই যদি আপনার শিক্ষাদানের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে আপনার পড়াইবার দরকার কী? সব ছাত্রকে একটি করিয়া নোট বই দিলেই তো কাজ হইয়া যায়। দোষ হইলে ক্ষমা করিবেন।

—স্যার, আপনি যখন পড়িয়াছেন সেই সময় হইতে এখনকার সময়ের তো অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। অথচ আপনার ধারণা আপনার পড়ানোর রীতি একচুলও বদলান নাই। কেবল আপনার পোশাক বদলাইয়াছে, আপনার হাতে মোবাইল ঘুরিতেছে কারণ আপনার হাতে টাকা আসিয়াছে কারণ আপনার মাহিনা ভালো এবং টিউশানির কালো টাকাও বিস্তর আসিতেছে। শিক্ষক হিসাবে আপনি কিন্তু মান্ধাতার আমলেরই রহিয়া গিয়াছেন। নূতন কিছুকে আপনি ভয় করেন। দোষ হইলে..........।

—স্যার, আপনার উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে, ততই আমাদের অবনতি হইতেছে। তাহা হইলে কি বুঝিব যে টাকাই আপনার লক্ষ্য, মাস্টারি আপনার হাতের পাঁচ মাত্র। দোষ হইলে..............

—স্যার, মনে হয় এখন আপনার মাস্টারি না করিলেও চলে। তাহাই করুন স্যার, স্কুল ছাড়িয়া দিয়া কোচিং-এর কালো বাজারিতে নামিয়া যান। আপনার জায়গায় আসুন সেই শিক্ষক যিনি এক বুক ভালোবাসা ও শেখা-শেখানোর আধুনিক কৃৎকৌশল সাধ্যমতো প্রয়োগ করিবেন, আমাদের দিয়া হাতেকলমে করাইবেন। আমরা যাহা যতটুকু জানি তাহার স্বীকৃতি দিবেন, আমাদিগকে সম্মান করিবেন। তিনি শিখাইবেন না, আমরাই শিখিব—একজনে না হইলে অনেকে মিলিয়া শিখিব। তাঁহার আন্তরিকতায় যত্নে, পরিশ্রমে স্কুল হইয়া উঠিবে আমাদের সর্বক্ষণের আকর্ষণ। আপনারা যান স্যার, তাঁহারা আসুন।

এসো বাঁধি সেতু মিলনের ঃ দ্বিতীয় তরঙ্গ

অরুণ চৌধুরী

সংস্কৃতির সমন্বয়কে উপজীব্য করে হালে একটা নিবন্ধ লিখেছি। আজকের প্রসঙ্গও তাই। তবে, ঐ নিবন্ধের বক্তব্যকে সংক্ষেপে রেখেই পরবর্তী অংশ বা অকথিত অংশ হিসাবে বক্ষ্যমাণ অংশ লিখতে চাচ্ছি।

ঐ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু মূলত হলো ঃ শ্রেণিবিভক্ত সমাজের সংস্কৃতির প্রকৃত সমন্বিত রূপ পাওয়া যায় না। তবে, সেখানেও ধনিকশ্রেণি তার সংস্কৃতির গহ্বরে লোকজীবনের যে সংস্কৃতি বা লোকসংস্কৃতিকে গ্রাস করার জন্য সদাসচেষ্ট, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তার উপর ভিত্তি করে দাঁড়ানো যে জাতীয় সংস্কৃতি তা আজকে বিশ্বায়নিক রূপ নেবার পথে কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠী-কেন্দ্রিক যে সংস্কৃতি তাকে পাইথনের মতো গ্রাস করছে। ফলে 'জাতীয় সংস্কৃতি', 'লোকসংস্কৃতি' সবই আজ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমাণ। তার মৃত্যুঘন্টা বাজছে। কিন্তু তার শবদাহের উপরে বসে যে বিশ্বায়নিক তন্ত্রাচারী বৃহৎ বুর্জোয়া ও একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা যে তন্ত্রসাধনায় রত তাতে দুর্গন্ধই উঠবে। নবজীবনের কোনো ছন্দ ধ্বনিত হবে না। শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টির সাধনা ও তারজন্য সংগ্রাম ছাড়া সংস্কৃতির রাহুমুক্তি ঘটতে পারে না।

আরেকটি বিষয়ও আমার পূর্বোল্লিখিত লেখায় ছিল। তাহলো, লোকসংস্কৃতির জাত বিচার ও তার কোষ্ঠী বিচারে আজকে মূলত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রিক সংস্কৃতির কথাই ভাবতে হবে। অতীতের শিকারজীবি আরণ্যক গোষ্ঠীগুলির যে সংস্কৃতি তা কৃষির আবিষ্কারের পর থেকে ক্রমাবলুপ্তির পথে। আমাদের মতো প্রাক্-ঔপনিবেশিক দেশে এখনও তা টিঁকে আছে। আরও কিছুদিন টিঁকে থাকবে। কিন্তু তার অবলুপ্তি অনিবার্য। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি লোকসংস্কৃতির নানা আঙ্গিক ও তার উপাদান ছড়ানো আছে। সেখানেও অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির পরিধিকে যতখানি ব্যাপক করা যায়, ততই সমগ্র জাতি তথা সমাজের স্বার্থে তা কল্যাণকর।

তবে, জাতীয় সংস্কৃতির লক্ষ্য হোক সমন্বয়ী, সমমর্যাদাভিত্তিক। পরস্পর-বিরোধী নয়। একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। জাতীয় সংস্কৃতির ভিৎ তাতে আরও দৃঢ় হবে। বিশ্বায়নিক প্রবল ঝড়ের তান্ডবে সে-ঘর চট করে ভেঙে যাবার আশঙ্কা থাকবে না।

এবার আজকের বক্তব্যে আসতে চাচ্ছি। আজকের যে প্রশ্ন তাহলো, সংস্কৃতির কি আঞ্চলিক রূপ আছে? আমরা আঞ্চলিক সংস্কৃতির কথা বলি। লিখি। তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করি। তাতে বহু মেধাশক্তির অপব্যবহারও করি। আঞ্চলিকতার মোহাচ্ছন্ন হয়ে সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশও রুদ্ধ হয়ে যায়। সেখানে বৈজ্ঞানিক ভাবনা-চিন্তা না হয়ে ভাবনা-চিন্তা হয় আঞ্চলিক বোধ নিয়ে। যা একান্তভাবেই সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট।

এতে আসে নানা রোগ। বিচ্ছিন্নতার রোগ যার অন্যতম। যে রোগের দাপটে আজ সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, ভাষাগত বিরোধ, জাতপাতের বিরোধে দেশ আজ খন্ডবিখন্ড হবার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। বর্ণগত বিরোধে আজ সমগ্র হিন্দীভাষী এলাকা দীর্ণ-বিদীর্ণ। আর সেই ঘোলাজলে মৎস্য শিকার করছে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তি। রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' আজ বিভীষিকাময় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সর্বভারতীয় বিষয় আপাতত ছেড়ে দিয়ে আমাদের বাংলার দিকে তাকাতে চাইছি। এখানে 'উত্তর রাঢ়', 'দক্ষিণ রাঢ়' তথা রাঁঢ়ীয় সংস্কৃতি, বারেন্দ্র সংস্কৃতি, বারিন্দ্র সংস্কৃতি প্রভৃতি বহু আঞ্চলিক সংস্কৃতিবোধ বর্তমান। এই বোধ যে বেশ দৃঢ়, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার পাশাপাশি আছে 'গৌড়ীয় সংস্কৃতি', 'বাঙাল সংস্কৃতি', 'ঘটি সংস্কৃতি' — এমনি নানা

বিভাগ ও উপ-বিভাগ। 'বাঙালী সংস্কৃতি' কথাটা কথার কথা হয়ে দাঁড়াতে চাইছে।

প্রসঙ্গত 'বাঙলা' এই নামকরণের দিকে একবার তাকানো ভালো। বাঙালীর ইতিহাস— আদিপর্বের রচয়িতা ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করাই এক্ষেত্রে সঙ্গত মনে করি। .... প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাঙলা দেশ পুন্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, বজ্র (অথবা ব্রহ্ম), তাম্রলিপ্তি, সমতট, বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত। এই জনপদগুলি প্রত্যেকেই স্ব-স্বতন্ত্র ও পৃথক, মাঝে মাঝে বিরোধ-মিলনে একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগের সম্বন্ধও দেখা যায়। কিন্তু প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রপরায়ণ। সপ্তম শতকের প্রথম পদে শশাঙ্ক গৌড়ের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ-মালদহ-মুর্শিদাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে উৎকল সর্বপ্রথম এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করে। কিন্তু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জনপদগুলি এক নাম লইয়া এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইবার সূচনা বোধহয় দেখা দেয় শশাঙ্কের আগেই। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি হইতে (হুড়াহা-লিপির 'গৌড়ান'), শশাঙ্ক তাহাকে পূর্ণ পরিণতি দান করেন। এক সময় হইতেই গৌড় নামটির ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা যেন অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল। এবং পাল-রাজারা বঙ্গপতি হওয়া সত্ত্বেও গৌড়াধিপ, গৌড়েন্দ্র, গৌড়েশ্বর নামে পরিচিত হইতেই ভালোবাসিতেন। লক্ষণ সেন সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। যাহাই হউক, শশাঙ্কের পর হইতেই, অর্থাৎ মোটামুটি অষ্টম শতক হইতেই। বাঙলাদেশের তিনটি জনপদই যেন সমগ্র বাঙলাদেশের সমার্থক হইয়া উঠে। পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ। এ কথা সত্য। আগে যেমন পরেও তেমনই। দেশের বিভিন্ন জনপদ এবং তাহাদের নাম-স্মৃতি ছিলই। নূতন নূতন স্থানের বিভাগীয় নামের উদ্ভবও হইতেছিল (যেমন পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙলা অঞ্চলে বঙ্গাল, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট ; উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে বরেন্দ্রী ; তাম্রলিপ্তি অঞ্চলে দন্ডভুক্তি ; পশ্চিমবাঙলা অঞ্চলে রাঢ়ের উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগ) এবং এইসব বিভাগের আবার নূতন নূতন উপবিভাগও নূতন নূতন নাম লইয়া দেখা দিতেছিল। কিন্তু আর সমস্তই যেন এই তিনটি জনপদের কাছে ম্লান বলিয়া মনে হয়। আর সকলেই যেন ধীরে ধীরে ইহাদের মধ্যেই নিজেদের সত্তা বিলোপ করিয়া দিতেছিল। রাঢ়ের মতো প্রাচীন জনপদগুলো ক্রমশ গৌড়-নামের মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতেছিল। শশাঙ্ক এবং পালরাজারা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অধিকারী হইয়াও নিজেদের রাঢ়াধিপতি বা রাঢ়েশ্বর না বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিলেন গৌড়াধিপ এবং গৌড়েশ্বর বলিয়া এবং ভিন্প্রদেশীরাও তাহা মানিয়া লইল। 'হর্ষচরিত' ও 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থ এবং নবম শতকের ভিন্প্রদেশী লিপিগুলিই তাহার প্রমাণ। পুন্ড্র-বরেন্দ্রী সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। পুণ্ড্র-বরেন্দ্রীর স্মৃতি পুণ্ড্রবর্ধনের মধ্যে বাঁচিয়াছিল সেন আমলের শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এই পুণ্ড্রও যেন তাহার স্বতন্ত্র নামসত্তা গৌড়ের মধ্যে বিসর্জন দিতে যাইতেছিল ; একজন পালরাজা যদিবা একবার অন্তত বঙ্গপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, পুন্ড্রধিপ বা পুণ্ড্র-বর্ধনেশ্বর বা বরেন্দ্র-অধিপতি বলিয়া কোথাও তাঁহাদের উল্লেখ করা হয় নাই। যদিও বরেন্দ্রী ছিল তাঁহাদের জনকভূমি বা পিতৃভূমি। ইহার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত লক্ষ্য করিবার মতন। পাল এবং সেন রাজাদের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল গৌড়েশ্বর। লক্ষণ সেন যে মুহূর্তে গৌড় অধিকার করিলেন, সেই মুহূর্তেই তিনি গৌড়েশ্বর। শশাঙ্কের সময় হইতেই একটি মাত্র নাম লইয়া প্রাচীন বাঙলার বিভিন্ন জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে চেষ্টার সূচনা দেখা দিয়াছিল, পাল ও সেন রাজাদের আমলে তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিল। যদিও বঙ্গ তখনও পর্যন্ত আপন স্বতন্ত্র-জনপদ প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিয়াছে। এক গৌড় লক্ষ্য ও আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গ নাম তখনও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বিদ্যমান ; পুণ্ড্র, পুণ্ড্রবর্ধনের রাষ্ট্রসত্তা আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র পৃথক জনপদসত্তা। পরবর্তীকালেও গৌড় নামে বাঙলাদেশের কিয়দংশের জনপদসত্তা বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। বাঙলার বাহিরে বাঙালী মাত্রেই গৌড়বাসী বা গৌড়ীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, এমন প্রমাণও দুর্লভ নয়। ঔরঙ্গজেবের আমলে সুবা বাঙলার যে অংশ নবাব শায়েস্তা খাঁর শাসনাধীন ছিল, তাহাকে বলা হইল গৌড়মণ্ডল। উনবিংশ শতকে যখন মধুসূদন দত্ত মহাশয় লিখিয়াছিলেন ঃ রচিব এ মধুচক্র গৌড়জন যাহে/আনন্দে করিবে পানসুধা নিরবধি— তখন গৌড়জন বলিতে তিনি সমগ্র অধিবাসীকেই বুঝাইয়াছিলেন।

(বাঙালীর ইতিহাস — আদিপর্ব ঃ নীহাররঞ্জন রায়, ১২৩-১২৪ পৃষ্ঠা)।

এতো হাজার বছর আগেকার কথা। তারপর তো গঙ্গা-যমুনা-তিস্তা-করতোয়া-মেঘনা-কর্ণফুলি দিয়ে কতজল বয়ে গিয়েছে। দেশ পরাধীন হয়েছে। ব্রিটিশ শাসকরা দেশের ভূমিব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন ঘটাল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অস্ত্রাঘাতে যে কৃষকরা আবহমানকাল জমির প্রকৃত অধিকারী

ছিল, তারা তা হারাল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শোষণমূলক ও নিপীড়নকারী ব্যবস্থাবলী জমির স্বত্ব-হারা কৃষকদের চির ভিখারিতে পরিণত করল।

এই সর্বনাশা ব্যবস্থাবলী দেশের সমাজব্যবস্থার স্থিতিশীলতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। যদিও ঐ স্থবিরতার সব যে ভালো ছিল বা মানবকল্যাণকারী ছিল তা নয়। তবু, তার মধ্যে কতকগুলি কল্যাণকর যে ব্যবস্থাবলী ছিল, তা হারাল কৃষকসমাজ — কুটির শিল্পী ও সমাজের অন্যান্য অংশের শ্রমজীবী জনগণ। তাদের হাতে উঠল ভিক্ষাপাত্র। নতুন যে মহানাগরিক সভ্যতার সংস্কৃতির জন্ম হলো, তা প্রাথমিক পরিচয়ে ছিল অবক্ষয়ী ও পুরোপুরি স্থূল। তার পৃষ্ঠপোষক মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা তাই চাইছিলেন।

এই অন্ধকারের মধ্যে নতুনকালের ভেরি বাজালেন রামমোহন রায়। বাজালেন ডিরোজিও ও তাঁর ইয়ংবেঙ্গলের বন্ধু এবং ছাত্ররা। এ থেকে অক্ষয় দত্ত-দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর হয়ে রবীন্দ্রনাথে আমরা পেলাম এগিয়ে চলার পথসন্ধান। নতুনকালের তূর্যনাদ।

সেখানেই কাল থেমে নেই। বিশশতকের প্রথম দশকে একদিকে যেমন জাতীয় বুর্জোয়ার নবচেতনা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার দুন্দুভি বেজেছে, তার সাথে সাথে শ্রমিকশ্রেণির অনাগত পদধ্বনিও শোনা গিয়েছে। যা আরও মূর্ত হলো ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পরে।

রবীন্দ্রনাথ ডাক দিয়েছিলেন লোকসংস্কৃতির হারানো সম্পদকে খোঁজার। তারমধ্যেই আছে জাতীয় সংস্কৃতির প্রাণভোমরা। তাকে জাগাও। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স-উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি ঐ আহ্বান জানালেন। আনন্দের বিষয় তাঁর আগে ও পরে বেশ কয়েকজন এগিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথের ঐ আহ্বানকে সার্থক করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। সুরধুনির বিলীয়মান স্রোতস্বিনীকে আবার প্রবাহমানা করার জন্য তাঁদের আন্তরিক ও সক্রিয় ভূমিকা বাংলার সংস্কৃতির প্রগতিশীলতার বাতাবরণ তৈরি করেছে।

বাংলা আজ খন্ডিত। তার আঘাত বাংলার সংস্কৃতির উপরেও এসেছে। বর্তমান আলোচনার উপজীব্য তাই মোটামুটিভাবে তার তিন-ভাগের একভাগ বাংলা। তবে, এখানেই আছেন নবজীবনের গীতিকার আধুনিক শিল্পশ্রমিক শ্রেণি। আবার আছেন ভূমিসংস্কারের সঞ্জীবনী মন্ত্রে জেগে-ওঠা কৃষকরা। যাঁরা বহন করছেন সাঁওতাল, হুল, সহ বহু কৃষক সংগ্রামের সুমহান ঐতিহ্যধারা। আছে সুন্দরবনের অরণ্যরাজির ঘুম-ভাঙানো কাকদ্বীপের মরণপণ সংগ্রামের গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী বন কেটে বসতির ও আবাদের কৃষকরা।

এসবও আজ বাংলার সাংস্কৃতিক চেতনায় নতুন বোধের আভ্যুদায়িক রচনা করছে। রবীন্দ্রনাথের আহ্বান আজ প্রাণময় হয়ে উঠছে। জীয়নকাঠি যে ভূমিসংস্কার, এতো অব্যর্থ শর সন্ধান।

তাই, আঞ্চলিকতার ঘোর কাটাবার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। একদা লোকসংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন জাতীয় সংস্কৃতি যত দ্রুত তার বিচ্ছিন্নতা ও আঞ্চলিকতার ঘোর কাটাতে পারবে, ততই মঙ্গল।

আমরা কী আজ নতুনকালের যাত্রাপথে পুরানো পরিচয়ের সংকীর্ণ গন্ডির লক্ষণরেখায় নিজেদের আবদ্ধ রাখব।

নৈব নৈব চ।

সেইজন্য আমার আগেকার এক লেখার নাম দিয়েছি এসো বাঁধি সেতু মিলনের ওটা হোক প্রথম তরঙ্গ, এটা দ্বিতীয় তরঙ্গ।

স্বাধীন বিদেশনীতি বিকিয়ে 'ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি' করা চলবে না

সত্য সাউ

২০০৫ সালের জুলাই-এ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে অসামরিক ক্ষেত্রে পারমাণবিক সহযোগিতার লক্ষ্যে খুনী বুশের সঙ্গে 'পরমাণু সহযোগিতা সমঝোতা' ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করেন যা ভারত-মার্কিন পরমাণু সহযোগিতা-সমঝোতার মূল রূপরেখা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু চুক্তির তথ্যের গোপনীয়তা ও কারচুপির জন্য খুব স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষের দেশপ্রেমিক জনগণের মধ্যে সন্দেহ ও প্রশ্ন জেগেছে, 'ভারত-মার্কিন পারমাণবিক সহযোগিতা- সমঝোতা' চুক্তি কি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বলুণ্ঠনের কনিষ্ঠ সহযোগী হওয়ার উদগ্র বাসনায় ভারতের নিজস্ব স্বাধীন জোটনিরপেক্ষ বিদেশনীতি বর্জন করে মার্কিনীদের নিকট পরমাণু দাসত্ব গ্রহণের পদক্ষেপ ! এই সন্দেহ ও প্রশ্ন জাগারও কারণ হলো ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে বি জে পি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার সংসদ বা জনগণকে কোনোভাবে অবহিত না করেই আমাদের স্বাধীন বিদেশনীতি ও নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলিকে ভারত-মার্কিন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে রদবদলের চেষ্টা শুরু করেছিল। বর্তমান মনমোহন সরকার বাজপেয়ী সরকারের পথেই হাঁটছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

মার্কিনী দানবদের ইরাক দখলের পর বাজপেয়ী সরকার ইরাকের তেলভাণ্ডার লুণ্ঠনের মার্কিন সহযোগী হওয়ার জন্য তাদের নির্দেশে ইরাকে ভারতীয় সেনা প্রেরণের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিল কিন্তু ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনমতের চাপে তাদের সেই অপচেষ্টা বানচাল হয়ে যায়।

মনমোহন সরকারের স্বাধীন বিদেশনীতি বর্জন করার প্রথম দৃষ্টান্ত হলো আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থায় (IAEA) ইরানের পরমাণু কর্মসূচি বাতিলের প্রশ্নে ভারত তার দীর্ঘদিনের বন্ধুদেশ ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদান করে। সম্প্রতি মার্কিনীরা দুটি ভারতীয় বেসরকারী কোম্পানীর উপর জারি করেছে নিষেধাজ্ঞা। এই অভিযোগে যে তারা ইরানকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র অথবা ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ সহায়ক প্রযুক্তি সরবরাহ করছে। অথচ অন্যতম কোম্পানী বালাজী অ্যামিনেস জানিয়েছে যে তারা মাত্র তিন ধরনের দ্রব্য সরবরাহ করছে যা ব্যবহৃত হয় জীবনদায়ী অ্যান্টিবায়োটিকস্ উৎপাদনে। এর বিরুদ্ধে ভারতের জোরালো প্রতিবাদ নেই।

মার্কিনীদের ন্যাটো জোট স্থায়ী আস্তানা গেড়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র আফগানিস্তানে। ন্যাটো জোটের আফগানিস্তানে অবস্থান ভারতীয় উপমহাদেশে আঞ্চলিক নিরাপত্তার পক্ষে একটা বড় বিপদ হওয়া সত্ত্বেও বাজপেয়ী সরকারের পথ ধরে মনমোহন সিং সরকার মার্কিনীদের বিরুদ্ধে একটা শব্দও খরচ করতে রাজী নয়, বরঞ্চ আফগানিস্তানের পুনর্গঠনের বরাত পেতে মরিয়া।

হালফিল মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলী বাহিনী প্যালেস্তাইনের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে শক্তির জোরে সেই দেশের মন্ত্রী ও সাংসদদের অপহরণ করলো, স্বাধীনতাকামী চরমপন্থী হিজবুল্লাকে শায়েস্তা করার জন্য লেবাননের উপর সশস্ত্র হামলা, বোমাবর্ষণ ও দখলদারী চালিয়ে হাজার হাজার নিরীহ সাধারণ মানুষকে গৃহহীন করে উদ্বাস্তুতে পরিণত করলো, শয়ে শয়ে শিশু, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক সহ সাধারণ মানুষকে খুন করলো, এমনকি একটা স্বাধীন দেশে সমস্ত আন্তর্জাতিক আইনকে অবজ্ঞা করে ক্লাস্টার বোমা পর্যন্ত নিক্ষেপ করলো কিন্তু আমরা তৃতীয় বিশ্বের জোটনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে মার্কিন-ইজরায়েল জোটের এই বর্বরতার কোনো প্রতিবাদই করলাম না। খুনী বুশের মন্তব্য হলো, মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রের পরিবর্তনের সময় হয়েছে। মার্কিন বিদেশ সচিব কন্ডোলিজা রাইসের উক্তি হলো, মধ্যপ্রাচ্যে প্রসব যন্ত্রণা উঠেছে। অর্থাৎ এরপর ইরান-সিরিয়াকে দখল করতে পারলে

কেল্লাফতে। মধ্যপ্রাচ্যের তেলভাণ্ডার মার্কিনী ও তার সহযোগীদের সম্পূর্ণ করতলগত হয়ে পড়বে।

গত ১৯শে আগস্ট লেবাননে সাময়িক যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও হামাস দলের শীর্ষনেতা ও উপ-প্রধানমন্ত্রীকে ইজরায়েলী সেনা ভোর রাতে তার নিজ বাড়ি থেকে গায়ের জোরে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। তারা লেবাননের বন্দরগুলি অবরোধ করে রেখেছে। কিন্তু প্যালেস্তাইন ও লেবাননে মার্কিন-ইজরায়েল জোটের আক্রমণ, অপহরণ ও দখলদারীর বিরুদ্ধে ভারতের বিদেশদপ্তর থেকে কোনো জোরালো প্রতিবাদ উঠেনি।

লেবাননে অবস্থানকারী ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার জন্য তারা জাহাজ পাঠিয়েছে, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য লেবাননে ত্রিপল ইত্যাদি ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছে এবং ১০ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু ইজরাইলের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি ব্যাহত করতে চায়নি। ভারত-মার্কিন সহযোগিতা-সমঝোতা ব্যাহত না করার জন্য হবু বড়ভাই (Big Brother) মার্কিনীদের চটাতে চায়নি। বর্তমান কংগ্রেসের পূর্বসূরী প্রধানমন্ত্রী নেহেরু, ইন্দিরা, রাজীব গান্ধীরা অকুণ্ঠভাবে প্যালেস্তাইনের মুক্তিযুদ্ধকে শুধু সমর্থনই জানাননি, আন্তর্জাতিক মঞ্চে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

আজকের কংগ্রেসের সুপ্রিমো নেহেরু-ইন্দিরা পরিবারের উত্তরসূরী সোনিয়া গান্ধী তাদের পূর্বসূরীদের প্রদর্শিত স্বাধীন জোটনিরপেক্ষ বিদেশনীতির পথে চলবেন কিনা সেটাই বড় বিবেচ্য বিষয়। বর্তমানে ভারতে সর্ববৃহৎ অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ ইজরায়েলের বিরোধিতা করবেন কি?

অসামরিক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু ঐ শক্তি উৎপাদনে মূল জ্বালানি তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়ামের অভাব রয়েছে আমাদের দেশে। সাতের দশকে পোখরানে প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের পর থেকে ভারতের পারমাণবিক জ্বালানি আমদানির উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচি ত্যাগ করে পরমাণু অস্ত্র প্রসাররোধ চুক্তি (NPT)-তে সই করার জন্য ভারতের উপর মার্কিনী চাপ বাড়তে থাকে। ভারত এই চাপের কাছে মাথা নত করেনি। ভারতের বক্তব্য হলো বিশ্বজুড়ে সার্বিক নিরস্ত্রীকরণ ছাড়া সে বৈষম্যমূলক চুক্তি NPT-তে সই করবে না।

বর্তমান লগ্নীপুঁজির বিশ্বায়নীয় পরিস্থিতিতে ১৮ই জুলাই, ২০০৫-এর যৌথ বিবৃতির পর ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়, NPT-তে সই না করেও ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির ফলে ভারত বিশ্বের ৫টি পরমাণু শক্তিধর দেশের মত সমান মর্যাদা পাবে এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে। কিন্তু আসলে তা হবে কি?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এই চুক্তি কার্যকরীর বড় বাধা 'ইউ এস অ্যাটোমিক এনার্জি অ্যাক্ট, ১৯৫৪' নামে একটি আইন। এই আইনের তিনটি শর্তের একটি শর্ত লঙ্ঘনকারী কোনো দেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বাণিজ্য গড়ে তুলতে পারবে না। এই তিনটি শর্ত মোতাবেক যে-দেশ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, NPT-তে সই করেনি এবং IAEA-র নজরদারীর জন্য দেশের পরমাণু শক্তি কেন্দ্রগুলি উন্মুক্ত করেনি সেই দেশের সঙ্গে মার্কিন পরমাণু চুক্তি নৈব চ। এই তিনটি বিধিনিষেধের আওতায় ভারতও আছে।

তাহলে কি ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি ভেস্তে যাবে? এই চুক্তি কার্যকরী করতে মার্কিনীদের সাথে ভারতকে একটা রফা করতে হয়েছে। ১৯৫৪-র US Atomic Energy Act থেকে ভারতকে ছাড় দেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে মার্কিন সংসদে একটি আইন পাশ করা হবে। অপরদিকে ভারত অসামরিক কাজে ব্যবহৃত চুল্লিগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে IAEA-র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উন্মুক্ত করে দেবে। তাছাড়া ২০০৫-এর বুশ-মনমোহন বিবৃতিতে ভবিষ্যত পরমাণু বিস্ফোরণের বিষয়ে একতরফাভাবে ভারতের স্বতঃপ্রণোদিত নিষেধাজ্ঞা জারির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারত-মার্কিন পারমাণবিক সহযোগিতা কার্যকরী করতে ইতিমধ্যে দুই দেশ বিগত একবছরে বেশকিছু পদক্ষেপও নিয়েছে। ভারত তার ব্যবহৃত ২২টি পরমাণু চুল্লির মধ্যে ১৪টিকে অসামরিক ব্যবহারের লক্ষ্যে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছে। এদিকে ২৮শে জুন 'US Atomic Energy Act 1954'-র আওতা থেকে ভারতকে ছাড় দেওয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে দিয়ে আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিলের খসড়া পাশ হয় 'House of Representatives'-এর International Affairs Committee-তে। আইনটির নাম 'US-India Nuclear Co-operation Promotion Act of 2006'. ২৯শে জুন এই বিলের আরেকটি খসড়া সংস্করণ পাশ হয় সেনেট-এর 'Foreign Affairs Committee'-তে। ২৬শে জুলাই

International Affairs Committee-র পেশ করা আইনের খসড়াটি পাশ হয় 'House of Representatives'-এ।

বুশ-মনমোহন যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছিল "ভারতের সঙ্গে পূর্ণ অসামরিক পারমাণবিক শক্তি সহযোগিতা ও বাণিজ্য" গড়ে তুলতে মার্কিন আইন সংশোধন করা হবে। কিন্তু পাশ হওয়া খসড়া আইনগুলির লক্ষ্যই হলো অসামরিক উদ্দেশ্যে চিহ্নিত পরমাণু চুল্লিগুলির উপর চিরস্থায়ী কঠোর নজরদারি ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া, ভারতকে NPT-তে সই করানো এবং দেশের স্বাধীন জোটনিরপেক্ষ বিদেশনীতিকে মার্কিনমুখী করে তোলার জন্য চাপ সৃষ্টি করা। তাছাড়া মার্কিনীরা ভারতের সঙ্গে পারমাণবিক বাণিজ্যের নামে তাদের পুরাতন রিঅ্যাক্টরগুলির বোঝা ভারতের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। মার্কিনীরা নিজেদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য একটাও নতুন পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর স্থাপন করেনি। তার মূল কারণ হলো পারমাণবিক বর্জ্য ফেলার তীব্র সমস্যা এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ অত্যন্ত বেশী। তাসত্বেও মার্কিনীরা চাইছে ভারত ব্যয়বহুল এবং পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথে হাঁটুক যাতে সে ভারতকে তার পুরাতন রিঅ্যাক্টরগুলি বিক্রি করতে পারে।

বর্তমানে ভারতে ৩ হাজার মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় যা ভারতের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ২·৫ শতাংশ। সরকারীভাবে ২০১৫ সালের মধ্যে উৎপাদিত পারমাণবিক বিদ্যুতের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১০ হাজার মেগাওয়াট যা দেশের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৫ শতাংশের বেশী নয়। আবার একই প্রশ্ন উঠে আসছে, আমরা কি মাত্র ৫ শতাংশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য মার্কিনীদের পারমাণবিক দাসত্ব করবো।

আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কাঁচামালের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। কয়লা, গ্যাস ও জল থেকে প্রস্তুত বিদ্যুৎ দেশের বেশীরভাগ বিদ্যুতের চাহিদা মেটাচ্ছে। তাছাড়া বায়ু ও সৌরশক্তি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের বহুল প্রচলন শুরু হয়েছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচের ২/৩ অংশ এবং জল, বায়ু ও সৌরশক্তি দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি পরিবেশ বান্ধব। তাহলে এই পথে না হেঁটে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য মার্কিনী চাপের কাছে মাথা নত করবো কেন?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বাণিজ্য দ্বারা ভারতের নিকট বিশাল ফয়দা তোলা সত্বেও তার উপর এত বিধিনিষেধ জারি করতে চাইছে কেন? তার কারণ হলো মার্কিনীরা দেখছে পরমাণু উৎপাদনের নামে পরমাণু অস্ত্র উৎপাদনে ভারত যেন বাড়তি সুবিধা না পায়। ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তিকে পরমাণু অস্ত্র প্রসারের ঝুঁকিবিহীন করতেই শর্ত রয়েছে যে, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণ, পুনঃশোধন ও ভারী জল প্রযুক্তি হস্তান্তর করা চলবে না। কারণ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্রে পরমাণু বোমা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অতিসমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম উৎপাদন করা যায়। অপরদিকে, পরমাণু চুল্লিতে বিভাজিত ইউরেনিয়াম জ্বালানি পুনঃশোধন করে প্লুটোনিয়াম পাওয়া যায়, যা থেকে বর্তমানে বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরমাণু বোমা তৈরী করা হয়। মনে রাখতে হবে ভারত শুধু তার অসামরিক চুল্লিতেই মার্কিনমুলুক থেকে আমদানিকৃত পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহার করতে পারবে, নজরদারির আওতার বাইরে সামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পারমাণবিক চুল্লিতে এই জ্বালানি ব্যবহার করতে পারবে না।

চুক্তি অনুযায়ী যেসব চুল্লি নিয়ন্ত্রণের দায়রায় আসবে তারা চিরস্থায়ীভাবেই এই নিয়ন্ত্রণের দায়রার মধ্যে থাকবে। কোনো কারণে চুক্তি ভেঙ্গে গেলেও নিয়ন্ত্রণ কিন্তু জারি থাকবে। IAEA ছাড়াও মার্কিনীদের চুল্লিতে নজরদারির অধিকার থাকবে।

বিশ্বে মার্কিনীরা ছয় দশক ধরে গড়ে তুলছে তাদের পরমাণু সাম্রাজ্য। পারমাণবিক অস্ত্রের তাদের মূল প্রতিযোগী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটার পর তা বহুধা রাষ্ট্রে বিভক্ত। যদিও তাদের পারমাণবিক মজুত ভাণ্ডার অটুট আছে। মার্কিনীরা একমেরু বিশ্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের সামরিকসজ্জা বাড়িয়ে চলেছে। সারা বিশ্বে প্রতিরক্ষাখাতে যত ব্যয় হয়, আমেরিকার একারই বরাদ্দ তাই। ২০০০ সালের আগে বিদেশে ২.৫ লক্ষ মার্কিন ফৌজ অবস্থান করছিল এবং তারসঙ্গে মারণাস্ত্রে সজ্জিত বিভিন্ন দেশ ছিল মার্কিন সামরিক ঘাঁটি। বর্তমানে তার সামরিক শক্তির বিন্যাসের পরিধির আরও বিস্তৃতি ঘটিয়ে চলেছে। প্রায় ১০ হাজার পারমাণবিক বোমার মালিক তারা। তার উপর আছে তাদের বিপুল পরিমাণের গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার। অথচ তাদের অপছন্দের কোনো দেশে ন্যূনতম পারমাণবিক ও গণবিধ্বংসী অস্ত্র ভাণ্ডারের হদিসের গন্ধ পেলে ঐ দেশের উপর আগাম আক্রমণের নীতি ঘোষণা করেছে।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দ্বন্দ্বটাই প্রধান, ঐক্যটা অপ্রধান, সাময়িক ও ইস্যুভিত্তিক। এশিয়ায় অবস্থিত সমাজতান্ত্রিক দেশ মহান চীনের সামরিক, অর্থনৈতিক সহ সর্বক্ষেত্রের অগ্রগতি একমেরু বিশ্বের অভিলাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিস্ট চীনা জুজুর আতঙ্কে ভুগছে। সমর বিশারদ ও অর্থনীতিবিদের অভিমত হলো চীনের সর্বক্ষেত্রে বিকাশের অগ্রগতি যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে ২০৪০ সালের মধ্যে চীন সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিনীদের সমকক্ষ হয়ে উঠবে। এশিয়ায় চীনা প্রভাব রুখতে তারা তাই স্ট্র্যাটেজিক পার্টনাররূপে ভারতকে পেতে চাইছে। অন্যদিকে মার্কিনীদের শীতল যুদ্ধকালীন পরমবন্ধু ও ভারতের জন্মশত্রু পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিরোধগুলি মিটিয়ে ফেলার তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা গ্যারান্টি সৃষ্টি করতে চাইছে, ভারত যেন পারমাণবিক ও গণবিধ্বংসী অস্ত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করে।

মার্কিন কংগ্রেস '১২৩ পরমাণু সহযোগিতা-সমঝোতা' ধারা অনুমোদন করার পরই ভারত অসামরিক পরমাণু কর্মসূচির জন্য আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থা রক্ষাকবচের আওতায় বরাবর আসার জন্য স্বাক্ষর করবে। অথচ কোনো কোনো পারমাণবিক শক্তিধর দেশ কিন্তু এই ধরনের স্বাক্ষর দিতে রাজি হয়নি। US IAEA-র ১২৩নং ধারা অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগাম অনুমতি ব্যতীত ব্যবহৃত জ্বালানি পুনঃপ্রক্রিয়াকরণে নিষেধ করা হয়েছে ঐ প্রক্রিয়াকরণের প্রযুক্তি আমদানিকারক দেশকে। হাউসে পাশ হওয়া বিলে ১২৩ ধারা থেকে ভারতকে ছাড় দেওয়া হয়নি। IAEA-র রক্ষাকবচে ভারত স্বাক্ষর করার আগে ভারতের উপর থেকে সবধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে। ভারত-মার্কিন সহযোগিতা লক্ষ্যে যে '১২৩ চুক্তি' স্বাক্ষরিত হবে সেই চুক্তিতে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন ও ভারী জল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়টি যুক্ত করতে হবে। কারণ ভারতের ক্ষেত্রে IAEA-র রক্ষাকবচ হলো এমন এক আন্তর্জাতিক চুক্তি যা একবার স্বাক্ষরিত হলে আর পরিবর্তন করা যাবে না। অপরদিকে মার্কিনীরা তাদের আইন যেকোনো সময় পরিবর্তন করতে পারবে। যেকোনো সময়ে তারা '১২৩ চুক্তি'র উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারবে। অবশ্য '১২৩ চুক্তি' বলবৎ করতে হলে মার্কিন কংগ্রেসের উভয়কক্ষের সম্মতির প্রয়োজন হয়।

'পরমাণু সমঝোতা'কে মার্কিন বিদেশসচিব কন্ডোলিজা রাইস 'একটি স্ট্র্যাটেজিক সাফল্য' হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। অন্যদিকে ভারতের দেশপ্রেমিক জনগণ ইউ পি এ সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে জনগণকে অন্ধকারে রেখে ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি করা চলবে না। বামপন্থীরা সংসদে এই চুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আলোচনার দাবী জানিয়েছে। বিশেষ করে তাদের পক্ষ থেকে ভারত-মার্কিন পরমাণু সমঝোতার সাতটি ইস্যুর ব্যাখ্যা সংসদে চাওয়া হয়েছে। সাতটি ইস্যু হলো —

- এই সমঝোতায় অসামরিক পরমাণু প্রযুক্তি পাওয়া যাবে কিনা এবং পরমাণু অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তিতে (NPT) স্বাক্ষর না করার জন্য দ্বৈত ব্যবহারযোগ্য (Dual Use) প্রযুক্তি ব্যবহারে ভারতের উপর জারি করা সমস্ত বর্তমান নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে কিনা।
- মার্কিন কংগ্রেসের নীতিগত ঘোষণা বা কংগ্রেসের মত অনুযায়ী ইরান ইত্যাদি প্রশ্নে যদি ভারতীয় বিদেশনীতির উপর কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় তাহলে সেসব নিয়ন্ত্রণ মেনে নেওয়া হবে কিনা।
- মার্কিন কংগ্রেস '১২৩ চুক্তি' অনুমোদন করার পরেই ভারত অসামরিক পরমাণু কর্মসূচির জন্য IAEA-র রক্ষাকবচে বরাবরের জন্য স্বাক্ষর করবে। কোনো পরমাণু শক্তিধর দেশ কিন্তু এই ধরনের স্বাক্ষর দিতে রাজি হয়নি। IAEA-র রক্ষাকবচে ভারত স্বাক্ষর করার আগে ভারতের উপর থেকে সবরকম নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। ভারতের ক্ষেত্রে IAEA এমন এক চুক্তি যা একবার স্বাক্ষরিত হলে আর পরিবর্তন করা যাবে না। অপরদিকে মার্কিনীরা তাদের আইন যে কোনো সময় পরিবর্তন করতে পারে।
- ২০০৬ সালের মার্চ সমঝোতা অনুযায়ী জ্বালানির ব্যাপারে গ্যারান্টি চাই। মার্কিনীরা যদি জ্বালানি দিতে অস্বীকার করে তাহলে আমেরিকাকে ঐ সরবরাহের ধারাবাহিকতা সুনিশ্চিত করতে হবে Nuclear Suppliers Group (NSG)-এর অন্যান্য সদস্যদের মারফত। মার্কিন হাউস বিলে যদিও মার্চ সমঝোতার উল্টো কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ভারতের জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, সেক্ষেত্রে NSG যাতে ঐ জ্বালানি সরবরাহ না করে তা মার্কিন প্রশাসনকে দেখতে হবে।

- ❒ ভারত FMCT কার্যকর করা এবং সমস্ত পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রকে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ করানোর লক্ষ্যে কাজ করবে। সেক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে রাজীব গান্ধী পরিকল্পনা অথবা সেই অনুসারে দিল্লীর ঘোষণা।
- ❒ সমঝোতার মূল দলিলে কোথাও মার্কিন ইন্সপেক্টরের কথা নেই। শুধুমাত্র IAEA ইন্সপেক্টরের কথা আছে। অথচ খসড়া মার্কিন বিলগুলিতে মার্কিন ইন্সপেক্টরের কথা বলা হয়েছে।
- ❒ শুধুমাত্র ভারতের জন্য প্রযোজ্য এমন প্রটোকল চাই। IAEA স্ট্যান্ডার্ড মডিফায়েড প্রটোকল অনুযায়ী কোনো অ্যাডিশনাল প্রটোকল চলবে না।

(সংসদে ব্যাখ্যার জন্য সাতটি ইস্যু কমরেড প্রকাশ কারাতের গণশক্তিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ "সংসদের মত এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন ?' হতে সংগৃহীত)

ভারতীয় দেশপ্রেমিক জনগণ ও বামপন্থীদের চাপে 'ভারত- মার্কিন পরমাণু চুক্তি' চূড়ান্ত করার আগে প্রধানমন্ত্রী সংসদে বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁকে বলতে হয়েছে চুক্তির যে বিষয়গুলি নিয়ে বামপন্থীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, মার্কিনীরা সেগুলিকে যথাযথ বিবেচনা না করলে ভারত এই চুক্তি বাস্তবায়িত করবে না। বাজপেয়ী সরকারের আমলে মার্কিন-ভারত সম্পর্ক কোন্ দিশায় চলছে তা ভারতীয় জনগণ তথা সংসদ জানতে পারতো না। বর্তমানে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে সংসদ এখন যে আলোচনার সুযোগ পাচ্ছে তার কারণ ইউ পি এ সরকারের স্থায়িত্ব বামপন্থীদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। এটা তো সত্য যে কোনো রাজনৈতিক পার্টি শ্রেণিনিরপেক্ষ হতে পারে না। কংগ্রেস পার্টিও শ্রেণিনিরপেক্ষ নয়। তারা বৃহৎ পুঁজিপতি ও সামন্তপ্রভুদের স্বার্থে পরিচালিত পার্টি। তাই কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউ পি এ সরকারও বৃহৎ পুঁজিরই তল্পিবাহক। মনমোহন সরকার ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির প্রশ্নে বামপন্থীদের চাপের কাছে সাময়িক পিছু হটলেও ভারতবর্ষের দেশপ্রেমিক জনগণকে সদা সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে যেন ভারতীয় বৃহৎ পুঁজির বিশ্বলুণ্ঠনের মার্কিনীদের কনিষ্ঠ সহযোগী হওয়ার উদগ্র বাসনা মেটাতে দেশের স্বাধীন বিদেশনীতি বর্জন করে মনমোহনের ঝাঁপি থেকে বিষধর সর্প বেরিয়ে না পড়ে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদী দুনিয়া গড়ে তোলার জন্য বিশ্বব্যাপী যে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে উঠেছে, তাতে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশপ্রেমিক জনগণকে অংশীদার হতে হবে। তবেই আমরা একমেরুমুখী মার্কিন দানবকে পরাস্ত করতে পারবো।

নবপরিচয়ে প্লুটো

শমিতকুমার মজুমদার

সহ-শিক্ষক, তরঙ্গপুর নন্দকুমার উচ্চবিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর

অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখার নেশা মানুষের বহুদিনের। আর মহাকাশকে জানার চেষ্টাতো সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এ নিয়ে বিতর্কও কম তৈরী হয়নি। বাইবেলের বিরুদ্ধে স্বাধীন মতামত দেবার জন্য গ্যালিলিও গ্যালিলিকে কারান্তরালে যেতে হয়েছিল। মহাকাশ নিয়ে গবেষণা এজন্য থেমে থাকেনি। ধর্মীয় রক্তচক্ষুকে দূরে ঠেলে বিজ্ঞানীরা মানুষকে সত্যের সন্ধান দিয়ে গেছেন। এরফলে একের পর এক আবিষ্কার মহাকাশ বিজ্ঞানে নবদিগন্তের উন্মেষ ঘটিয়েছে। নতুন নতুন গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু বা অন্যান্য জ্যোতিষ্ক নিয়ে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ এতটুকু কমেনি। অনেক আবিষ্কার নিয়ে মতদ্বৈধ থেকে গেছে বারংবার। যুক্তিতর্কের নিরিখে সংশোধিত হয়েছে অনেক পুরোনো ধারণা। কিন্তু পুনরায় নতুন চিন্তা-চেতনা নিয়ে মহাকাশ বিজ্ঞান দুর্বার গতিতে এগিয়ে গিয়েছে। এরকমই এক দীর্ঘ ৭৬বৎসরের ধারণার পরিবর্তন ঘটে গেল গত ২৪শে আগস্টে। সৌরজগতের মোট গ্রহের তালিকা থেকে নবম গ্রহ বলে পরিচিত প্লুটোকে শেষপর্যন্ত বাদ দিলেন পৃথিবীর শীর্ষ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। ফলে প্লুটোর মাথা থেকে খসে পরল গ্রহের মুকুট।

প্লুটো

১৯৩০ সালে প্লুটোকে আবিষ্কার করেন Clyde W. Tombaugh (১৯০৬-১৯৯৭)। গ্রীক পুরাণে প্লুটো নামে এক দেবতার উল্লেখ আছে। তিনি হলেন পাতালপুরীর অধীশ্বর। যেহেতু এই মহাজাগতিক বস্তুটি সৌর প্রান্তসীমায় তমসাবৃত অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়, তাই এর নাম দেওয়া হয়েছিল প্লুটো। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব ৫৯০০ মিলিয়ন কিলোমিটার। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে প্লুটো ২৪৮বৎসর সময় নেয়। নেপচুনের কক্ষপথের উপর গিয়ে পড়েছে প্লুটোর কক্ষপথ। নেপচুনের কক্ষপথ দ্বারা ছেদিত অংশ অতিক্রম করতে প্লুটোর সময় লাগে ২০ বৎসর। সৌরজগতের আর কোন গ্রহের এইরূপ কক্ষপথ নেই। এতদূরে থাকা প্লুটো সম্পর্কে বেশি কিছু জানা না গেলেও এটা জানা গেছে যে এটি একটি পাথুরে মহাজাগতিক বস্তু এবং সম্ভবত জমা মিথেন, নাইট্রোজেন, বরফ এবং কিছু ভারী গ্যাস দ্বারা আবৃত। এর তাপমাত্রা প্রায় ২২০°c। নিজ অক্ষের উপর Retrograde Motion (ঘড়ির কাঁটার দিকে) একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় প্রায় ৬দিন ৯ঘন্টা। এরূপ ঘূর্ণন একমাত্র শুক্র এবং ইউরেনাসের দেখা যায়। সৌরজগতের বাকি সকল গ্রহ নিজ অক্ষের উপর ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে। প্লুটোর ভর পৃথিবীর ভরের মাত্র ৬শতাংশ। এর গড় ব্যাস ২৩০০কিলোমিটার। কক্ষপথের ঘূর্ণনের সময় সূর্য থেকে এর সর্বাধিক দূরত্ব (Aphelion) ৭৩৭৫ মিলিয়ন কিলোমিটার। প্লুটো তার নিজ কক্ষপথে কাল্পনিক তলের সঙ্গে ১৭.২° কোণে হেলে থাকে। প্লুটোর একমাত্র উপগ্রহ স্যারন (Charon) আবিষ্কৃত হয় ১৯৭৮ সালে। এটি আকারে প্রায় প্লুটোর অর্ধেক।

গ্রহের নতুন সংজ্ঞা

গত ২৪শে আগস্ট প্রাগে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়নের সাধারণ সভায় বিশ্বের তাবড় তাবড় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গ্রহের যে নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন তা হলো—

১) গ্রহ হতে হলে মহাজাগতিক বস্তুটিকে সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে হবে।

২) মহাজাগতিক বস্তুটির ভর এমন হতে হবে যা তার নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণ বল তৈরী করবে।

৩) নিজস্ব কক্ষপথে মহাজাগতিক বস্তুটির উপগ্রহ ছাড়া অন্য কিছু থাকবে না।

প্লুটোর নতুন পরিচয়

উপরের শর্ত তিনটির মধ্যে একমাত্র তৃতীয়টির ব্যতিক্রম হওয়াতেই প্লুটো গ্রহের স্বীকৃতি হারালো। কারণ, নেপচুনের কক্ষপথের উপর গিয়ে পরেছে প্লুটোর কক্ষপথ। প্রাগের সাধারণ সভায় ধ্বনিভোটে প্লুটো যে গ্রহ নয় সেই সিদ্ধান্ত পাকাপাকিভাবে গৃহীত হয়ে গেল। প্লুটোর যিনি আবিষ্কর্তা তিনিও এই মহাজাগতিক বস্তুটির গ্রহের সম্মান নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। তবে বিজ্ঞানের চিরন্তন নিয়মেই এই ৭৬ বৎসরের পুরোনো ধারণা পরিবর্তত হলো। উন্নততর চিন্তনের দ্বারা পুরাতন ধারণাগুলিকে নতুন আলোকে দেখা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিজ্ঞানেরই একটি অংশ। এখন থেকে সৌরজগতের অধীন মহাজাগতিক যেকোন বস্তুকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা হবে। এই বিভাগগুলি হলো— .

১) ধ্রুপদী গ্রহ বা ক্লাসিক্যাল প্ল্যানেট— বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন (মোট আটটি)।

২) বামন গ্রহ বা ডোয়ার্ফ প্ল্যানেট— প্লুটো, সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহাণু সেরেস এবং ২০০৩ সালের ১৪ই নভেম্বর আবিষ্কৃত গ্রহাণু 2003 UB 310 বা জেনা।

৩) অন্যসব মহাজাগতিক ছোট বস্তু বা মাইনর বডিস।

সুতরাং বলা যায় যে, প্লুটো আমাদের সুবিশাল সৌর পরিবারের সদস্যই থেকে গেল। সৌরজগতের সদস্যদের নাম বলতে গেলে প্লুটোর নাম অবশ্যই উচ্চারিত হবে নবপরিচয়ের মধ্যদিয়ে। তাই শুধু বিজ্ঞানের নিয়মে সংশোধনের স্বার্থে ধ্রুপদী গ্রহের নাম থেকে প্লুটোর নাম বাদ দেওয়া হলো যা কোনভাবেই তার সৌর পরিবারের সদস্যপদে কোন আঘাত হানবে না।

ধারাবাহিক

উপলখন্ড

বামনাই

অরুণ চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জ্যেঠাইমা ছিলেন আমাদের প্রতিবেশিনী। আমাদের ঘরের পশ্চিমে লাগোয়া তাঁর ঘর ছিল। আসলে ওটা ছিল তাঁর শ্বশুরের ঘর। শ্বশুরমশায় ছিলেন তন্ত্রসাধক, কালীভক্ত। তাঁর সন্তান একমাত্র পুত্র ছিল। তিনি তাঁকে বছর এগারো বয়সে বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূ এনেছিলেন। পুত্রবধূর বয়স ছিল সাত কি আট বছর। বিয়ের এক বছরের মধ্যে পুত্র ওলাওঠায় মারা যান। পুত্রবধূ বিধবা হন। পুত্রবধূ শ্বশুর বাড়িতেই থেকে যান। ঐজাতীয় পরিস্থিতিতে অনেক বাল-বিধবা পিত্রালয়ে ফিরে যান। কিন্তু এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটে।

আমি জ্যেঠাইমার শ্বশুরমশায়কে বা তাঁর শ্বাশুড়িকে দেখিনি। কেবল তাঁদের কথা শুনেছি।

জ্যেঠাইমার শ্বশুরমশায়ের অনেক শিষ্য-সেবক ছিল। অধিকাংশ শিষ্য বরিশাল জেলার গৈলা, ফুল্লশ্রী, মাহিলারা প্রভৃতি গ্রামের বাসিন্দা। মূলত বৈদ্য সম্প্রদায়ের। এঁরা অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত পরিবার।

শ্বশুরের মৃত্যুর পর জ্যেঠাইমা ওঁদের দীক্ষা দিতেন। বছরে একবার ঐসব গ্রামের শিষ্য-শিষ্যাদের বাড়িতে যেতেন। সাধারণত শরতের শেষে বা হেমন্তের শুরুতে যেতেন।

ঐসব পরিবারের পুরুষেরা কেউবা স্কুল-কলেজে অধ্যাপনা করতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডঃ সুধীর দাশগুপ্ত প্রমুখ বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতের সেদিনের পুরোধা ব্যক্তিরা ও তাঁদের পরিবার জ্যেঠাইমার শিষ্যদের তালিকায় ছিলেন।

ওঁরা সাধারণত দুর্গাপূজার সময় গ্রামে আসতেন। তখন অনেকে গ্রামে থাকতেন। তবে, তাঁদের পরিবারের নারীরা সাধারণত গ্রামেই থাকতেন। কিছু ব্যতিক্রম ছিল নিশ্চয়ই। তবে, তখনকার দিনে ঐটাই ছিল সামাজিক রীতি।

সরকারী দপ্তরেও অনেক বড় বড় অফিসার ঐসব গ্রামের সন্তান। আই সি এস, আই পি এস থেকে আরম্ভ করে বি সি এস এবং অন্যান্য পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরাও ছিলেন। তাঁদের অনেক পরিবারও জ্যেঠাইমার শ্বশুরের শিষ্য ছিলেন। ওঁরাও পূজার ছুটিতে গাঁয়ে আসতেন।

একবার জ্যেঠাইমা ঐসব শিষ্যবাড়ি যাবার জন্য আমাকে 'চরণদার' সাব্যস্ত করলেন। মহিলাদের পুরুষসঙ্গী ছাড়া বাইরে যাওয়া সামাজিক রীতিতে গ্রহণযোগ্য ছিল না। সে পুরুষ যে বয়সেরই হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। পৌরুষ থাকাও সঙ্গী-বিচারে ভাবার বিষয় ছিল না। সাধারণ বালক, কিশোররাই ঐ চান্স পেত।

এবার জ্যেঠাইমা আমাকেই সঙ্গী ঠাওরালেন। আমার তখন আট কি নয় বছর বয়স। সনের হিসাবে উনিশশ' সাইত্রিশ কি আটত্রিশ সন।

জ্যেঠাইমার প্রস্তাবে মা রাজি হলেন। এর আগে মা ও ঠাকুরমার সাথে বরিশালের উজিরপুর গ্রামে গিয়েছি। উজিরপুর ছিল ঠাকুরমা ও মা উভয়েরই বাপের বাড়ি।

তাই, যাবার পথ মোটামুটি জানা ছিল। ঘন্টেশ্বর নদী থেকে ঘাগর নদী পর্যন্ত রাস্তা বিলম্বিত ছিল। সম্ভবত রাস্তাটা ছিল চন্দ্রদ্বীপের এককালের রাজধানী মাধবপাশা থেকে কোটালিপাড়া পর্যন্ত সংযোগরেখা। বেশ উঁচু রাস্তা। বন্যার জল সে-রাস্তাকে প্লাবিত করতে পারত না। ছোটবেলা ঐ রাস্তার নাম শুনেছি। ছবিখাঁর জাঙ্গাল। 'জাঙ্গাল' মানে রাস্তা। হুগলী জেলার কোন্নগর পৌরসভায় এখনো 'জাঙ্গাল' শব্দযুক্ত রাস্তা আছে।

বরিশাল-কোটালিপাড়ার সংযোজক এ রাস্তার নাম ছবিখাঁর

জাঙ্গাল হবার পিছনেও একটা জনশ্রুতি সেদিন শুনেছিলাম। ছবিখাঁ নাকি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দি খাঁর কোতোয়াল ছিলেন। সঠিক কিনা তা জানি না। তিনি নাকি কোটালিপাড়ার সাথে সংযোজক ঐ রাস্তা বা জাঙ্গাল তৈরি করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত কোটালিপাড়া বরিশাল বা বাখেরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নবাবী আমলে নিঃসন্দেহে তাই ছিল, সম্ভবত কোটালিপাড়া পরগণা চন্দ্রদ্বীপের রাজপরিবারের 'রাজত্বে'র মধ্যে ছিল।

ছবিখাঁর জাঙ্গাল নামে অভিহিত বা পরিচিত সরণির পাশে বরাবর খাল ছিল। শোনা যায়, ঐ খালও ছবিখাঁরই তৈরি। তিনি নবাবের অনুমতি ছাড়া নাকি ঐ খাল ও রাস্তা তৈরি করেন। ঐ অবাধ্যতার জন্য তাঁকে নবাবের নির্দেশে কোতল করা হয়েছিল। এটাও নিছক জনশ্রুতি কিংবা ইতিহাস, তাও জানি না। তবে, জনশ্রুতির পিছনে বা তার আড়ালে লৌকিক ইতিহাসের কিছু অলিখিত উপাদান লুকানো থাকে। তার পাথুরে প্রমাণ বা সরকারী গেজেটিয়ারের প্রমাণ বা প্রামাণ্য নথিপত্র না থাকলেও ঐসব জনশ্রুতিকে ফাল্‌তু বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

জ্যেঠাইমার সাথে ঐ খালের পথে নৌকায় চড়েই চললাম তাঁর শিষ্যবাড়িতে। নৌকাচালক বা মাঝি আমাদের গ্রামেই এক নমঃশুদ্র। তার নিজস্ব নৌকা ছিল। আলিধাপাড়ের অছিরদ্দি মিঞার কয়েকখানা নৌকা ছিল। তার কাছ থেকেই দৈনিক ভাড়াতে ঐ নৌকা নেওয়া হয়েছিল। অছিরদ্দি দেড়ানি চৌধুরীদের প্রজা ছিল। ধানচালের ব্যবসা করে তিনি কয়েকখানি নৌকা করেছিলেন। ওঁর ছোটভাই করিম ছিল আমার সহপাঠী। অনেকদিন পরে গতবছর জুন মাসে তার সাথে দেখা হলো আমাদের এককালের তালুকদারির অন্তর্গত বাজার বা দেড়ানির বাজারে। ক্লাস সেভেনেই করিম ধানের ব্যবসায় দাদার সহকারি হয়েছিল। এখন করিম বৃদ্ধ। বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়। পাকা দাড়ি, চুলতো অবশ্যই পাকা। দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর পরে দেখা হলো তার সাথে। আমি আজ 'ভারতীয়'। আর করিম বাংলাদেশি। মাঝখানের বাঁশের সাঁকো ইংরাজরা এককলমের খোচায় ভেঙে দিয়ে গিয়েছে।

কোটালিপাড়া তখন ছিল ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত। মহকুমা গোপালগঞ্জ। এখন গোপালগঞ্জ একটি জেলা।

কোটালিপাড়ার পূর্ব সীমানায় বরিশাল জেলার গৌরনদী থানা বা বর্তমান উপজেলা। কোটালিপাড়ার সীমানা পার হলেই পয়সার হাট। তার অবস্থান গৌরনদী থানায়।

আমরা বেরিয়েছিলাম কিছুটা বেলায়। যতদূর মনে আছে, গৌরনদীর পরে বরিশালের সদর মহকুমার শিকারপুর থানা। শিকারপুর থানা ছিল ঘন্টেশ্বর নদীর পাড়ে।

'মনসামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা বিজয় গুপ্তের জন্মস্থান ফুল্লশ্রী গ্রাম। তিনি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছিলেন,— 'পশ্চিমে ঘাগর নদী, পূর্বে ঘন্টেশ্বর। মাঝখানে অবস্থিত ফুল্লশ্রী নগর।'

'পয়সার হাট' পার হয়ে আমাদের নৌকা এগোচ্ছে মাহিলারার দিকে। একে একে গ্রাম পার হচ্ছি। কৈশোরের জিজ্ঞাসু চোখে দেখে যাচ্ছি। চারপাশ দেখছি। খালে যাতায়াতকারি নৌকা দেখছি। দেখছি পাড়ের গ্রাম। সবনাম তো এখন মনে নেই। সাহেবের হাট। মিশনারিদের চার্চ। স্কুল-হাসপাতাল এইসব। গ্রামের নাম ছবিখাঁর পাড়। ছবিখাঁর কি মূল কর্মক্ষেত্র ছিল ঐ গ্রাম?

এলাম গৈলা। ফুল্লশ্রী তার পাশে। জ্যেঠাইমা দেখতে গেলেন বিজয় গুপ্তের পূজিতা মা মনসাকে। পূজা দিলেন। মাঝিও পূজা দিল। এলাম আগৈলঝাড়া। শুনলাম, খাল কাটার সময় কাটিয়ে শ্রমিকরা এখানে তাঁদের মাটিকাটার ঝুড়ি ঝেড়েছিল। সেই মাটিতে নাকি তৈরি ঐ গ্রাম।

ঐ গ্রামে হাইস্কুল করেছেন ভ্যাগাই হালদার বা ভাগ্যধর হালদার। নিরক্ষর এক নমঃশূদ্র। নিজের জমিজমা সব বিক্রি করে স্কুল করলেন। উদ্দেশ্য, তাঁর 'স্বজাতি' নমঃশূদ্রদের জ্ঞানচক্ষু ফোটানো। তাঁর স্কুল গড়ার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার কাহিনি নিয়ে 'গণশক্তি'তে লিখেছিলাম এক সময়ে। শুনেছি, হালে কে একজন ওঁর জীবনী লিখেছেন। লেখারই মতো সে জীবনী। অশ্বিনীকুমার দত্তের শিষ্য এক 'পাগল'কে আমি দেখেছি ঘাগরের হাটে। স্কুলের ছাত্রাবাসের সব নমঃশূদ্র শিক্ষার্থীদের আহার্যের জন্য তিনি তিন/চারটা হাটে চাল-ডাল-তরকারি অর্থাৎ যাবতীয় দ্রব্যাদি 'সংগ্রহ' করতেন। চল্‌তি ভাষায় 'ভিক্ষা' বা বৈষ্ণবদের ভাষায় 'মাধুকরী' করে বেড়াতেন।

প্রসঙ্গত লিখি, প্রখ্যাত তপশীল সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত নেতা প্রয়াত যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের কোনো ছাত্রের স্কুলের মাইনে বা হোস্টেলের খাওয়া-থাকার খরচ দিতে হতো না, তা যোগাতেন ভ্যাগাই হালদার।

এবার মাহিলারা। তারপরেই লক্ষণকাঠি, যশোরকাঠি ও কাট্যাজোড়। বাটাজোড়ের সন্তান অশ্বিনীকুমার দত্ত।

মাহিলারায় যখন পৌছেছি, তখন সূর্য পশ্চিম গগনে হেলে পড়েছে। দেখে মনে হচ্ছিল, সূয্যিমামা আমাদের গ্রামের মাথাতেই ডুব দিচ্ছে। সম্ভবত ঘাগর নদীর টল্‌টলে জলে সূয্যিমামা মিলিয়ে গেল।

খালের পাড়েই গ্রাম। খালে নৌকা বেঁধে আমরা নামলাম পাড়ে। জ্যেঠাইমার হাত ধরে পৌঁছালাম এক বাড়িতে। বড় বড় সব বাড়ি। টিনের বাড়িই বেশি। সম্ভবত দুই/চারটা

দালান-বাড়িও ছিল। তবে, সংখ্যায় বেশি টিনের বাড়ি। পোস্তা বাঁধানো। বেড়াও টিনের। ফ্রেম সুন্দরি কাঠের। দরজা লোহা কাঠ বা মেহগিনী কাঠের। অথবা বার্মাটিকের। অর্থাৎ ব্রহ্মদেশের সেগুন কাঠের।

সুসজ্জিত গৃহাভ্যন্তর। সুবেশা মহিলারা সব। কোন্ বাড়িতে প্রথম উঠেছিলাম, তার গৃহকর্তার নাম মনে নেই। যতদূর মনে পড়ে, ঐ বাড়ির মালিক ছিলেন ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত। বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্য জগতে সুপরিচিত এক নাম।

সে যুগে তো চা-এর খুব প্রচলন ছিল না। জ্যেঠাইমা সারাদিন জলস্পর্শ করেননি। নৌকার মাঝি নমঃশূদ্র। সেখানে জল খাবেন কী করে ?

আমি চিড়া ও কলা খেয়েছি। পয়সার হাটে দইও খেয়েছি। আমার সমস্যা ছিল না। কারণ, আমার তখনও পৈতা হয়নি। কাজেই, ব্যাপটাইজড হয়নি। পুরো ব্রাহ্মণ্যত্বে অভিষিক্ত হইনি। তবে, নমঃশূদ্র মাঝির নৌকায় বসে ভিজা চিড়া খাওয়া চলবে না। তাই, নৌকা থেকে নেমে খেয়েছি।

শিষ্যবাড়ির মহিলারা জ্যাঠাইমার রান্নার যোগাড়যন্ত্র করে দিলেন। কিন্তু সূর্যাস্তের পরে তো তিনি ভাত খাবেন না। তাই, ময়দার ব্যবস্থা হলো। তার সাথে ঘি।

আমার জন্য লুচিভাজা এলো। তার সাথে নানারকম মিস্টি। আমারতো তা খেতে কোনো বারণ নেই।

খাবার পরে পথের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত গোটা দশেকের সময় এক মাঝারি বয়সী মহিলা আমার ঘুম ভাঙালেন। দেখতে আমার মায়েরই মতো। তবে, মায়ের চেয়ে বয়স কম। সুন্দরী ও সুবেশা। আলুলায়িত কুন্তলা। ঘুম ভেঙে তাঁকে দেখে মা-র কথাই মনে হলো। তিনি চোখে জল দিলেন। একেবারে কোলে তুলে নিয়ে খাবার পিড়িতে বসালেন।

জ্যেঠাইমাও বসে আছেন কাছেই। হরিণের চামড়ার উপর তিনি উপবিষ্টা। শিষ্যবাড়িতে কাষ্ঠাসনে বসা নিষিদ্ধ। খাবার থালা তার শ্বেতপাথরের। জল পাথরের কমন্ডলুতে। দুগ্ধাদি দেওয়া আছে পাথরের বাটিতে। কাঁসা বা পিতলের বাসনও চলবে না। দুধ তিনিই জ্বাল দিয়েছেন। ঘন ক্ষীরের মতো দুধ।

আমার কাষ্ঠাসন। কাঁঠাল কাঠের পিড়ি। সামনে রূপার থালায় ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ ও পরমান্ন। রূপোর গ্লাসে জল।

ঘুম ভাঙা চোখে ভাতের থালা দেখে আমার সুপ্ত ব্রাহ্মণ্যত্ব জেগে উঠল। আমি বলে উঠলাম যে, বদ্যিবাড়ির রান্না খাব না।

সবাই অবাক। জ্যেঠাইমা বললেন, তোর তো এখনো পৈতে হয়নি। তুই খেতে পারিস।

আমি নাছোড়বান্দা। গুম হয়ে মুখটা ভারি ক'রে হাত গুটিয়ে বসে রইলাম।

যিনি আমার ঘুম ভাঙিয়ে কোলে করে নিয়ে এলেন সেই মাতৃরূপাও বললেন, খাও বাবা, কিছু হবে না। তোমার জাত যাবে না।

ছোটবেলা থেকে শুনেছি যে, বামুন বাড়ি ছাড়া, অন্য জাতের বাড়িতে রান্না ভাত খাওয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। সেখানে ফলাহার বা ফলার চলবে। তবে, বৈদ্য ও কায়স্থ পর্যন্ত। তার নিচে নয়।

এখন, মহা টানাপোড়েনে পড়লাম। কী করণীয় তা ভেবে কুলকিনারা করতে পারছিলাম না। বেশ কিছুক্ষণ কাটল।

অবশেষে জ্যেঠাইমা চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করলেন।

বললেন, খেয়ে নে। বাড়িতে গিয়ে গঙ্গাজল খেয়ে নিলেই হবে। চমৎকার সমাধান।

অগত্যা ভাতে হাত দিলাম। যে মহিলা আমার ঘুম ভাঙিয়েছিলেন, তিনি এবার খুব হাসলেন। আর আমাকে ছুঁয়ে দিয়ে গাল টিপে আদর করলেন। অন্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও হাসলেন।

এক বৃদ্ধা বললেন, বামুনঠাকুর, প্যাট ভরে খাইও। নিজে হাসতে গিয়েও বেধে যাচ্ছে, হাসা যাচ্ছে না। মনে মনে বললাম, পেটে যখন ক্ষুধা আছে, তখন খাবার বেলায় কোনো গাফিলতি হবে না।

জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আজ ভাবি, সেদিন কী বোকামিই করেছিলাম, সংস্কার বলে মানুষকে কত ছোট করে দেখেছিলাম।

ব্রাহ্মণ্যত্বের মর্যাদা জাহিরকারী সেই আমি ১৯৪৭ সনে নমঃশূদ্রের ভাত খেয়ে কোটালিপাড়ার ব্রাহ্মণসমাজ তথা তালুকদার সমাজে মহা হৈ চৈ লাগিয়ে দিয়েছিলাম। ঐ ভাত খাওয়ার 'বিপ্লব'-এর খবর ছাপা হলো সেদিনের আনন্দবাজার পত্রিকায়। অনেকদিন পরে সেই পুরানো দিনের কীর্তিকলাপের কথা আমাকে ঢাকায় শুনিয়েছিলেন ন্যাশনাল আওয়ামী দলের এক প্রবীণ নেতা।

২৭শে মে, ২০০৬

(চলবে)

এ বি টি এ-র সভাপতি হিসাবে সত্যপ্রিয় রায়ের ২৪.০১.১৯৭৩ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতার মূল পাঠ

বঙ্গানুবাদ করেছেন – ডঃ সুহাস ভট্টাচার্য

প্রধান শিক্ষক, রিষড়া হাইস্কুল, হুগলী

মাননীয় সভাপতি, সভাপতিমন্ডলীর সহযোগী, সদস্যগণ এবং সাথী প্রতিনিধিবৃন্দ,

আমাদের সংগঠন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি এবং সেই বিষয়ে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষকদের পক্ষে, এটি আমার আনন্দের বিষয় যে, মন্ পল্ ডিলানো ও মন্, মরিস ডেলমাল, এফ আই এস ই-র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, এবং তাঁদের সহকর্মীরা যথেষ্ট অসুবিধা সত্ত্বেও এই এশিয় আলোচনায় যোগদান করে চলেছেন। এই আলোচনায় উপস্থিত এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দকেও আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানাই।

আমাদের নিজ নিজ দেশে যে শিক্ষাসংক্রান্ত বিচিত্র সমস্যার মুখোমুখি আমরা হই এবং বিশেষ করে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিতে শিক্ষক সংগঠনের অবদান ও উচ্চশিক্ষার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার চমৎকার সুযোগ করে দিয়েছে এই আলোচনাসভা।

শিক্ষক সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে উদ্বোধনী অধিবেশনে একটি সুলিখিত পত্র উপস্থাপন করেছেন এফ আই এস ই-র সহ-সভাপতি ম্যাকাউই কুগর্লি। তিনি বিষয়টি অত্যন্ত দৃঢ় ও নির্ভীকভাবে বলেছেন এবং আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাই। তাঁর পত্রে তিনি আমাদের সেই সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন, যা আমরা শিক্ষকদের একমাত্র সংগ্রামরত আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে এফ আই এস ই'র কাছে আশা করেছিলাম।

দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের দেশে শিক্ষাকে সেই পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি যতটা দরকার ছিল দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনার জন্য, যে দেশটি প্রায় দু'শ বছরের ব্রিটিশ শাসনের পর মুক্ত ও স্বাধীন দেশ হিসাবে উঠে এসেছে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার গত পঁচিশ বছরে নিরক্ষরতা অত্যন্ত দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে এবং আজ বিশ্বের মোট নিরক্ষর মানুষের অর্ধেকের বেশি, সংখ্যায় যা ৭০ কোটি, আমাদের এই তমসাচ্ছন্ন দেশে বসবাস করেন। এমনকী চীন, উত্তর কোরিয়া এবং ভিয়েতনামের মতো এশিয় দেশগুলি কার্যত তুলনামূলক কম সময়ে নিরক্ষরতাকে মুছে ফেলেছে।

ভারতবর্ষে দেশের মোট জাতীয় আয়ের ২.৯% খরচা করা হয় শিক্ষাক্ষেত্রে, যখন এমনকী মায়ানমার (বার্মা), শ্রীলঙ্কা, কাম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনামের মতো আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে এই উদ্দেশ্যে তাদের মোট জাতীয় আয়ের ৪%-এর বেশি ব্যয় করা হয়।

আমাদের বলা হয়েছে যে এই সময়ে শিক্ষকদের বেতন দ্বিগুণ করা হয়েছে। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে ৫০০%-এরও বেশি এবং বাস্তবে পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে আমাদের বেতন অর্ধেক করা হয়েছে।

আমাদের দেশে শিক্ষা নিম্নমানের এবং জীবনের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন।

শিক্ষকদের জীবনযাপনের মান যথেষ্ট নিম্ন এবং তাঁদের সংগঠনগুলি অসহায়, দুর্বল ও বিভক্ত। সরকারি কর্তৃপক্ষও শিক্ষক সংগঠনগুলির সমৃদ্ধিকে উৎসাহিত না করে বরং এগুলিকে দমন করার চেষ্টা করছেন। এ ব্যাপারে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের মধ্যে বাইশজনকে হত্যা করা হয়েছে সমাজবিরোধীদের দ্বারা এবং তাঁদের মধ্যে অনেককেই বিনাবিচারে MISA ও PDA-র অধীনে আটক রাখা হয়েছে ও পাঁচশজনকে হত্যার

হুমকি দিয়ে বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়া থেকে বিরত রাখা হচ্ছে। রাজ্য সরকার চরম নিষ্ক্রিয় এবং পরোক্ষভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই গুণ্ডামিকে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছেন।

শিক্ষক সংগঠনগুলিকে 'ট্রেড ইউনিয়ন' গঠনের অধিকার দেওয়া হয়নি, যদিও ভারত সরকার শিক্ষকদের মর্যাদার উপরে ইউনেস্কো/এল আই সি-র নথি মঞ্জুর করেছিল।

আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষকদের 'ট্রেড ইউনিয়ন' গঠনের অধিকারের লড়াই-এর সঙ্গে লড়াই করতে হবে উন্নততর শিক্ষার জন্যও যা একটি সামাজিক পরিবর্তন আনায় সাহায্য করবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ও সব ধরনের শোষণ বন্ধ করবে। আমরা ঘৃণা করি সাম্রাজ্যবাদকে এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনামের উপর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন আগ্রাসনকে।

আমরা জেনে অত্যন্ত আহত হয়েছি যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অমানবিক এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এইরকম ঘটনাকে 'অপরাধমূলক' ঘোষণা করে আমরা দাবি করছি যে শিক্ষাবিরোধী এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

এফ আই এস ই এবং আলোচনাসভা এ বিষয়ে আমাদের প্রেরণা দিয়েছে এবং আমরা পুনরায় এফ আই এস ই ও আমাদের মতো এশিয়াবাসী সাথীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এ বিষয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমাদের অবশ্যই লড়াই করতে হবে উপনিবেশবাদের উত্তরাধিকার, নব্য-উপনিবেশবাদ, সামন্ততন্ত্র, জাতপাত ও আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। আমাদের অবশ্যই লড়তে হবে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র এবং বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য।

সরকার শিক্ষার জাতীয়করণের দায়িত্ব অস্বীকার করছে। শিক্ষা আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেসরকারী বিষয় এবং আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে বিভিন্ন স্তরের মানুষের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য। বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে শিক্ষকদের কর্মপরিস্থিতি ও শিক্ষার মানের পার্থক্য রয়েছে।

সরকার শিক্ষাকে একটি মহান উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় কাজ হিসাবে গণ্য করতে চান এবং শিক্ষকদের উচিত নয় শুধুমাত্র বেতনভোগী হিসাবে কাজ করা। আমরা প্রকৃত অর্থে, দেশের কর্মী সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ি এবং তাঁদের সঙ্গে আমাদের লড়তে হবে 'ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ও শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সম্পূর্ণ জাতির রাজনৈতিক অধিকারের জন্য।

এই আলোচনাসভা এ বিষয়ে আমাদের সংগ্রামকে শক্তিশালী করবে। আমরা আবার ধন্যবাদ জানাই এফ আই এস ই-র কর্মচারীবৃন্দকে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে এই আলোচনাসভায় যোগদানকারী, তাদের সহকর্মীবৃন্দ ও প্রতিনিধিবৃন্দকে।

বিভিন্ন দেশের শিক্ষক সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের একনিষ্ঠতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আমাদের অতি সামান্য সামর্থ অনুসারে, ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারি, সন্ধ্যা ৬-৩০ টায়, এ বি টি এ কক্ষে, ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের জন্য একটি অভ্যর্থনার আয়োজন করেছি। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হবো যদি সাথী প্রতিনিধিবৃন্দ আমাদের এই যৎসামান্য কিন্তু হার্দিক আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

এফ আই এস ই দীর্ঘজীবী হোক

শিক্ষকবৃন্দের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক

(টিচারস্‌ জার্নাল/ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩)

মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬-এর ওপর রাজ্যের সকল শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠনের আলোচনার জন্য ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০০৬ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় পার্থ দে কর্তৃক আহূত সভায় পঠিত

মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬ সম্পর্কে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির অভিমত

১৯৯৩ সালে নয়াদিল্লিতে ইউনেস্কো সকল শিশুর জন্য শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। ঐ সম্মেলন থেকে প্রারম্ভিক শিক্ষাকে (৬ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের) সম্পূর্ণভাবে সর্বজনীন করা এবং নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়েছিল। ঐ সম্মেলন শেষে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসীমা রাও ভারতে প্রারম্ভিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।

এই অঙ্গীকার গ্রহণের বারো বছর পরে আমরা লক্ষ্য করছি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের যে শিশুরা এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে গিয়েছে, সারা বিশ্বে তাদের সংখ্যা ১০ কোটি ৩০ লক্ষ — তারমধ্যে ভারতে ২ কোটি ১০ লক্ষ। বিশ্বের ১৭ শতাংশ মানুষের বাস যে ভারতে, সেখানে বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা বিশ্বের মোট শিশুদের ২০·৪ শতাংশ রয়ে গেছে।

মাননীয় অর্জুন সিং এখন কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর তত্ত্বাবধানে গত ১৬ই জুন, ২০০৬ সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক (৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্তদের শিক্ষা) শিক্ষা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব দেশের রাজ্য সরকারগুলির কাছে পাঠানো হয়েছে। এই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, কেন্দ্র এই সম্পর্কে আর কোনও আইন তৈরি করবে না। রাজ্যগুলিকেই আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং সেই আইনের একটি নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। নামঃ মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬। এরসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাসচিব চম্পক চ্যাটার্জির একটি চিঠি রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে। এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা। বিষয়টি সংসদে আলোচিত হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলন ডেকে বিলটি আলোচনা করার কোনো সুযোগও দেয়নি। সর্বজনীন আবশ্যিক প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তার কোনো কথাই বলা হয়নি। উপরন্তু, রাজ্যগুলিকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, রাজ্য বাজেটের ব্যয়ের প্রধান ও প্রথম খাত হবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং দ্বিতীয় প্রধান খাত হবে শিক্ষা। শিক্ষাটা কিন্তু যুগ্ম তালিকাতেই আছে। কাজেই দায়িত্বটা বর্তমানে উভয়েরই।

বর্তমানে রাজ্যগুলি তার বাৎসরিক ব্যয়-বরাদ্দের ১২ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ ধার্য করে শিক্ষার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান আর্থিক বছরে বরাদ্দ করেছে তার মোট ব্যয়-বরাদ্দের ৪·৩ শতাংশ। আজও কেন্দ্রীয় সরকার জি ডি পি'র ৬ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করলো না। সুতরাং রাজ্যগুলির প্রতি এই উপদেশ বর্ষণ অর্থহীন। রাজ্যগুলিকে এই বিল গ্রহণ করার জন্য টাকার টোপ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, যে-রাজ্য কেন্দ্রের বর্তমান প্রস্তাব পুরোপুরি মানবে না, সেই রাজ্য একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্প বাবদ অনুমোদিত ব্যয়ের ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে পাবে। আর যে-রাজ্য অক্ষরে অক্ষরে কেন্দ্রীয় প্রস্তাব মেনে নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তারা ঐ প্রকল্প বাবদ অনুমোদিত ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ

পাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে। রাজ্যগুলির পক্ষে এই শর্ত অসম্মানজনক।

রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৫-এর অনেক ত্রুটি ছিল কিন্তু ঐ বিলের সেকশন ৯-এ বলা হয়েছিল ঃ

Provision of free and compulsory education shall be the concurrent responsibility of the Central and the appropriate Governments with the Central Governments' responsibility consisting of the following:

i) Provision of financial assistance of State Government in accordance with such formula regarding sharing of costs of implementation of this Act, as the Central Government may determine from time to time in consultation with the State Governments. In addition to it four other subsections were provided to elaborate the Central Governments responsibilities.

ii) In section 10 of chapter III the responsibility of the appropriate Government i.e. the State Government was also indicated elaborately.

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬-এ কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব কী কী তার কোনো উল্লেখ নেই।

আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো ঃ শিক্ষাকে রাজ্য তালিকায় ফিরিয়ে দিতে হবে ও কেন্দ্রীয় সরকারকেই প্রারম্ভিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য সমস্ত আর্থিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব বহন করতে হবে এবং মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল পুনর্বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারকেই আইন প্রণয়ন করতে হবে।

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক
নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

আটটি বাম শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনের উদ্যোগে যৌথ কনভেনশন

বিষয় ঃ মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬

সত্যপ্রিয় ভবন ● ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০০৬



যৌথ কনভেনশনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ভবেশ মৈত্র।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সঙ্ঘ, প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘ, বঙ্গীয় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমিতি, বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, সারা বাংলা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমিতি, সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি — এই আটটি বামপন্থী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনের উদ্যোগে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০০৬ সত্যপ্রিয় ভবনে 'মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬-এর ওপর আলোচনার জন্য একটি যৌথ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীভবেশ মৈত্র এবং রাজ্যের প্রাক্তন বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন শ্রীভবেশ মৈত্র।

কলকাতা জেলার সমিতির সদস্যবৃন্দ রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে কনভেনশনের সূচনা করেন। উদ্বোধনী সঙ্গীতে অংশগ্রহণকারীদের নাম ঃ শ্রীমতী শিখা বিশ্বাস, ডালিয়া ঘোষ, ও শ্রীঅর্ধেন্দু কুমার। এঁদের তবলায় সহযোগিতা করেন

শ্রীসুব্রত সেন। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন সমিতির অন্যতম সহ-সাধারণ সম্পাদক শ্রীনির্মলেন্দু গুহ।

আটটি বাম শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনের পক্ষ থেকে কনভেনশনের মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

প্রস্তাব

১৯৯৩ সালে নয়াদিল্লিতে ইউনেস্কো সকল শিশুর জন্য শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। ওই সম্মেলন থেকে প্রারম্ভিক শিক্ষাকে (৬ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের) সম্পূর্ণরূপে সর্বজনীন করা এবং নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়েছিল। ওই সম্মেলন শেষে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসীমা রাও ভারতে প্রারম্ভিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।

এই অঙ্গীকার গ্রহণের বারো বছর পরে আমরা লক্ষ্য করছি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের যে শিশুরা এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে গেছে, সারা বিশ্বে তাদের সংখ্যা ১০ কোটি ৩০ লক্ষ — তারমধ্যে ভারতে ২ কোটি ১০ লক্ষ। বিশ্বের ১৭ শতাংশ মানুষের বাস যে ভারতে সেখানে বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা বিশ্বের মোট শিশুদের ২০·৪ শতাংশ রয়ে গেছে।

মাননীয় অর্জুন সিংহ এখন কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর তত্ত্বাবধানে গত ১৬ই জুন '০৬ সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক (৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্তদের শিক্ষা) শিক্ষা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব দেশের রাজ্য সরকারগুলির কাছে পাঠানো হয়েছে। এই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, কেন্দ্র এই সম্পর্কে আর কোনও আইন তৈরী করবে না। রাজ্যগুলিকেই আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং সেই আইনের একটি নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। নাম ঃ মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬। এরসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা সচিব শ্রীচম্পক চ্যাটার্জীর (আই এ এস) একটি চিঠি রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে। এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা। বিষয়টি সংসদে আলোচিত হয়নি। সর্বজনীন আবশ্যিক প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তার কোনো কথাই বলা হয়নি। উপরন্তু, রাজ্যগুলিকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, রাজ্য বাজেটের ব্যয়ের প্রধান ও প্রথম খাত হবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দ্বিতীয় প্রধান খাত হবে শিক্ষা। শিক্ষাটা কিন্তু যুগ্ম তালিকাতেই আছে।

বর্তমানে রাজ্যগুলি তার বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দের ১২ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ ধার্য করে শিক্ষার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান আর্থিক বছরে বরাদ্দ করেছে তার মোট ব্যয় বরাদ্দের ৪·৩ শতাংশ। আজও কেন্দ্রীয় সরকার জি ডি পি'র ৬ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন না। সুতরাং রাজ্যগুলির প্রতি এই উপদেশ বর্ষণ অর্থহীন।

রাজ্যগুলিকে এই বিল গ্রহণ করার জন্য টাকার টোপ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, যে রাজ্য কেন্দ্রের বর্তমান প্রস্তাব পুরোপুরি মান্য করবে না, সেই রাজ্য একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্প বাবদ অনুমোদিত ব্যয়ের ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে পাবে। আর যে রাজ্য অক্ষরে অক্ষরে কেন্দ্রীয় প্রস্তাব মেনে নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তারা ওই প্রকল্প বাবদ অনুমোদিত ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ পাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে। রাজ্যগুলির পক্ষে এই শর্ত অসম্মানজনক।

আজ কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার একদিকে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের প্রয়াস চালাচ্ছে, অন্যদিকে প্রারম্ভিক শিক্ষা বিস্তারের সমস্ত আর্থিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব থেকে চতুরালি করে দূরে সরে যাচ্ছে বিশ্বায়নী উদারনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে। দেশব্যাপী এর বিরুদ্ধে শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই জরুরী কাজটির অঙ্গ হিসাবেই আজকের এই কনভেনশন আহ্বান করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই কনভেনশন শিক্ষার ওপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়ার উদ্দেশ্যেই আহূত।

আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো ঃ কেন্দ্রীয় সরকারকেই প্রারম্ভিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য সমস্ত আর্থিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব বহন করতে হবে এবং এজন্য সংসদে কেন্দ্রীয় সরকারকেই আইন প্রণয়ন করতে হবে।

অধ্যাপক ভবেশ মৈত্র ঃ উদ্বোধনী বক্তব্য

আটটি বাম শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠন আহূত আজকের কনভেনশনে উত্থিত প্রস্তাব আপনারা শুনেছেন। একটা সাংবিধানিক বিষয় নিয়ে আলোচনাটা এসে গেছে। রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতির ৪৫নং ধারায় বলা হয়েছে, ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত ছেলেমেয়েকে আবশ্যিক শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। 'The State'-এর। যাতে দশ বছরের মধ্যে এটা রূপায়িত হতে পারে সে জন্য সরকার চেষ্টা

করবে। ১৯৫০ থেকে ভারতীয় সংবিধান চালু হলো। ১৯৬০ সালের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত ছেলেমেয়ে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুযোগ পাবে। এ কথা ঘোষিত হলো। এখন ওখানে ইংরেজিটা ছিল 'endeavour' এই কথাটাকে ব্যবহার করেছে সরকার। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৪৫নং ধারাকে বাস্তবায়িত করতে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে, এই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আমরা দেখেছি, এই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই লক্ষ্যের ধারেকাছেও যেতে পারেননি। এখন সরকার নেতৃত্ব দিতে পারেন নি, এখন শিক্ষকরা দায়ী, অভিভাবকরা দায়ী — একথা বললে একটা রাষ্ট্রের দায় চলে যায় না। ধরা যাক, আমাদের দেশটা কেউ দখল করে নিল, তখন যদি সরকার বলে দেশের লোকে রুখল না, তাই অন্য রাষ্ট্র এসে আমাদের দেশটা জয় করে নিল। তাহলে কী দাঁড়ায়? এভাবে তো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়া যায় না। যে দায়িত্ব নেওয়া সে দায়িত্বপূরণ করা সরকারের একান্ত কর্তব্য। সে কর্তব্য পালন করতে না পারলে তার সঠিক জবাব নাগরিকদের কাছে দিতে হবে। নাগরিকরা জবাবদিহি চাইতে পারেন। ১০ বছরে, ২০ বছরে, ৩০ বছরে, ৪০ বছরে, ৫০ বছরে — এইভাবে বারে বারে আবশ্যিক শিক্ষা নিয়ে বিল বানানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু তারপরেও কী অবস্থা! সাক্ষরতার কী অবস্থা! প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারের কী অবস্থা! কত অংশ ছেলেমেয়ে সেখানে যাচ্ছে? পেছিয়ে-পড়া অংশের ছেলেমেয়েদের কত অংশ যাচ্ছে? এই অগ্রগতির হার শ্লথ। বিশেষ করে, আমরা দেখি মুসলিম মেয়েদের মধ্যে, যেমন নিরক্ষরতার ক্ষেত্রে, স্কুলে না যাওয়ার ক্ষেত্রে, বা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করার ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা বিশাল। এটা সারা দেশব্যাপী। কোনো রাজ্যে এটা কম, ওটা বেশি, আবার কোনো রাজ্যে ওটা কম, এটা বেশি। এই পশ্চাদপদতা রয়েই গেছে।

এর পাশাপাশি শিক্ষক সংগঠনগুলি শিক্ষা আন্দোলন করে, যার মধ্যে ছাত্র-যুবা সবাই যুক্ত ছিলেন, বারে বারে তুলে ধরেছেন আবশ্যিক শিক্ষার দাবিকে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারের কাছেই। আমরা দেখেছি কতকগুলো রাজ্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিছু রাজ্য বেশ পিছিয়ে আছে। কেন্দ্রীয় উদ্যোগের মধ্যে সত্যিকারের যে সদিচ্ছা তা দেখতে পাওয়া যায়নি। এবং বড় বড় যে সব কমিশন, আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় ক্ষেত্রে, গঠন করা হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় রাজনৈতিক সদিচ্ছা যদি না থাকে তা হলে এই ধরনের সমস্যার সমাধান করা যায় না। যে রাজনৈতিক দল এই রাষ্ট্র পরিচালনা করবে (মানে ভারতরাষ্ট্র, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার উভয়ই) তাদের যদি রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকে তা হলে এত বড় কাজ হতে পারে না। কোনো কোনো রাজ্যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা বেশি, কোনো কোনো রাজ্যে কম। আবার কোনো কোনো রাজ্যে নেই বললেই হয়, তারা এটাকে অবহেলাই করেছে। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য। সুপ্রীম কোর্টে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতির ওপর একটি মামলা হয়। সেই মামলা 'উন্নিকৃষ্ণণ-মামলা' নামে প্রখ্যাত। সুপ্রীম কোর্ট ঐ মামলায় নির্দেশ দেয় যে রাষ্ট্রের প্রতি যে নির্দেশ ছিল রাষ্ট্র তা পালন করতে গাফিলতি করেছে। রাষ্ট্র যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। বলা হলো, ৬-১৪ বছর পর্যন্ত বালক-বালিকার শিক্ষাকে 'মৌলিক অধিকারে'র অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সংবিধানের ৮৬তম সংশোধনী আইন, ২০০২-এর দ্বারা তখন ২৯-এ নামে একটি নতুন ধারা ('রাইট টু এডুকেশন') সংবিধানের পার্ট-থ্রি ('ফান্ডামেন্টাল রাইট')-এর অন্তর্ভুক্ত করা হলো। ২১-এ ধারায় বলা হলো : "The State shall provide free and compulsory



যৌথ কনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় পার্থ দে।

education to all children of the age of 6-14 years in such manner as the state, may, by Law, determine."

এরপরে ঐ ০-৬ বছরের বালক-বালিকার শিক্ষার বিষয়টা নির্দেশাত্মক নীতিতেই রাখলেন এবং বললেন যে রাষ্ট্র অতিশৈশবকালীন শিক্ষা (Early Childhood Education) দেবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

কে করবে? ২১-এ ধারায় বলা হলো 'The State'. এখন দেখা যাক 'The State' বলতে সংবিধানে কী বোঝানো হয়েছে :

'The term 'The State' has been clearly defined in Part III Fundamental Rights of the Constitution which runs as follows, "Unless the content otherwise requires, "The State" includes the government and Parliament of India and the Legislature of each of the State and all local and other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India."

অর্থাৎ এটা একটা concurrent responsibility.এটা শুধু পঞ্চায়েতের দায়িত্ব, শুধু মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্ব বা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব বা রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব — বিষয়টা তা নয়। দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের। ৬-১৪ বছরের বালক-বালিকার শিক্ষা যে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি পেল এটা কার্যকর করা কার দায়িত্ব? 'The State'-এর।

কেন্দ্রীয় সরকার, পার্লামেন্ট, রাজ্য সরকারগুলি এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক সংস্থাগুলি মিলে দায়িত্ব বহন করবে — অর্থাৎ যৌথ দায়িত্ব।

It is the responsibility of all these state organs.

২০০২ সালে ৮৬তম সংশোধনীর পর কেন্দ্রে এন ডি এ সরকার ছিল। এন ডি এ সরকার খসড়া বিল তৈরি করলেন 'রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০২'। এই খসড়া নিয়ে নানা সমালোচনা হয়। দু'বার তিনবার খসড়া তৈরি হয়। খুবই আপত্তিজনক দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে ছিল। 'ফ্রি অ্যান্ড কমপালসরি এডুকেশন বিল, ২০০৪' এন ডি এ সরকার তৈরি করে বটে কিন্তু তা পার্লামেন্টে আলোচিত হবার আগেই এন ডি এ সরকার চলে যায়। ঐ বিলে বলা হয়েছিল যে ছেলেমেয়েদের শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়াটা অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব। বলা হলো, যারা এ দায়িত্ব পালন করবে না সেইসব অভিভাবকদের শাস্তি পেতে হবে।

এরপর নতুন ইউ পি এ সরকার এসে একটা খসড়া করলেন। আন্দোলনের চাপে নতুন করে Central Advisory Board of Education (CABE) গঠিত হলো। আগের এন ডি এ সরকার এটাকে অকেজো করে রেখেছিল। CABE-তে আলোচনার পর কেন্দ্রের তৎকালীন বিজ্ঞানপ্রযুক্তি ও সমুদ্রউন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় কপিল সিবালের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। ঐ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে খসড়াটি পুনর্লিখন করে সরকারের কাছে পেশ করার সিদ্ধান্ত হয়। কপিল সিবাল কমিটি এই কাজ করে। তারপর সরকার জানায় রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৫ সিবাল কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে রচনা করে রাজ্যে রাজ্যে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু মাত্র কয়েকটি রাজ্য এ সম্পর্কে তাদের মতামত জানিয়েছে।

আমার সন্দেহ, অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ যাঁরা আমাদের অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করে তাদের পরামর্শে বা নির্দেশে কেন্দ্রীয় স্তরে এ সম্পর্কে কোনো আইন রচিত হবে না। Further consultation in the matter have since been held and it has been suggested that :

Instead of Central legislation a Model Right to Education Bill should be formulated and circulated as a framework for states to adopt the same by enacting new legislation if they do not have any, or modifying suitably where necessary, their Act if they already have one. (Letter of Shree Champak Chatterjee, I.A.S)

তারা বলল, রাজ্যগুলোকে আমরা মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেই অনুযায়ী রাজ্য আইন তৈরি করবে। অথবা অক্ষরে অক্ষরে এই বিল গ্রহণ করবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এতো খুবই গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত; যুগ্ম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা—রাজ্যকে আইন করতে বলে রাজ্যের অধিকারকে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃতি দিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যে বিলটা করেছে, তারসঙ্গে শ্রী চম্পক চ্যাটার্জীর, আই এ এস, শিক্ষা সচিব, যে পত্র জুড়ে দিয়েছেন সেই পত্রে অদ্ভুত রকমের ন্যাক্কারজনক শর্তের অবতারণা করা

হয়েছে। যেমন ধরুন, বলা হয়েছে যে এই বিল যারা হুবহু সম্পূর্ণ গ্রহণ করবে তারা সর্বশিক্ষা অভিযানের জন্য যে টাকা অনুমোদন হবে এক একটা রাজ্যের জন্যে তার ৭৫ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাবে, ২৫ শতাংশ রাজ্য সরকার দেবে। যে সব রাজ্য হুবহু অনুসরণ করবে না, তাদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার আর ৫০ শতাংশ দেবে রাজ্য সরকার। অর্থাৎ হস্তক্ষেপ করা হলো ঐ চাবিটা ব্যবহার করে। এমন নয় যে এডুকেশন সেস আদায় করা হয়, এমন নয় যে ইনকাম ট্যাক্সের একাংশ যা রাজ্যগুলি থেকে আয় হয় তার অংশ, একটা প্রকল্প, তারসঙ্গে constitutional directive-এর সংযোগ স্থাপন করে দেওয়া হলো। সর্বশিক্ষা অভিযান একটা প্রকল্প। আজ আছে, কাল নাও থাকতে পারে। সর্বশিক্ষা অভিযান স্কীমের টাকা কোন্ খাতে কত খরচ করা হবে তা বলে দেওয়া হয়। এই স্কীমের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকদের কত বেতন দেওয়া হবে তাও বলে দেওয়া হয়। এই যে শর্ত-কন্টকিত স্কীম, এর সম্বন্ধে সমালোচনা রয়েছে — এ সব শর্ত শিক্ষাবিজ্ঞান সম্মত নয়। অর্থনীতিবিদরাও এই স্কীমকে সবসময় সমর্থন করতে পারেননি। এইরকম একটি প্রকল্প, Fundamental Right-এর ওপর যে বিল হবে, তার শর্ত! এটা রাজ্যগুলোর ওপর আঘাত।

তারা বলছে Next to law and order education will be the first charge. Law and order হচ্ছে প্রথম, তারপরেই গুরুত্ব পাবে education. কে বলছে? কেন্দ্রীয় সরকার। কাকে বলছে? রাজ্য সরকারকে। আচ্ছা, এই গুরুত্ব দিতে হলে কী করতে হবে রাজ্য সরকারগুলোকে, তার নিশানা কোথাও নেই। এখন শিক্ষাকে কেন্দ্র করে বলছে। এরপরে আর একটা জায়গায় আর একটাকে কেন্দ্র করে বলতে পারে It will be the second charge; আর একটাকে কেন্দ্র করে বলতে পারে It will be the second charge। এরকম ১০০টা বলে দিল — এগুলো সব second charge. Second charge State-এর কোন্‌টা হবে? সব State-এর second charge যে একই হতে হবে তার কোনো মানে আছে? কোন্ State-এর কী রকম অগ্রগতি, কী রকম সমস্যা, কী রকম তার আর্থিক সংকুলান — এইসব মিলিয়ে রাজ্যগুলো কোন্ জায়গায় আছে তা ভাবতে হবে না? কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এটা কোন্ charge হবে? First charge হবে, না second charge হবে, না third charge হবে। অনুল্লিখিত। কোনোখানে নির্দেশ নেই যে এরজন্য কেন্দ্রকে তার বাজেটের এত অংশ ব্যয় বরাদ্দ রাখতে হবে।

এটা আর কিছু নয়, দায়িত্বটাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা। শুধু তাই নয় অন্যকে Scope goat করা যে এই দেখ এরজন্য হলো না — আমরা বলেছিলাম second charge করতে কিন্তু রাজ্যগুলো করল না। আমরা বলেছিলাম যে এইটা 'intoto' adopt কর। রাজ্যগুলো করল না।



যৌথ কনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কান্তি বিশ্বাস।

বাস্তবে 'intoto' adopt করা যায় না। প্রত্যেক রাজ্যের আইন আছে।

প্রাথমিক শিক্ষা আইন নেই এরকম রাজ্য কম আছে। তারমধ্যে অবস্থা অনুযায়ী তো সিদ্ধান্ত করতে হবে। চেষ্টা করবে রাজ্যগুলো। পশ্চিমবঙ্গও করবে। কিন্তু তখন ওরা বলবে, না, যে রকম চেয়েছিলাম সে রকম হয়নি। এ একটা মারাত্মক চাতুরি! এটাকে অসহ্য বলা চলে।

আমি একটা আইনগত বা সাংবিধানিক দিক থেকেই বলি — 'State'- এর সংজ্ঞাটা কী? Central govt. & Parliament as also the state govts – State govt. এই বোঝা যাতে বহন করতে পারে, তারজন্যে একটা পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় স্তরে করতে হবে। কতটা বোঝা? এই বোঝার রাজ্য হিসাবে পার্থক্যও হতে পারে। তা হলে কার কী

রকম বোঝা সেই অনুযায়ী বরাদ্দ হলে তবে তো কাজ হবে। নিশ্চয়ই ফিনান্স কমিশনকে এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে। আছে কেন এগুলো? এটা আলোচ্য বিষয়ই নয় ওদের। প্ল্যানিং কমিশনেরও নয়, ফিনান্স কমিশনেরও নয় — এটা রাজ্যের ব্যাপার! এটা পঞ্চায়েতের ব্যাপার! করল না। ওরা চুরি করেছে। রায় বলছে, ফেল করেছে। বিফল, অসফল ইত্যাদি শব্দ বাংলায় আছে যেমন, হিন্দী-ইংরেজিতেও আছে। এই যে দৃষ্টিভঙ্গি এটা ভীষণ শিক্ষাবিরোধী।

কেন্দ্রীয় সরকার বলছে যে পার্লামেন্টে বিলটা আনবে না। আচ্ছা, এই স্বাধীনতা কি কেন্দ্রীয় সরকারের আছে Constitution amendment-এর পরে? এবং সেটা যে ছিল না সেটা ওঁরা আগে বুঝেছিলেন। এখন যে নির্দেশটা করলেন সেটা একটা গভীর চক্রান্তের বিষয় বলে আমার মনে হয়। স্বাধীনতা ছিল না বলেই ঐ এন ডি এ সরকার বিল করেছিল। ২০০৪-এ বিল করেছিল। ২০০৫-এ amend করে আর একটা বিল করেছে। এবং এই বিল পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হবে বলেই তৈরি করেছিল। তারপরে তারা বলছে যে পার্লামেন্টে কোনো বিল পেশ করবে না, কোনো আইনই করবে না। সরকার একটা নির্দেশনামা করে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি জানি না Indian Parliament-এ যাঁরা সদস্য তাঁরা এ বিষয়ে অবহিত কিনা। তাঁরা এটাকে কীভাবে দেখছেন? রাজ্যের legislative-ই কীভাবে দেখবেন? রাজ্যের legislative কি তার সরকারকে আইন করে বলবে, 'তুমি এটায় অর্থব্যয় কর, এটাকে কার্যকর কর'? তাহলে আমরা শুনতে পাব এ নিয়ে debate বা আলোচনা। আমার মনে হয় এটা অবাস্তব! আসলে লক্ষ্যটা যাতে পূরণ না হয় সেজন্য জিনিসটাকে এইভাবে আনা হয়েছে। অতএব বিরোধিতা হবে। তাতে সময় কাটবে।

২০০৬ থেকে ২০১৬ আসবে। কেন্দ্র চলতে থাকবে — যথাপূর্ব তথা পরং। এস এস এ বলে একটা প্রকল্প হয়তো আরো কিছুদিন চলতে থাকবে। এবং তারা কিছুদিন বাতাসা বিতরণ করতে থাকবে— তারথেকে চেটে যে যতটুকু পারবে ভোগ করবে। এ এক অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতি। বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে বোঝা দরকার এবং যা করণীয় তা করা দরকার। যাঁদের এ কাজ করণীয় তাঁরা করবেন।

আগে Right of Education যে Bill হয়েছিল, যেখানে বিভিন্ন chapter ছিল। তারমধ্যে একটি chapter ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব বলে। Model Right to Education Bill, 2006-এ কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব কী তার কোনো উল্লেখ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব হলো এস এস এ-র টাকার ৭৫ শতাংশ/২৫ শতাংশ ভাগ বাঁটোয়ারা করা।

রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৫-এর কিছু ত্রুটি ছিল কিন্তু ঐ বিলে ৯নং সেকশনে যা লেখা ছিল তা হলো ঃ

"Provision of free and compulsory education shall be the concurrent responsibility of the Central and the appropriate government with the Central governments responsibility consisting of the following:

i) Provision of financial assistance to State governments in accordance with such formula regarding sharing of costs of implementation of this Act, as the Central government may determine from time to time in consultation with State governments. In addition to it four other sub sections were provided to elaborate the Central governments responsibilities.

ii) In section 10 of Chapter III the responsibility of the appropriate government i.e. the State government was also indicated elaborately. But in the draft "Model Right to Education Bill, 2006" responsibility of the Central government has not been clearly stated.

আগের draftটা লোকের কাছে আছে। CABE তে আলোচনা হয়েছিল। CABE'র সদস্যদের মত নিয়ে সুষ্ঠুভাবে বিলটা তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আমি মনে করি, এটা দাবি করা সঙ্গত যে এখন কেন্দ্রীয় সরকারকেই আইন পাস করে পরিষ্কার করে বলতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব কতটা আর রাজ্য সরকারগুলিরই বা দায়িত্ব কতটা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে দায়িত্ব share করার একটা rational basis থাকতে হবে। দয়াদাক্ষিণ্যের ব্যাপার এটা নয়।

The financial responsibility for achieving the goal of free compulsory universal elementary education should be shared by the Central and the State governments on the rational basis.

এটা assure করতে হবে।

আমার আরও কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখছি ঃ

● The Finance Commission as well as the Planning Commission should consider the matter seriously.

● Each state should draw up specific time-bound programme of Action in consultation with the Central government.

● The progress of the programme should be monitored by the appropriate authority at the National Level.



যৌথ কনভেনশনে উত্থিত প্রস্তাবের সমর্থনে উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের একাংশ।

● So far the quality and standard of education is concerned the opinion of the teaching community should be given due importance.

Appropriate authority at the 'National Level' বলতে আমি একটা Central government-এর তৈরি department-কে বোঝাচ্ছি না। এটা academic body হবে। এরা বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষার অগ্রগতির বিষয়টা monitor করবে এবং from time to time তাদের নির্দেশ দেবে।

So far as quality and staudard of education is concerned Bureaucrat-দের কর্তাব্যক্তি হলে চলবে না। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিতে হবে। Compulsory education পাবে কি পাবে না, তার প্রকৃতির ওপরেও নির্ভর করে। শিক্ষার প্রকৃতিটা কী হবে? এই শিক্ষার দ্বারা সাধারণ মানুষ উপকৃত হতে পারে কিনা, এই বোধ যাদের নাই তাদের দ্বারা হবে না। টাকা হলেও হবে না। বোধ চাই। কী পড়ানো হবে, কেমন করে পড়ানো হবে — এসব হচ্ছে part of the whole programme. এইসব কাজে শিক্ষকদেরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের পরামর্শ নিয়েই এগুলো রচনা করতে হবে।

এই কনভেনশন বা আরও কয়েকটি কনভেনশনই কি শেষ কথা? কেবল একটা রাজ্যের শিক্ষকরা এ কাজ করতে পারবে? সর্বভারতীয় শিক্ষক সংগঠনগুলিও নিশ্চয় একে গুরুত্ব দেবে। পার্লামেন্টেও নিশ্চয় আলোচনা হবে। সর্বোপরি আমি মনে করি, এরজন্য চাই গণআন্দোলন। সে গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠনগুলো, তারসঙ্গে থাকবে ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলো, সঙ্গে থাকবে মহিলা সংগঠন, যারা সবচেয়ে আঘাতপ্রাপ্ত, সঙ্গে থাকবে কৃষক সংগঠন-শ্রমিক সংগঠন। দুঃখের কথা, এখনও পর্যন্ত কৃষক সংগঠন-শ্রমিক সংগঠন 'সকলের জন্য শিক্ষা'র বিষয়টা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না। শ্রমিকের ছেলেমেয়েদের সকলের জন্য শিক্ষা, কৃষকের ছেলেমেয়েদের সকলের জন্য শিক্ষার বিষয়টা তাঁরা যেন শিক্ষকদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন বা অ্যাসেম্বলি বা পার্লামেন্ট বা কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশিক্ষা অভিযানের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এটা ব্যাথার বিষয়। ভারতবর্ষের মতো দেশে যদি ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে কৃষক, যাঁদের ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে বঞ্চিত, মহিলা যাঁরা সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত — এঁরা যদি সংগঠিত আন্দোলন না করেন এককভাবে এবং যৌথভাবে, তাহলে কিন্তু এই অধিকার আদায় করা খুব মুশকিল।

আর একটা কথা। ০-৬ এই বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে সংবিধানের সংশোধনকালে বাদ দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গিটা এইরকম যে এটা তো হবেই না, এটা বাদ দেওয়া হোক। ৬ থেকে ১৪-ই হোক। এটা সত্য, ঐ ৬,১৪ও হবে না কারণ, যারা পেছিয়ে আছে, যারা

pre-primary education পাচ্ছে না তারা formal education নেবে কী করে ? যেসব শিক্ষক প্রাইমারী স্কুলে পড়াচ্ছেন তাঁরা তো জানেন যে স্কুলে স্কুলে একটা প্রি-প্রাইমারী ক্লাস রাখতে হয়। এটা আইনসঙ্গত নয়। Pre-primary education is the preparation for formal education. আপনি, আমি এটা বুঝতেও পারব না। বোধের মধ্যেই আসবে না। আপনি তো ২ বছর বয়স থেকেই তাকে শেখাতে শুরু করেছেন। Early childhood-এ যা যা প্রয়োজন, হয়তো বিকৃত শিক্ষাও হচ্ছে, সেটা অন্য বিষয়, তারা তো একটা সাহায্য পাচ্ছে এই আমাদের মতো শিক্ষিত অভিভাবকদের কাছ থেকে বা পয়সাওয়ালা পরিবারের কাছ থেকে। কিন্তু হতদরিদ্র কৃষক, হতদরিদ্র শ্রমিক যার কাজের কোনো নিরাপত্তা নেই, constitution-এর directiveটা হবে ওদেরকে বাদ দিয়ে ? তাহলে তো হয়েই গেছে। ওদের ছেলেমেয়ে আসছে না, ওদের ছেলেমেয়ে আসতেও পারবে না। তাহলে কাজই তো শেষ হয়ে গেছে। Early childhood education, Pre-primary education — এটার যে কত গুরুত্ব, ওটার চেয়ে এটার গুরুত্ব যে বেশি সেটাও না। এটা করতে হয়, এটা বলতে হয়। আমি আশা করব, এই অবস্থার পরিবর্তন করতে এবং বৃহত্তর চাপ সৃষ্টি করতে আন্দোলন তীব্রতর হবে।

আলোচক শ্রীকান্তি বিশ্বাসের বক্তব্য

আজকে আমাদের রাজ্যের আটটি শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠনের আহ্বানে যৌথ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ ২৩শে সেপ্টেম্বর। নানাকারণে ২৩শে সেপ্টেম্বর এক ঐতিহাসিক দিন। এইদিনে একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি। আজ থেকে ১০১ বছর আগে, ১৯০৫ সালে, লর্ড কার্জন ছুরিকা নিক্ষেপ করে অবিভক্ত বাংলাকে বিভক্ত করেছিলেন। এই কাজকে যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করার জন্য লর্ড কার্জন বলেছিলেন, মুসলমান সমাজ এর পক্ষে। এই কথা তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বলবার চেষ্টা করা হয়েছিল। ১৯০৫ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, সকল ধর্মের ১০ হাজারের ওপর ছাত্রছাত্রী কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হয়েছিল এটা প্রমাণ করার জন্য যে তারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী। একটা নতুন ইতিহাস কলকাতার বুকে সৃষ্টি হয়েছিল ঐদিন। এই ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে ১৯৭৩ সালে চিলির নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি পাবলো নেরুদাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। তিনি বহুদেশে চিলির রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি 'লেনিন শান্তি পুরস্কার' পেয়েছেন। সে দেশের জল্লাদ সরকার তাঁকে বরদাস্ত করতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদী মদতে তাঁকে হত্যা করেছে। তাঁর লেখা অনেক কবিতা বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। তাঁর লেখা কবিতার বই 'জ্বলন্ত তরবারি' আমি পড়েছি। বিশ্বে এই প্রথম কোনো নোবেলজয়ী কবিকে হত্যা করা হয়।

আজকে বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ সাহিত্যরসিক বিশেষ মর্যাদা দিয়ে পাবলো নেরুদাকে স্মরণ করছে। আর ঐতিহাসিক এই দিনটিতেই আমরা পেয়েছি রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের শিক্ষার অধিকার বিল নিয়ে আলোচনার জন্য।

১৯৩৩ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে জার্মানির হিটলার 'রাইখস্ট্যাগে' মানে সেখানকার পার্লামেন্টে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন ধরিয়ে দেবার পর প্রচার করা হয় যে কমিউনিস্টরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। অতএব কমিউনিস্ট নিধনযজ্ঞে তিনি মেতে ওঠেন।

বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট নেতা জর্জি ডিমিট্রভকে ষড়যন্ত্রের নায়ক বলে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩৩ সালের এই ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে জার্মানির আদালতে দাঁড়িয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে বন্দী জর্জি ডিমিট্রভ যে দীর্ঘ ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন তা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় রাজনীতি সচেতন মানুষের কাছে একটা অমূল্য সম্পদ। বলা যেতে পারে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এই ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে। ভারতবর্ষের শিক্ষাজগতে আজকের এই ২৩শে সেপ্টেম্বরের আলোচনা সভার মধ্যথেকে একটা ঐতিহাসিক আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি হোক।

১৯৯৬ সালে ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কমিশন বসানো হয়। এই কমিশন যে প্রতিবেদন দাখিল করে তা বিশ্বের শিক্ষাপ্রিয় মানুষের কাছে এক অত্যন্ত গুরুত্ব দলিল বলে স্বীকৃত। এই প্রতিবেদনের প্রথম বাক্যটি আমি পড়ে দিচ্ছি : "In confronting many challenges that the future holds in store humankind sees in education an indispensible asset in its attempt to getting the ideas of peace, freedom and social justice." শান্তি, স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কত বেশি তা এই প্রথম বাক্যটি থেকেই উপলব্ধি করা যায়।

আর একটা বাক্য দিয়ে ঐ রিপোর্ট শেষ করেছিল ঃ সে বাক্যটির মর্মার্থ হলো ঃ এশিয়ার থেকে যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি, ভারতবর্ষের থেকে যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি (নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি), চীনের কনফুসিয়াস যে শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন আর সামনের দিনের বিশ্বায়ন — এইসব কিছুকে বিবেচনা করে যদি বিশ্বে শান্তিকে বজায় রাখতে হয়, অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করতে হয়, শিক্ষাকে খাটো করে দেখে এ উদ্দেশ্য সাধন করা যাবে না। এই দুটি বাক্য আমাদের চেতনাকে আরও উন্নত করতে পারে, আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের পরিধিকে আরও সম্প্রসারিত করতে পারে।

কোঠারী কমিশন ভারতের সবথেকে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা কমিশন। কোঠারী কমিশনের রিপোর্টের প্রথম বাক্যটিতে লেখা ছিল ঃ ভারতের ভবিষ্যত এখন থেকে তার শ্রেণিকক্ষে প্রস্তুত হবে। শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্বকে বোঝাবার জন্যই কোঠারী কমিশন তার প্রতিবেদন এই বাক্যটি দিয়ে শুরু করেছিল।

১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়। এই দলিলের বাক্যটি হলো ঃ মানব সভ্যতার শুরু থেকে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং আমাদের যদি সেই লক্ষ্যে অর্থাৎ মানব সভ্যতার অগ্রগতির লক্ষ্যে পৌছতে হয় তাহলে শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

Education for all, 2006 ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে কয়েকদিন আগে প্রকাশ করা হয়েছে। এর ২৫৭ নম্বর পৃষ্ঠায় কতকগুলো তথ্য দিয়েছে। Education Development Index (EDI) এতে সারা বিশ্বের কোন্ দেশ শিক্ষায় কতখানি উন্নত তার হিসেব দিয়েছে। Highly developed ৪৪টি দেশের নাম আছে। তারমধ্যে 'সূর্যের দেশ' ভারতবর্ষ নেই। তারপরে medium ৪৯টি দেশের নাম আছে। তার মধ্যেও ভারতবর্ষের নাম নেই। তারপরে দিয়েছে ২৮টি দেশের নাম যারা শিক্ষায় খুবই পিছিয়ে আছে, তারমধ্যে 'সূর্যের দেশ' ভারতবর্ষের নাম আছে। শিক্ষার অগ্রগতির বিচারে তারা ১২১টি দেশকে সাজিয়েছে তারমধ্যে আমরা আছি ১০০ নম্বরে। আমাদের সান্ত্বনা এইটুকু যে ২১টি দেশ আমাদের থেকে খারাপ।

Human Development Report, 2006। সেখানে Human Development Index-এ (HDI) বিশ্বের ১৭৭ দেশের নাম আছে। আমরা আছি ১২৭ নম্বরে। এই অবস্থার মধ্যে থেকে আমাদের শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে হবে। ১৯৯৩ সালে দিল্লিতে বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সম্মেলনে সাদিক নাবিক বলেছিলেন, "Our philosophy should be three 'E' ঃ Education, Empowerment and Equity." এই তিনটি 'E'কে সামনে রেখে আমরা যেন ন'য়ের দশকে লড়াই সংগ্রাম করতে পারি। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে থাকতে পারে, ১৭৯৩ সালে, পরাধীন ভারতবর্ষে, ইংলন্ডের আইনসভায় উইলবার্গ ফোরজ প্রথম বলেছিলেন, ভারতবর্ষে শিক্ষার সুযোগকে সম্প্রসারিত করার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দায়িত্ব নিতে হবে। তাঁর বিরুদ্ধে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা বলেছিলেন শিক্ষার সুযোগকে দেওয়ার ফলে আমরা আমেরিকাকে হারিয়েছি, আবার শিক্ষার সুযোগ ভারতবর্ষকে প্রদান করে ভারতবর্ষের উপরে আমাদের কর্তৃত্বকে কখনো হারাতে পারি না।

১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি ইংলন্ডের আইনসভায় তখনকার লেবার পার্টির প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এট্‌লীকে কনজারভেটিভ পার্টির পক্ষ থেকে একজন সাংসদ প্রশ্ন করেছিলেন, "কেন ভারতবর্ষের মতো একটা বিশাল দেশকে তুমি স্বাধীনতা দিচ্ছ না ? এত বড় দেশকে আমরা দখল করে রেখেছি, আমরা যে পররাজ্যগ্রাসী তা প্রমাণিত হচ্ছে।" ক্লিমেন্ট এট্‌লী উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি তো স্বাধীনতা দিতে চাই। কিন্তু ভারতবর্ষে শিক্ষার হাল এত খারাপ যে লেখাপড়া জানা কোনো লোকই নেই। এত বড় দেশের দায়িত্বভার আমি কার ওপরে দেব সেইজন্য স্বাধীনতা দিতে পারছি না।"

ইংলণ্ডের সরকার একটা শিক্ষা কমিশন বসিয়েছিল ইংলণ্ডের শিক্ষা সংস্কারের জন্য। তারা একটা রিপোর্ট দাখিল করেছিল। সেই রিপোর্টের একটা কপি ওঁরা আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমার মতামতের জন্য। আমি রিপোর্টটা পড়িনি। মাসখানেক পরে আমাকে ইংলণ্ড থেকে শিক্ষামন্ত্রী টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করছে ঃ তুমি রিপোর্টটা পড়েছ ? আমি বললাম, না, আমি পড়িনি। উত্তরে ওরা বলল ঃ সারা পৃথিবীতে কোথাও আমরা রিপোর্টটা পাঠাইনি। কেবল তোমার কাছে পাঠিয়েছি আর তুমি এখনো পড়নি। ঐ রিপোর্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের মতামত কবে আসবে জেনে নাও। এই মতামত আসবার পরে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব। আমি বললাম ঃ আমার অপরাধ হয়েছে। আমি ক্ষমা চাইছি। এক সপ্তাহের

মধ্যে আমি প্রতিবেদন পাঠাব। অধ্যাপক ভবেশ মৈত্র ও অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য নিয়েছিলাম। আমি এক সপ্তাহের মধ্যে আমার মতামত ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এরপর ইংলণ্ডের শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে টেলিফোন পেয়েছিলাম। তিনি বললেন, "তুমি একটা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, টনি ব্লেয়ার তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারে না প্রটোকলে আটকায়। সেইজন্য টনি ব্লেয়ারের নির্দেশে আমি কথা বলছি। তুমি যে প্রতিবেদনটা পাঠিয়েছ তার দ্বারা আমরা উপকৃত হয়েছি। তবে শুধু ভারতবর্ষের নয়, বাংলার নয়, গোটা বিশ্বের বিকাশমান দেশ, উন্নত দেশ সম্পর্কে তুমি যে সব তথ্য দিয়েছ এবং তোমার যে মতামত দিয়েছ তাতে আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। এজন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে লেবার পার্টির প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এট্‌লী বলেছিলেন, ভারতবর্ষের শিক্ষার হাল খারাপ তাই স্বাধীনতা দিচ্ছি না। একই লেবার পার্টির প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বললেন, আর কারও মতামতের দরকার নেই, পশ্চিমবাংলার মতামত পেলেই আমরা আমাদের দেশের শিক্ষাসংস্কার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারব। ১৯৪৭ সাল আর ২০০৫ সাল। ভারতবর্ষের পশ্চিমবাংলায় এই যে পরিবর্তনটুকু হয়েছে এরজন্য আমরা গর্ব অনুভব করতে পারি।

আজকে ভারতবর্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে দীনতা, পশ্চাদপদতা, এই পশ্চাদপদতার নিরিখে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে সচেতন হবার প্রয়োজন আছে।

বিশ্বে প্রথম Free and Compulsory education প্রবর্তিত হয়েছিল জার্মানিতে ১৮৩০ সালে। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে হবে এই আইন প্রথম তৈরী হলো জার্মানিতে। জার্মানির শক্তি ও অগ্রগতিকে বিপরীত পথে পরিচালিত করবার যে চেষ্টা হয়েছে এটা ঠিকই, কিন্তু শিক্ষাপ্রেমী চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। এই আইনই ইংলণ্ডে এলো ১৮৭৩ সালে। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা ভারতবর্ষে কোথায় আছি?

World Development Indicator, 2006 প্রকাশিত হয়েছে। তার Report থেকে আমি কয়েকটা অংশ পড়ে দিচ্ছি। পৃষ্ঠা ৮৯-৯০।

বিশ্বে প্রাথমিকে Gross enrolment হচ্ছে ১০৪, Developed Countryতে ১১১ (কম বয়স, বেশি বয়স মিলিয়ে), Secondary, relevant age group-এ ৬৬জন যুক্ত বিশ্বে। এটা ছেলেমেয়ে মিলিয়ে। শুধু মেয়ের গড় ৬৩। বিকাশমান দেশের মাধ্যমিক স্তরে ছেলেমেয়ে মিলিয়ে Gross enrolment ৭৫ ; মেয়েদের গড় ৫৫·৯। ভারতবর্ষে Secondary-তে Gross enrolment ৫২। মেয়েদের গড় ৪৬·৭। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের চিন্তা করতে হবে কীভাবে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটাতে পারি।

আমরা সকলকে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে আনতে চাই অর্থাৎ সকলকে প্রারম্ভিক শিক্ষা দিতে চাই। সারা বিশ্বে প্রাইমারীতে (৬-১১ বছর) out of school children-এর সংখ্যা হচ্ছে ৯ কোটি ৯৮ লক্ষ। ভারতবর্ষে out of school children-এর সংখ্যা প্রাথমিকে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ। এখানে আমাদের বুঝে নিতে হবে আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য কতটা। অনেক প্রাইভেট স্কুল আছে। সারা বিশ্বে ৭ শতাংশ প্রাইভেট প্রাইমারী স্কুল আছে। এই স্কুলগুলিতে সরকারের কোনো দায়দায়িত্ব নেই। বিকাশমান দেশে প্রাইভেট প্রাইমারী স্কুল আছে ১১ শতাংশ। আর ভারতবর্ষে আছে ১৭ শতাংশ প্রাইভেট প্রাইমারী স্কুল। পশ্চিমবাংলায় প্রাইভেট প্রাইমারী স্কুল আছে মাত্র ৩ শতাংশ।

সারা বিশ্বে ১১ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরকারের কোনো আর্থিক দায়দায়িত্ব নেই। বিকাশমান দেশের গড় ১৫ শতাংশ। ভারতবর্ষের গড় ৪২ শতাংশ। অর্থাৎ ভারতবর্ষে ৪২ শতাংশ প্রাইভেট মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, এর দায়িত্ব সরকার বহন করে না। পশ্চিমবাংলায় এই হার ৭ শতাংশ। অর্থাৎ ৯৩ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আর্থিক দায়দায়িত্ব বহন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হলে অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। কতটা? ১৯৪৮ সালে মহারাষ্ট্রের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বি জি খেরের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। বি জি খের বলেছিলেন : কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ এবং রাজ্য বাজেটের ২০ শতাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা উচিত। সারা বিশ্বের সকল স্বাধীন সরকার শিক্ষার জন্য মোট বাজেটের ১৪·১ শতাংশ ব্যয় করেন। বিকাশমান দেশের সরকারগুলো শিক্ষার জন্য ব্যয় করে ১৫·৫ শতাংশ। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার মিলিয়ে শিক্ষার জন্য ব্যয় করে ১২·৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকার তার দায়িত্ব কতটুকু পালন করছে তার একটা তথ্য আমি আপনাদের সামনে হাজির করছি।

১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬৯-৭০ এই সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় বাজেটের ২ শতাংশের কম শিক্ষার জন্য ব্যয় করেছে। ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৮১-৮২ সাল কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় বাজেটের ৩ শতাংশের কম ব্যয় করেছে। কোথায় খের কমিটির সুপারিশ আর কোথায় বাস্তব অবস্থা!

রাজ্য সরকারেরও দায়িত্ব আছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০০২-০৩ সালে মোট বাজেট পেশ করেছিল ৩,৪১,৬৪৮ কোটি টাকা, আর ভারতবর্ষের সকল রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের মোট বাজেট ছিল ৩,৫৮,৭৪১ কোটি টাকা। অর্থাৎ total budget of the Central govt is almost equal to the total budget of 35 union territory or state govts. কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারগুলি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি মিলে শিক্ষার জন্য যে টাকা ব্যয় করে তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ ১৭ শতাংশ। যদিও শিক্ষা যুগ্ম তালিকায়। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা, তাদের অনীহা বা অনিচ্ছা, কেন্দ্রীয় সরকার যে শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করতে চায় না — এটা তার নিকৃষ্টতম উদাহরণ। এরমধ্যে দাঁড়িয়ে ওরা বলছে Model Right to Education Bill, 2006 'intoto' অনুসরণ না করলে তারা রাজ্যগুলোকে সর্বশিক্ষার ৭৫ শতাংশ টাকা দেবে না। যখন অভিন্ন কর্মসূচি প্রকাশ করা হলো সেইসময় বলা হয়েছিল সমস্তপ্রকার আয়কর, এক্সাইজ-এর ওপর ২ শতাংশ এডুকেশন সেস বসানো হবে। এডুকেশন সেস থেকে সংগৃহীত টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে। ২০০৬-০৭ সালে কেন্দ্রের বাজেট পেশ করবার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম বলেছেন, এই বছরে এডুকেশন সেস বাবদ আদায় হবে ৮৭২৬ কোটি টাকা। সেই টাকা শিক্ষার জন্য কেন ব্যয় করা হবে না? কেন রাজ্য সরকারগুলোর ওপর অন্যায়ভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে? এই এডুকেশন সেস তো সারা ভারতবর্ষের মানুষকে দিতে হচ্ছে। যারা ইনকাম ট্যাক্স দেয়, যারা এক্সাইজ দেয় তাদের দিতে হচ্ছে। টেলিফোন বিল মেটাবেন সেখানেও এডুকেশন সেস দেওয়ার কথা বলা আছে। যেকোনো প্রকার ট্যাক্স দেবেন তার ওপর ২ শতাংশ ট্যাক্স ধরা আছে।

কপিল সিবাল ২০০৫ সালের জুন মাসে তাঁর রিপোর্ট দাখিল করেন। সেই রিপোর্টে ৯-১০ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করতে চাইছি। সার্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা যদি সুনিশ্চিত করতে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের দায়িত্ব এবং কর্তব্য কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে একটা ধারণা হবে এই তথ্য থেকে।

২০০৫-০৬ সালে, ৬-১০ বছরের যে ছেলেমেয়ে (প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার উপযুক্ত ছেলেমেয়ে এরা) ভারতবর্ষে রয়েছে তার ১ কোটি ৭৮ লক্ষ বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে গেছে। ১১-১৩ বছরের ছেলেমেয়েদের (আপার প্রাইমারীতে পড়ার উপযুক্ত ছেলেমেয়ে এরা) মধ্যে যারা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে পা রাখেনি তাদের সংখ্যা ২ কোটি ৭৫ লক্ষ। উভয় মিলিয়ে ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ ছেলেমেয়ে ২০০৫-০৬ সালে বিদ্যালয়ের বাইরে রয়ে গেছে।

এই রিপোর্ট দাখিল করে কপিল সিবাল বললেন কিন্তু লোকসংখ্যা তো বাড়তে থাকবে, তাই আগামী ২০১১-১২ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে প্রাথমিকে ৩ কোটি ১৯ লক্ষ আর আপার প্রাইমারীতে দাঁড়াবে ৪ কোটি ৫ লক্ষ। অর্থাৎ ৭ কোটি ২৪ লক্ষ ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে যাবে যদি না ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় — এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন বর্তমান সরকারেরই তদানীন্তন মন্ত্রী তাঁর রিপোর্টে। সিবাল কমিটিই বলেছে, এই যে ৭ কোটি ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে যাবে, যদি এদের বিদ্যালয়ে আনতে হয় তাহলে টাকা আদায় করতে হবে, স্কুল করতে হবে, শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। তাতে কত টাকা ব্যয় হতে পারে? ওরা দু'রকম হিসেব করেছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন যদি ৬০০০ টাকা হয় তাহলে কী রকম খরচ হবে এবং যদি ৭০০০ টাকা হয় তাহলে কী রকম খরচ হবে। মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন যদি ৬০০০ টাকা হয় তাহলে কী রকম খরচ হবে, যদি ৮০০০ টাকা হয় তাহলে কী রকম খরচ হবে।

নতুনভাবে জন্মানো শিশুদের যদি বিদ্যালয়ে আনতে হয় তাহলে ২০০৫ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ১২ লাখ ৭১ হাজার অতিরিক্ত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আর যারা আপার প্রাইমারী বিদ্যালয়ের বাইরে রয়ে গেছে যদি সেই শিশুদের আনতে হয়, ১৪ লাখ ২৮ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আর এই শিক্ষকদের যদি নিয়োগ করতে হয় কী টাকা ব্যয় হবে সর্বসাকুল্যে? যদি কম বেতন দেওয়া হয় তাহলে ৩ লক্ষ ২১ হাজার ১৯৬ কোটি টাকা ব্যয় হবে আর যদি বেশি বেতন দেওয়া হয় তাহলে ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৫৯ কোটি টাকা ব্যয় হবে। শিক্ষকদের বেতন, বাড়ি-ঘর তৈরি করা ইত্যাদিতে এই টাকা ব্যয় হবে। এই টাকার যদি সংস্থান না করা হয় তাহলে যতই আমরা শিক্ষা নিয়ে

তোতাপাখির মতো বুলি আওড়াই না কেন, তা অর্থহীন।

এই সরকার ইনকাম ট্যাক্স এবং এক্সাইজ ডিউটি বাবদ ১৫হাজার কোটি টাকা অনাদায়ী রেখে দিয়েছে। এ কথা স্বীকারও করেছে এই সরকার। যদি আমরা উপযুক্ত আন্দোলন করতে না পারি শিক্ষার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব না।

আনন্দবাজারের দিল্লির সাংবাদিক লিখেছে তিনটি রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে সবার পিছনে। লিখেছে, যদি Achievement Level টাকে Descending order-এ সাজাতে হয়, উপরদিকে আছে তিনটি রাজ্য, তারমধ্যে একটা হলো পশ্চিমবাংলা। উনি Descending order-এর মানে করেছেন তিনটি রাজ্য বোধ হয় সবার থেকে নিচে। যে তিনটি রাজ্য সবার উপরে তার সম্পর্কে এই মন্তব্য!

ভারতবর্ষের মধ্যে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত যে পরীক্ষা হয়েছে সেই পরীক্ষায় চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি বিষয়ে পশ্চিমবাংলার ছেলেমেয়েরা ফার্স্ট হয়েছে, একটি বিষয়ে সেকেন্ড হয়েছে। এত ছাত্রছাত্রী কোনো রাজ্যে বাড়েনি তৎসত্ত্বেও পশ্চিমবাংলার ছেলেমেয়েরা তিনটি বিষয়ে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছে, একটি বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। তাতেও আনন্দবাজার লিখেছে তিনটি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবাংলার অবস্থা সবথেকে খারাপ।

অতএব এই অপপ্রচার, এই কুৎসা, আর বাস্তব অবস্থাকে মনে রেখে, শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থেকে আমাদের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। দেশপ্রেমিক আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যদিয়ে আমরা শিক্ষার যে লক্ষ্য, সে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

শিক্ষক সমাজের প্রতি, শিক্ষাব্রতীদের প্রতি, শিক্ষাহিতৈষী মানুষের প্রতি বর্তমান সমাজ এই দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য শপথ গ্রহণ করতে হবে। শুধু শপথ গ্রহণ করা নয়, সেই শপথ বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের সংঘবদ্ধ হতে হবে। আশা করি শিক্ষক সংগঠন, যাঁদের ওপর আমাদের অগাধ আস্থা আছে, যাঁদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল সেই রাজ্যের শিক্ষক সংগঠন, গোটা ভারতবর্ষের সামনে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে শিক্ষার অঙ্গনকে প্রসারিত করা এবং শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে।

আলোচক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দের বক্তব্য

আমি আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই। আজকে আপনারা খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আটটি বাম শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠনের পক্ষ থেকে সভা আহ্বান করেছেন। আমি আশা করি যে আপনাদের এই সভায় সেই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করবেন যা আমাদের রাজ্যে যাঁরা শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন পরিচালিত করেছেন, তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে, তাঁদের যে কিছু করণীয় কাজ আছে সে সম্পর্কে তাঁদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে পারবে। এই সভার সিদ্ধান্ত অন্যান্য রাজ্যে এবং ভারতবর্ষের রাজধানীতেও গিয়ে পৌঁছবার প্রয়োজন আছে। আমি খুবই সংক্ষেপে তিনটি বিষয়ে বলব।

প্রথম যে বিষয়, সেটি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কয়েকবার আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানে যে ২১ (ক) ধারা সংযোজিত হয়েছে শিক্ষার অধিকার, খুবই খন্ডিত, সেটিই আজকের মুখ্য আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিতরিত হয়েছে — এ আপনারা জানেন। যে খসড়া আমাদের কাছে এসেছে সে খসড়ার বৈশিষ্ট্য ইতোমধ্যে এখানে আলোচনা হয়েছে বলে আমার ধারণা। সে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য, আজ পর্যন্ত এটা কোনো রাজ্যে এবং আমাদের রাজ্যেও কোনোদিন আলোচিত হয়নি, কেন্দ্র তো কোনোদিনই এ কথা আলোচনা করেনি যে, রাষ্ট্রের ব্যয়নির্বাহতে ক্রমশ কী হবে। কোনোদিনই এটা আলোচনা হয়নি। কোনোদিনই আমাদের রাষ্ট্র এরকম ঠিক করেনি। হয়তো তাঁরা প্রতিরক্ষাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, অন্যকিছুকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তত্ত্ব আকারে এটা কোনোদিন আলোচিত হয়নি, গৃহীত হয়নি। প্রথম কথা তারা যেটা বলছে যে সমস্ত রাজ্যই আইন করুক। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যদি খরচা হয় সেটা করতে হবে, তারপর রাজ্যের যে সরকারী তহবিল তা থেকে শিক্ষার জন্য খরচ করতে হবে আইন করে। দ্বিতীয় হচ্ছে পুরোটাই করবে সংশ্লিষ্ট সরকার। মানে রাজ্য সরকার। কেন রাজ্য সরকার করবে? সংবিধানের পরিবর্তন হয়েছে মানে কী? ভারতবর্ষের সংবিধানের পরিবর্তন হয়েছে। রাজ্যের সংবিধানের পরিবর্তন হয়েছে নাকি? ভারতবর্ষের সংবিধানকে পরিবর্তন করে শিক্ষার অধিকারকে তাঁরা স্থান দিয়েছেন — শিক্ষার অধিকারটা বর্তাচ্ছে সমস্ত রাষ্ট্রের ওপরে। কেন্দ্র সেখানে একটা খুব শক্তিশালী উপাদান। কে এই অধিকার দিল যে কেন্দ্রকে কোনো দায়িত্ব নিতে হবে না, ব্যয়ভার বহন

করতে হবে না ? শুধু তারা নিয়ন্ত্রণ করবে। সেটা আপনারা জানেন। সেটা আপনারা ঠিক ভাবেই প্রতিবাদ করছেন বলেই আমার ধারণা। তারপরে তাঁরা যেটা বলছেন সেটা আরও মারাত্মক !

রাজ্যকে আইন করতে বলছে। আর কী বলছে ? এই ব্যবস্থার ভেতরে থেকে এই শ্রেণির বিদ্যালয়গুলি সব বাদ থাকবে। তাহলে রাজ্যকে আইন করতে বলার দরকারটা কী ? অনেক সময় একটা জিনিস শুরু হয় খুব ছোট আকারে, সেটা একটা মারাত্মক পরিণতি লাভ করে। আজকে তাঁরা কতকগুলো ধরনের বিদ্যালয়কে, কতকগুলো শ্রেণির বিদ্যালয়কে আওতার বাইরে রাখছেন,আমাদের দেশে আগামীদিনে যে এই ধরনের বিদ্যালয় আরও ২২টা, ২৫টা, ৩০টা বাড়বে না কে বলতে পারে ?

প্রথমে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়, তারপরে এল Indian Institute of Technology. এল আরও National Institute ইত্যাদি। আমরা মেনেই নিচ্ছি। দর্শক। আজকে যেটা বলা হচ্ছে যে এরা এরা বাদ থাকবে। তার মানে হচ্ছে যেগুলো রাজ্য সরকার টাকা দিয়ে চালায় আর রাজ্য সরকার পোষণ করে সেই ধরনের বিদ্যালয়গুলো ছাড়া সবগুলো বিদ্যালয় আলাদা আলাদা হবে। আগামীদিনে এরকম অসংখ্য শ্রেণির বিদ্যালয় হবে না কে বলেছে ? হবে।

আপনারা যে বিষয়টা সঠিকভাবে তুলেছেন আমি তার সঙ্গে একমত। ওখানে তোমরা বলছ শিক্ষক নিয়োগ হবে, তার শৃঙ্খলাজনিত ব্যাপার আছে সেগুলো পরিচালনা করবে কে ? যাঁরা এ কাজটা করবেন তাঁদের সে যোগ্যতা আছে কি না সে প্রশ্ন আমি বাদই দিচ্ছি। করবেন কী করে ? এখন ৫০ হাজার-এর ওপর প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, ১০/১২ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। আরো বাড়বে। তা যদি হয়, কিছু না হোক কাগজপত্র রাখার জন্য একজনকে দিতে হবে। প্রত্যেকটা বিদ্যালয়ে যদি নিয়োগ করতে হয়, বিজ্ঞাপন দিতে হবে নাকি সব নিজের লোককে ঢুকিয়ে নিতে হবে — বিজ্ঞাপনের টাকাটা দেবে কে ?

এ অসম্ভব ! একেবারে অবাস্তব !

এটা যাঁরা খসড়া করছেন তাঁরা কিন্তু জেনে বুঝে এগুলো করছেন। যাতে করে পুরো ব্যবস্থাটা সম্পর্কে রাজ্য সরকারগুলো বলে, না বাবা পারছি না এবং এটা কতটা অপমানজনক যে একটা চিঠি দিচ্ছে তারা, পুরোপুরি, 'intoto' যারা মানবে তাদেরকে আমরা সর্বশিক্ষার টাকাটা ৭৫:২৫ করে দেব আর যারা 'intoto' মানবে না তাদের সর্বশিক্ষার টাকাটা ৫০:৫০ করে দেব।

কী ব্যাপার ! আমরা পরাধীন নাকি ! যাই হোক প্রতিবাদটা খুব ধারালোভাবে হওয়া দরকার। আমরা আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রাথমিক উত্তর দিয়েছি ; পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের কী বক্তব্য দিয়েছি। এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কী বক্তব্য তা আমরা হাজির করেছি দিল্লির কাছে। এটা কিন্তু শুধু চিঠি দিয়ে হবে না। বড় রকমের একটা পরিবেশ তৈরি করা খুব প্রয়োজন। অন্য রাজ্যগুলোর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। তাঁরা কে কী ভাবছেন সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। আমরা যা বুঝেছি অবশ্যই তাদের বলে দেওয়া দরকার। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আমরা চেষ্টা করছি। আপনাদের বন্ধুদের মাধ্যমে আপনাদের সংগঠনের মাধ্যমে আপনারা সেটা করবেন আমার আশা। আমি যে কথাটা বলতে চাইছি, সেটা হলো এই যে দুটো জিনিস পাশাপাশি চলছে। এটা শুধু এই নয় যে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের ওপর এক টাকার দায়িত্ব চাপিয়ে দিল, কোথায় আমরা টাকা পাব, কেন তুমি টাকা দেবে না — শুধু প্রশ্নটা এখানে নয়। এটা একটা খুবই বড় প্রশ্ন। প্রশ্নটা হচ্ছে শিক্ষায়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাই, পরিবেশেও তাই, আমি ওটার মধ্যে যাচ্ছি না। উদারীকরণ এবং বেসরকারীকরণ, তার সঙ্গে মিলিয়ে সবকিছু চাপিয়ে দেওয়ার মনোভাবটা ক্রমাগত বাড়ছে। এটা বেসরকারীকরণের অঙ্গ। যাতে বেসরকারীকরণকে আপনারা জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন তারজন্য এই কেন্দ্রীকরণ। কারণ আপনারা দেখছেন যে, একটা কথায় সমস্ত বেসরকারী বিদ্যালয়, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে এবং ক্রমাগত বেসরকারী, আধা-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা কী হবে, আমাদের ভাল করে নির্ধারণ করে নিতে হবে।

আপনারা সবাই জানেন, ইতোমধ্যেই আমরা একটা খুব জটিল জায়গায় আছি। একটা মিটিং করলাম, যদিও ছুটির দিন, যাঁরা ঐ শিক্ষক শিক্ষণ এই ব্যাপারটায় প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন, আর পুরনো দিন থেকে কিছু প্রতিষ্ঠান আছে — তাঁদের নিয়ে মিটিং হচ্ছে আজকে। কেন্দ্রীয় সরকার একটা আইন পাশ করেছেন ১৯৯৩ সালে। আইনটা হচ্ছে National Council of Teacher Education. এবং এরকম ২০, ২৫, ৩০টা Council তৈরি হয়েছে। এগুলো আমরা লক্ষ্য করি না,

যখন হয় খুব আনন্দ পাই, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল হচ্ছে, কত কি ব্যাপার হবে, আমাদের ডাকবে, আমরা মাঝে মাঝে দিল্লি যাব এরোপ্লেনে। এই Council-এর আইনটা তৈরি হওয়ার পরেই Council বলে দিল আমরা যাকে স্বীকৃতি দেব সেই প্রশিক্ষণই গৃহীত হবে, আর এছাড়া অন্য কোনো প্রশিক্ষণ গৃহীত হবে না।

আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন, এই যে খসড়া, যেটা ওরা পাঠিয়েছে Right to Education, শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইনের খসড়া, সেখানে পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে প্রশিক্ষণ ছাড়া কাউকে নেওয়া যাবে না। আর প্রশিক্ষণ মানেই হচ্ছে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ! ইতোমধ্যে শিক্ষাকে একটা ধাক্কায় নিয়ে চলে গেল যৌথ তালিকায়। তারপর Training of Professionals — পেশাদারদের প্রশিক্ষণ বিষয়টাকে যৌথ তালিকা থেকে Union List-এ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের তালিকায় নিয়ে গেছে। তার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে এখন পর পর Council তৈরি করে যাচ্ছে এবং Council যা নিয়ম তৈরি করবে সেই নিয়মে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরাও করে দিলাম অনেকগুলো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। কেন করে দিলাম? জানি না। তারা সহজ সরলভাবে করেছে। পরীক্ষার জন্য সব ছেলেমেয়েদের তৈরি করেছে। তারপর দেখা গেল, না এটা তো চলবে না। কেন্দ্রীয় যে Council আছে তার অনুমোদন নেই। B Ed যাঁরা পড়াচ্ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে হাইকোর্টে তো রায়ই হয়ে গেল টাকা ফেরত দিয়ে দাও। ফাইন দাও পাঁচ হাজার টাকা। প্রাথমিকের সম্পর্কে এখন রায় হয়নি। জানি না কী রায় হবে! আমরা এখনো লড়াই করার চেষ্টা করছি। কিন্তু তাতে তো কিছু লাভ নেই। তখন আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীকে বলা হলো, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কয়েকবার যোগাযোগ করলেন, আমাদের পার্লামেন্টের মেম্বাররা বললেন, অন্তত এই অবস্থা থেকে আমরা যাতে উদ্ধার পেতে পারি তারজন্য একটা কিছু করুন। তাঁরা একটা অর্ডিন্যান্স করেছেন। আপনারা জানেন একটা অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ হচ্ছে ৬ মাস। কী করেছেন অর্ডিন্যান্সে? এক, অর্ডিন্যান্সে এইটাই করেছেন যে যারা দরখাস্ত করেছিল, অথচ যারা বাতিল হয়েছিল, অর্থাৎ যাদের আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়েছিল তারা আবার আবেদন করতে পারবে। দুই, যারা আবেদন করেছিল, এখানকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা এখানকার কোনো affiliating body তাদেরকে অনুমোদন দিয়েছিলেন, অথবা পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, অথবা পরীক্ষা গ্রহণ করেছে এবং পরীক্ষা গ্রহণ করে শংসাপত্র প্রদান করেছে — এরকম যাঁরা ছিলেন তাঁরা একটা আবেদন করতে পারবেন। কী নিয়মে আবেদন করবেন সেটা আমরা পরে জানাচ্ছি। আমরা রুল তৈরি করছি। আর এটা একেবারেই একটা খুব সাময়িক ব্যবস্থা। অনন্তকাল চলবে না। কাজেই এই সুযোগটা যাঁরা নিতে চান তাঁদের নিতে হবে তবে একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ; সেটা পরে বলে দেওয়া হবে। আর নিয়মের বাইরে যাঁরা পড়ে যাবেন, এটাতে যাঁরা দরখাস্ত করতে পারবেন না, স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের যে নিয়ম আছে সেই নিয়মেই হবে। আদালতে যে জরিমানা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যাদের যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাদের সে জরিমানার অর্থ, যত অর্থ তারা ছাত্রছাত্রীদের কাছে গ্রহণ করেছে তার দ্বিগুণ অর্থ Council-এ জমা দিতে হবে। আর দরখাস্তের জন্য টাকা দিতে হবে। ভিজিটররা এসে বলে দিচ্ছেন, ৩রা অক্টোবরের মধ্যে আবেদন জমা করতে হবে। জমা করার জন্য ৩০ হাজার টাকা দিতে হবে, আর যাদের যাদের ক্ষেত্রে জরিমানা হবে সে অর্থও এক্ষুনি দিতে হবে। সময় বাড়ানো যাবে না। আমরা লোকজন পাঠাচ্ছি। সেটা কী হবে জানি না। আমরা বলছি কেন এত টাকা দেবে? তারা তো এই আশ্বাস আগে পেয়েছিল তোমাদের কাছে যে অর্থ কম দিলেও চলবে — এ সব আমরা লিখছি। কী এমন অপরাধ করেছি ইত্যাদি এ সব লেখাই হবে, কাজ কতটা হবে জানি না। এটার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে আমরা দেখলাম রাজ্য সরকারের ১৫টার মত আছে, তাদের প্রত্যেকটির জন্য রাজ্য সরকারকে ৩০ হাজার টাকা করে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য তো রাজ্য সরকার টাকা দেবে না, তাদের অর্থ যোগাড় করতে হবে। জরিমানার অর্থও দিতে হবে। দিলে কী হবে? বড়জোর একদিনে তাঁরা পরিদর্শন করবেন ৬০ জনের একটা দল তাঁরা তৈরি করে দিয়েছেন ইতোমধ্যেই। একটানা দুটো দিনের মধ্যে সমস্ত পরিদর্শন হয়ে যাবে। কে কী অবস্থায় আছে, কে ক'বছর পড়িয়েছে, কত ছাত্রছাত্রী ইত্যাদি তথ্য নেবে। তারা বলেছে যে দরখাস্তগুলো আসছে সেগুলো সম্বন্ধে অগ্রিম রাজ্য সরকারগুলো, বি এড-এর ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়, পি টি টি আই-এর ক্ষেত্রে এখানকার প্রাইমারী এডুকেশন কাউন্সিল কে বলে দিতে হবে যে এরা আবেদন করছে, আমরা জানি, আমাদের সমর্থন আছে। তা না হলে ওরা বিবেচনাই করবে না। না গিলে যাবেন কোথায়? আপনাকে গিলতেই হবে।

সবটাই হচ্ছে একেবারে সাময়িক। এরপরে কী হবে, আগামী বছর কী হবে এটা পরিষ্কার নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের খসড়া শিক্ষার অধিকার বিলের আমাদের প্রতিবাদ করতেই হবে। এটা রাজনৈতিক স্তরে যাঁরা বিষয়টা বোঝেন তাঁদের কাছে যতটা সম্ভব ব্যাখ্যা করতে হবে। হতে পারেন তাঁরা বিভিন্ন দলের বা বিভিন্ন মতের। কিন্তু আমাদের তাঁদের কাছে বলতে হবে। তাঁদের কাছে এটা উপযুক্তভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব কিন্তু আমাদেরই বেশি। আপনাদের কথার তাঁরা যথেষ্ট মূল্য দেন — আপনারা এটা তাঁদের কাছে তুলে ধরবেন। রাজ্যব্যাপী একটা কর্মসূচি করা দরকার। পরবর্তী পর্যায়ে, সর্বভারতীয় পর্যায়েও কিছু কর্মসূচি করা দরকার।

শেষে বলি, শুধু সমালোচনা করে কোনো লাভ নেই। আমাদের কতকগুলো বিকল্প প্রস্তাব রাখতে হবে। কী আমরা মনে করি, কেন আমরা এরকম অবস্থার মধ্যে থাকব? আমাদের প্রস্তাব কী? শুধু আরও অর্থ বরাদ্দ কর ইত্যাদি? আমাদের কিন্তু দুটো ব্যাপার আছে। একটা হলো, আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনা। এটা স্থির করার ব্যাপারে আপনারা আমাদের রাজ্যকে ও সরকারকে পথনির্দেশ করতে পারেন। আর একটা হলো, আমরা যে কাজ হাতে নিয়েছি সেটা আরো সুষ্ঠুভাবে করা। এই জায়গাটাতে আমরা নিজেরা যদি খুব আত্মবিশ্বাসী থাকি তাহলে আমাদের রাজ্যের মানুষকে তো সঙ্গে পাবই, আরো অনেককে সঙ্গে পাব।

এটা তো আমাদের সংবিধানে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এটা আমাদের বহুদিনের দাবি — এটা হোক। তাহলে আমাদের রাজ্যগুলো কী ধরনের পরিকল্পনা করতে পারে সেটা করতে হবে। সর্বশিক্ষা অভিযান আমরা গ্রহণ করেছি। গ্রহণ যখন করেছি তখন যতটা মনযোগ দিয়ে করতে পারি করব। অবশ্য প্রতিবাদটা এখনই জনসমক্ষে উপস্থিত করার গুরুত্ব আজ বেশি। প্রচুর পুঁজি উদগ্রীব হয়ে আছে শিক্ষায় প্রবেশ করার জন্য। ইতোমধ্যে পুঁজি প্রবেশ করেছে। অনেক তার লক্ষণ আছে। আমি তারমধ্যে যাব না। বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা চলছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গে তার কিছু কিছু লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি খুব স্পষ্টভাবে। শহরাঞ্চলে বেশি, গ্রামে কিছুটা কম। প্রচুর! ডানা মেলতে শুরু করেছে। আরও ডানা মেলবে। কী বিকল্প এর? সমস্তটা এসে পড়ছে এইভাবে যে গরিবদের শিক্ষার ব্যবস্থা সরকার করুক আর বাকি যাদের অর্থ আছে তাদেরটা দেখতে হবে না। সাংঘাতিক একটা দূরত্ব। কী আমরা করব? কী আমাদের উত্তর? ভাবতে হবে। যদি ঠিক করা হয় যে এসব কিছুই করার দরকার নেই, তাহলে সরকার সত্যি সত্যি হাত গুটিয়ে নেবে। যদি মনে করেন যে আমাদের কিছু করার দরকার আছে, যেটা আমাদের চিহ্নিত হবে সেই জায়গাটা আমাদের একেবারে আঁকড়ে ধরতে হবে। ঐখানে আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের যতটা মতবিরোধ কম করা যায়। নিশ্চয় সেটা পারা যাবে। এত অভিজ্ঞতা আপনাদের। আপনাদের আজকের এই কনভেনশনের খুব প্রয়োজন ছিল। এরকম পরিবেশ তৈরি করুন, আমরা চেষ্টা করব সরকারের তরফ থেকে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার। সেটা আমার মনে হয় প্রাথমিকভাবে ভালই হয়েছে। আমাদের বুঝতে হবে। আমরা সব বুঝে গেছি এটা আমরা মনে করি না। এই কনভেনশনের সমস্তরকমের সাফল্য কামনা করি। প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। কনভেনশনকে অভিনন্দন জানাই। প্রতিটি শিক্ষক সংগঠনকে অভিনন্দন এবং নমস্কার জানাই।

সভায় উত্থিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এ ছাড়া জেলায় জেলায় আটটি সংগঠন মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল, ২০০৬ নিয়ে কনভেনশন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য একটি পত্র লেখা হয় আটটি সংগঠনের পক্ষ থেকে। ঐ পত্র সভায় পঠিত হয়। সামান্য সংশোধনের পর ঐ পত্র ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী, পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী, বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী, মাদ্রাসা শিক্ষামন্ত্রী, এস টি এফ আই-এর সাধারণ সম্পাদককে পাঠাবার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভা পরিচালনা করেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত সভাপতিমন্ডলী ঃ

রীতা সেন (এ বি টি এ), সমর চক্রবর্তী (এ বি পি টি এ),

রাজকুমার রাহা (পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘ), শম্ভু ঘোষ (প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ), মানস চ্যাটার্জী (বঙ্গীয় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমিতি), তড়িৎ ব্রহ্মচারী (বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি) প্রমুখ।

সর্বশিক্ষা অভিযান

(পার্শ্বশিক্ষক সম্পর্কে তথ্য)

পার্থ দে

বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সর্বশিক্ষা অভিযানের ৪৫তম প্রকল্প অনুমোদন পর্ষদ ১৩·০৮·২০০৩ নিম্নলিখিত পার্শ্বশিক্ষক পদ পশ্চিমবাংলায় ২০০৩-০৪-এর জন্য অনুমোদন করে। তারসঙ্গে এদের ভাতার হারও নির্ধারণ করে :

বিদ্যালয়	মোট শিক্ষক	শিক্ষকপিছু প্রদত্ত ভাতা (টাকায়)
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩,৫০০ জন	৩,০০০/-
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০,০০০ জন	৪,০০০/-
মোট	৬৩,৫০০ জন	

কোন পদে নিয়োগ হয় নাই।

২·৬·২০০৪-এর ৫২তম প্রকল্প অনুমোদন পর্ষদ ২০০৪-০৫-এর জন্য পশ্চিমবাংলায় নিম্নলিখিত পার্শ্বশিক্ষক পদ পরিবর্তিত ভাবে অনুমোদন করে।

বিদ্যালয়	মোট পার্শ্বশিক্ষক	পার্শ্বশিক্ষক পিছু প্রদত্ত ভাতা (টাকায়)
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১,০৩২ জন	১,০০০/-
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২,৬০৪ জন	২,০০০/-
মোট	৭৩,৬৩৬ জন	

২০০৪-০৫ সালে পার্শ্বশিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। কিছুদিনের মধ্যে ২২·১২·২০০৪-এ উচ্চ আদালতের আদেশে পার্শ্বশিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকে। ইতিমধ্যে ১৭,৫৭৯ জন পার্শ্বশিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে।

পুনরায় ১৩·০৫·২০০৬-এর প্রকল্প অনুমোদন পর্ষদ পুনরায় প্রাথমিকে ৩১,০৩২ ও উচ্চ প্রাথমিকে ৪২,৬০৪ জন পার্শ্বশিক্ষকের পদ অনুমোদন করে। অর্থাৎ মোট ৭৩,৬৩৬ জন পার্শ্বশিক্ষক নিযুক্ত হতে পারতেন।

২২·১২·২০০৪ মামলার নিষ্পত্তি হয়। এরফলে ২০০৫-০৬ সালের জন্য ৭,৫১১ জন প্রাথমিক স্তরে ও ২২,৮২২ জন উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পার্শ্বশিক্ষক নিযুক্ত হতে পারেন।

২০০৪-০৫ এবং ২০০৫-০৬ পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করেন যে, মোট অনুমোদিত ৭৩,৬৩৬ জন অনুমোদিত পার্শ্বশিক্ষকের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ২৪,৫৪৫ জন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক পদ সৃষ্টি করা হলে বাকি ৪৯,০৯১ জন পার্শ্বশিক্ষককে নিয়োগ করা হবে।

৪·৮·২০০৬-এর প্রকল্প অনুমোদন পর্যদ (৮৭তম) নিম্নলিখিত পার্শ্বশিক্ষক ও পূর্ণ সময়ের শিক্ষকের পদ অনুমোদন করেন।

বিদ্যালয়	মোট পার্শ্বশিক্ষক	পার্শ্বশিক্ষক পিছু প্রদত্ত ভাতা (টাকায়)
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫,৭৮১ জন	১,৫০০/-
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭,০১০ জন	৩,০০০/-
মোট	৬২,৭৯১ জন	

এরমধ্যে নিয়োগ হয় ৩৪,০২০ জন পার্শ্বশিক্ষক।

পূর্ণ সময়ের শিক্ষকের পদ অনুমোদিত হয় ১০,৩৪৪ প্রাথমিক ও ১৪,২০১ জন উচ্চ প্রাথমিক।

বিপুল সংখ্যক পার্শ্বশিক্ষকের পদ পূরণ করা যায়নি। যে জেলাগুলিতে শূন্যপদের সংখ্যা সবথেকে বেশি সেগুলি হলো, উত্তর ২৪ পরগণা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর প্রভৃতি।

এই বিরাট সংখ্যক পার্শ্বশিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় সমগ্র সর্বশিক্ষা অভিযান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের সামনে কিছুটা আয় করা এবং তাদের উৎসাহ ও কর্মশক্তির মাধ্যমে প্রারম্ভিক শিক্ষাকে সাহায্য করার একটি সুযোগ থেকেও সমাজ বঞ্চিত হচ্ছে। তারা আমাদেরই সমাজের তরুণ অংশ। এদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করা উচিত।

এদের মাসিক ভাতা ইতিমধ্যে যথাক্রমে ১,৫০০/- (প্রাথমিক) ও ৩,০০০/- (উচ্চ প্রাথমিক) প্রস্তাবিত হয়েছে। অবশ্য পূর্ণ সময়ের শিক্ষক হিসেবে এদের সরাসরি নিয়োগ করা যাবে না যেহেতু বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগের মাধ্যমে ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের মাধ্যমে সেই নিয়োগ হয়ে থাকে।

নিরপেক্ষভাবে মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন করে এই নিয়োগ করতে হবে।

সমিতি সংবাদ

বীরভূম

জেলা শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর সিউড়ি সত্যপ্রিয় ভবনে জেলার শাখা আয়োজিত জেলাস্তরের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে, পুরস্কার বিতরণী সভায় জেলা সম্পাদক রবিউল হক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনে সমিতির লক্ষ্যের কথা তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি তথা সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ডল তাঁর বক্তব্যে সমিতির এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সহ-সভাপতি শ্রীমতী অনিমা রায়। সমিতির বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব সফল ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মহঃ শফিউল আলম এবং ডঃ কল্যাণ ভট্টাচার্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্য করার মতো।

হুগলী

চন্দননগর আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

চন্দননগর আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৬শে আগস্ট চন্দননগর বঙ্গ বিদ্যালয়ে (অজয় কোলে নগর ও মায়া চক্রবর্তী মঞ্চে)। কার্যকরী কমিটির খসড়া প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন যথাক্রমে সম্পাদক সৈয়দ ইসলাম মন্ডল এবং কোষাধ্যক্ষ সুকুমার মাঝি। ১৫৫ জন সভ্য-সভ্যার উপস্থিতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে সভার কার্যক্রমের প্রাণস্পন্দন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫টি বিদ্যালয় ইউনিটের প্রতিনিধিরা আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে 'প্রতিবেদন'কে সমৃদ্ধ করেন। কবিতাপাঠের মধ্যদিয়ে সদ্যপ্রয়াত কবি শামসুর রাহমানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মহকুমা শাখার সম্পাদক গৌতম সরকার।

উত্তর ২৪ পরগণা

দেগঙ্গা আঞ্চলিক শাখা আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

দেগঙ্গা আঞ্চলিক শাখার পরিচালনায় কার্তিকপুর দেগঙ্গা আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ে জোনের ২৫টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাগণের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। অনুষ্ঠানের শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। বিশেষ আকর্ষণ ছিল হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচিত বিধায়ক অধ্যাপক প্রণবকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের উপস্থিতি। তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় দেগঙ্গা শাখার পক্ষ থেকে। তাঁর হাতে স্মারক ও পুষ্পস্তবক তুলে দেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী সীমা রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদস্য অশোককুমার ভট্টাচার্য এবং বারাসাত মহকুমা কমিটির সম্পাদক অশোক রায়চৌধুরী। উপস্থিত অতিথিগণের বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল বিশ্বায়নের প্রভাবে আমদানিকৃত চটুল-অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার মনন ও চিন্তনের আহ্বান।

পশ্চিম মেদিনীপুর

মেদিনীপুর শহর আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

মেদিনীপুর শহর আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৫ই আগস্ট স্থানীয় কেরানীতলা শ্রীশ্রী মোহনানন্দ বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নেতৃত্ব হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলার সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য ও জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সহ-সম্পাদক অশোককুমার মন্ডল। সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে সভার কাজ শুরু হয়।

সভায় শহর আঞ্চলিক শাখার অন্তর্গত বিদ্যালয়ের ২০০৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ৫জন ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অশোককুমার মন্ডল সভার উদ্বোধন করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর ১২ জন আলোচনা করেন। জেলা সম্পাদক অপরেশ ভট্টাচার্য তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতি, সংগ্রাম-আন্দোলন

সহ পেশাগত বিষয় আলোচনা করেন। সভায় ২২৫ জন সদস্য শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

বাঁকুড়া

সিমলাপাল আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১৩ই আগস্ট সিমলাপাল আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা সিমলাপাল এম এম হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। সভা উদ্বোধন করতে গিয়ে উদ্বোধক গোপালচন্দ্র সিংহ মহাপাত্র সমিতির ইতিহাস, ধারাবাহিক আন্দোলন, বর্তমান পরিস্থিতির উপর আলোচনা করেন। আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক সুধাংশুকুমার দাস বার্ষিক প্রতিবেদন সভায় পাঠ করেন ও কোষাধ্যক্ষ শ্যামসুন্দর সিংহ মহাপাত্র আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাবকে সমর্থন করে জোনের ২৩টি বিদ্যালয় থেকে ২৩ জন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বার্ষিক সভাকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মহকুমা সম্পাদক সুকুমার পাইন। তিনি আগামী দিনের কর্মসূচি ও আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই সভায় অন্যান্যদের সাথে নবাগত সদস্য-সদস্যা ও অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের উপস্থিতি খুব আশাব্যঞ্জক।

সভার শেষে নবাগত সদস্য/সদস্যা এবং অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জেলা সভানেত্রী কবিতা মন্ডল এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে ২৩টি বিদ্যালয় থেকে বিপুল সংখ্যক সদস্য/সদস্যা উপস্থিত থেকে সভাকে সফল করতে সাহায্য করেন।

সোনামুখী আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৫ই আগস্ট সোনামুখী আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সোনামুখী বি জে হাইস্কুলে আঞ্চলিক স্তরের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২০টি বিদ্যালয় ইউনিট থেকে বিভিন্ন বিভাগে ১০০ জনেরও অধিক প্রতিযোগী ঐ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এলাকার শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী ও অভিভাবকবৃন্দ অনেকেই উপস্থিত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করেন। বিভিন্ন বিভাগে সফল প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কার দেওয়া হয়। ঐ অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক, ২০০৬-এর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিক্ষেত্রে এলাকার কৃতি তিনজন ছাত্র ও একজন ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়।

গত ৬ই আগস্ট সোনামুখী গার্লস হাইস্কুলে সোনামুখী আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় ২০টি বিদ্যালয় ইউনিট থেকে ১৫৩ জন সদস্য ও অবসরপ্রাপ্ত ২০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জেলা সমিতির সম্পাদক পরিমল সিংহ। তিনি বক্তব্যে সমিতির ইতিহাস — বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ইতিকর্তব্য ও সমিতির আগামী দিনের কর্মসূচি তুলে ধরেন।

আয়-ব্যয়ের হিসাব সহ বার্ষিক সাধারণ সভার রিপোর্টটি পেশ করেন সম্পাদক তারাপ্রসন্ন ব্যানার্জী। বিদ্যালয় ইউনিটগুলির পক্ষ থেকে ১৯জন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং অবসরপ্রাপ্তদের পক্ষ থেকে রিপোর্টের উপর গঠনমূলক আলোচনা করেন। সভায় নবাগত সদস্যদের ও বিগত একবছরে অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

যৌথ উদ্যোগে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

গত ২৪শে জুন সোনামুখী বি জে হাইস্কুলে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি (সোনামুখী আঞ্চলিক শাখা) ও নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (সোনামুখী আঞ্চলিক শাখা)'র যৌথ উদ্যোগে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে মহাশয়কে, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দেবলীনা হেমব্রম মহাশয়াকে ও স্থানীয় বিধায়ক মাননীয় নীরেশ বাগদী মহাশয়কে এক গুণীজন-শোভিত সভায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এলাকার শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী, গণ-আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতৃত্ব মাননীয় শেখর ভট্টাচার্য, উভয় সমিতির জেলা ও স্থানীয় নেতৃত্ব, সোনামুখী পৌরসভার পৌরপতি কুশল ব্যানার্জি, সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অজিত রায়, সোনামুখী ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক নিতাইচরণ সামন্ত, বিভিন্ন গণ-সংগঠনের নেতৃত্ব ও এলাকার বহু বিশিষ্ট গুণীজন উপস্থিত ছিলেন।

গঙ্গাজলঘাটী আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৭শে আগস্ট গঙ্গাজলঘাটী আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী ভাষণে জেলা সম্পাদক পরিমল সিংহ গঙ্গাজলঘাটী আঞ্চলিক শাখার শক্তিশালী সংগঠনকে আরও মজবুত করে গড়ে তোলার জন্য নবীন শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন জোনাল সম্পাদক

আদিত্য ব্যানার্জি ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শিশির নন্দী। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ২০জন সদস্য। তাঁরা প্রত্যেকেই গঠনমূলক আলোচনা করেন এবং প্রতিটি ইউনিটকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়াসী হওয়ার আবেদন জানান। সভায় মূল্যবান বক্তব্য রাখেন বর্ষীয়ান শিক্ষক নেতা ও গণআন্দোলনের নেতৃত্ব শান্তি চ্যাটার্জি এবং অমিয়কুমার সিংহ। সভায় দুই শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

খাতড়া মহকুমা শাখার উদ্যোগে অবস্থান ও ডেপুটেশন

গত ২৫শে আগস্ট খাতড়া মহকুমা শাখার আহ্বানে খাতড়া মহকুমার অন্তর্গত সমস্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক



বিদ্যালয় থেকে প্রায় এক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী সমবেত হন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের করণের সন্নিকটে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। সাড়ে বারোটায় শুরু হয় বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে শহর পরিক্রমার কর্মসূচি। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের এই শোভাযাত্রা ও অবস্থান জনগণের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অবস্থান-মঞ্চে সভাপতির আসনে ছিলেন খাতড়া মহকুমা শাখার সভাপতি শরৎ নায়ক। মহকুমা শাখার সম্পাদক সুকুমার পাইন প্রাঞ্জল ভাষায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন। ১২ই জুলাই কমিটির খাতড়া মহকুমার যুগ্ম-আহ্বায়ক শ্যামলাল মাইতি বর্তমান আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রেক্ষাপটে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ইতিকর্তব্য সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন।

ডেপুটেশনের পর অবস্থান-মঞ্চে এসে উত্থাপিত দাবিসনদের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিবাচক বক্তব্য রাখেন মাননীয় সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা) মহাশয়। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দাবিসমূহ পূরণ করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

হাওড়া

হাওড়া সদর মহকুমা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা ও পালিত কর্মসূচি

গত ২রা সেপ্টেম্বর জেলা সমিতি ভবনে সদর মহকুমা শাখার কার্যকরী সদস্যদের নিয়ে গত একবছরের পালিত কর্মসূচির ওপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসাবে সভায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব উমাশংকর গাঙ্গুলী। তাঁর কথায়, সংগঠন ও সাংগঠনিক কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়েই একমাত্র কোনো দায়িত্বশীল সংগঠনকে চেনা যায়। দায়িত্ব যেমন চাপিয়ে দেওয়া নয়, দায়বদ্ধতাও তেমন আসে ভেতর থেকে। তাই নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পতাকাতলে যারাই মিলিত হন, তাঁদের মনের মধ্যে শিক্ষা। ৩৫জন সদস্যের উপস্থিতিতে মহকুমা শাখার সম্পাদক সমর সিংহ নাগ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। ১২ জন সদস্য এই প্রতিবেদনের উপর মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

হাওড়া সদর মহকুমা শাখার উদ্যোগে ডি আই অফিসে ডেপুটেশন

গত ৭ই সেপ্টেম্বর হাওড়া সদর মহকুমা শাখার উদ্যোগে নির্দিষ্ট দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে ডি আই অফিসে (হাওড়া) ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সদর মহকুমা শাখার সম্পাদক সমর সিংহ নাগ ডেপুটেশনের দাবিপত্রটি সভায় পেশ করেন। পরে ঐ দাবিপত্রের পক্ষে মাননীয় ডি আই (মাধ্যমিক)-এর কাছে ডেপুটেশন দিতে যান মহকুমার সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে রতন কোলে, সমর সিংহ নাগ, শান্তনু মিত্র, গৌতম ঘোষ ও সমিতির জেলা সম্পাদক শিশির দীর্ঘাঙ্গী।

দাবিসনদ পেশের পর সভায় মাননীয় বিদ্যালয় পরিদর্শকের সঙ্গে আলোচনার বিষয়গুলি সদস্যবন্ধুদের কাছে তুলে ধরেন মহকুমা শাখার সভাপতি রতন কোলে। সভায় ৩৩৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

হাওড়া সদর মহকুমা শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২৭শে আগস্ট বেলা ১১টা থেকে হাওড়া সদর

মহকুমা শাখার উদ্যোগে মধ্য হাওড়া শিক্ষালয়ে সদরের স্কুলগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩টি অঞ্চলের স্কুলগুলি থেকে নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রারম্ভে জেলা শাখার সহ-সভাপতি সেবা চক্রবর্তী এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তাঁর কথায়, চারদিকের যে অবক্ষয় আজ গোটা সমাজকে গ্রাস করেছে, পদদলিত হবার অপেক্ষায় মূল্যবোধ। তার থেকে উত্তরণের একমাত্র সহায়ক এই সংস্কৃতি। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সেই ভাবনার বিন্যাস ঘটানোই এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের বোঝা, প্রতিযোগিতার অসুস্থ দৌড়, যার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা আজ বড়ো বেশি ক্লান্ত। সেই ক্লান্তি কাটিয়ে আগামীর স্বপ্ন দেখবে যারা, সেই কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মস্তিষ্কে সুস্থ সংস্কৃতির বীজ বপন করার মধ্যে আমাদের সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকাদের উপস্থিতি ছিল প্রশংসনীয়।

জগাছা আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৬শে আগস্ট জগাছা আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা ইছাপুর হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন জেলা নেতা অরবিন্দ সমাদ্দার। অঞ্চল সম্পাদক ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষা মঞ্জুলিকা নস্কর। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করে বিদ্যালয় ইউনিটগুলির পক্ষ থেকে গঠনমূলক আলোচনা করেন সদস্যবৃন্দ। পেশাগত বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি পঠন-পাঠন, বিদ্যালয় পরিকাঠামো, বি এড সংক্রান্ত সমস্যা, পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক সমস্যা, সাংগঠনিক শিক্ষাশিবির প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচিত হয়। সেইসঙ্গে বিশ্লেষিত হয় অঞ্চলের কর্মকান্ড। অঞ্চল সম্পাদক বিভিন্ন ইউনিট থেকে আসা সমস্যাগুলির যথাসম্ভব উত্তর দেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিস্তারিতভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিপদ ও তার উত্তরণ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেন।

শিবপুর আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গত ১২ই আগস্ট শিবপুর হিন্দু গার্লস হাইস্কুলে শিবপুর আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ১৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিযোগিতার শেষে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে সমস্ত প্রতিযোগী ও অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সামনে প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করে এবং প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য নিয়ে সংক্ষেপে বক্তব্য রাখেন অঞ্চল সভাপতি শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়। তারপর ফলাফল ঘোষণার মধ্যদিয়ে শেষ হয় অনুষ্ঠান।

শিবপুর আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৬শে আগস্ট বাজেশিবপুর বি কে পালস্ ইনস্টিটিউশনে শিবপুর আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অঞ্চল সম্পাদক বার্ষিক প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসেব পেশ করেন।

বিভিন্ন ইউনিট থেকে আগত প্রতিনিধিরা প্রতিবেদনের ওপর বক্তব্য রাখেন। সম্পাদক তাঁর জবাবী ভাষণে সমিতির সাংগঠিক বিষয়ে এবং সদস্যদের আলোচিত বিষয়ে আলোকপাত করেন।

জগৎবল্লভপুর উত্তর আঞ্চলিক শাখার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতি এবং চিন্তার প্রসারে গত ১২ই আগস্ট জগৎবল্লভপুর উত্তর আঞ্চলিক শাখা প্রতি বছরের মতো এবারেও পান্নালাল সীট বালিকা বিদ্যাপীঠে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রায় পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাদের উপস্থিতিতে প্রতিযোগিতাটি তার সামাজিক দায়িত্ব পালনে সমর্থ হয়। প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারা আগামীদিনে প্রতিযোগিতাটিকে আরও সুন্দরভাবে এলাকার মানুষের কাছে উপস্থাপিত করবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। প্রতিযোগিতা শেষে প্রতিযোগীদের হাতে অঞ্চল সভাপতি সহ উপস্থিত নেতৃবৃন্দ পুরস্কার এবং শংসাপত্র তুলে দেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

গোসাবা আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গোসাবা আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১৭ই সেপ্টেম্বর কালিদাসপুর ভীমচন্দ্র হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধক রঘুপতি কপাট তাঁর ভাষণে বলেন যে সমাজ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের কাছে অনেক প্রত্যাশা করে। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক সভাপতি স্মৃতিকণ্ঠ বাগ। এরপর সম্পাদক বার্ষিক প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সভায় পেশ করেন।

প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ নেন ৯জন প্রতিনিধি। সভায় প্রধান অতিথি রূপে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন আঞ্চলিক সম্পাদক সন্তোষকুমার বর্মন। সভায় ৫৫জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

রায়দীঘী আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

প্রায় শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার উপস্থিতিতে গত ২৯শে জুলাই কাশীনগর গার্লস হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয় রায়দীঘী আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা। ডায়মন্ডহারবার মহকুমা সম্পাদক অলক ভট্টাচার্য, জেলা সম্পাদক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জেলা সহ-সম্পাদক রবীন রায় এই সভায় বক্তব্য রাখেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও শিক্ষকদের সমাবেশ তাঁদের দ্বারা প্রশংসিত হয় এবং সাম্প্রতিক শিক্ষাজগতের নানান সমস্যা ও শিক্ষা-আন্দোলনের খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁরা আলোকপাত করেন। বক্তারা প্রত্যেকেই নবাগত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে সমিতির বক্তব্য ও অতীত আন্দোলনের উত্তরাধিকার পৌঁছে দেবার প্রশ্নে জোরদার সংগঠন গড়ে তোলার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক অময়কৃষ্ণ প্রামানিকের পেশ করা প্রতিবেদনের উপর বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। সভার শুরুতে কাশীনগর গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রীরা নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক শাখার সভাপতি কিশোরী শাসমল।

বারুইপুর আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

বারুইপুর আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা মাদারাট পপুলার একাদেমীতে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সভা উদ্বোধন করেন জেলা কমিটির সহ-সভাপতি শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। সম্পাদক দীপেন মাইতির পেশ করা প্রতিবেদন ও কোষাধ্যক্ষ কোস্তভ কান্তি পাড়িয়ার পেশ করা আয়-ব্যয়ের উপর ৭ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। সভায় প্রায় ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন। 'সাধারণের জন্য শিক্ষা আক্রান্ত' এই বিষয়ের উপর জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক অপূর্বকুমার মন্ডল বক্তব্য রাখেন। সকলকে ধন্যবাদ জানানোর পর সভাপতির ঘোষণার মাধ্যমে সভা শেষ হয়।

নদীয়া

তেহট্ট আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

গত ২৭শে আগস্ট তেহট্ট আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে বার্ষিক সাধারণ সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান নিমতলা বিদ্যানিকেতনে হয়। পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যদিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। উদ্বোধক কমলেন্দু সান্যাল তাঁর বক্তব্যে সমিতির সংগ্রামী ইতিহ্য, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও



শিক্ষাকর্মীদের লড়াকু মনোভাব, শিক্ষার মানোন্নয়নে আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস তিনি তুলে ধরেন।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন আঞ্চলিক সম্পাদক দীপককুমার রায় এবং পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ রঞ্জিত মন্ডল। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ১০ জন প্রতিনিধি। সভায় এছাড়া বক্তব্য রাখেন শিক্ষা ও সাহিত্যের যুগ্ম সম্পাদক অপর্ণা সান্যাল। তিনি তাঁর বক্তব্যে নবাগত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি কিছু মূল্যবান পরামর্শ দেন। পাশাপাশি সদস্য/সদস্যাবন্ধুদের কাছ থেকে শিক্ষা ও সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা পাঠানোর আহ্বান জানান।

এরপর সভায় বিধায়ক বিশ্বনাথ ঘোষকে সংবর্ধিত করা হয়। শ্রীঘোষ সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে তাঁর আলোচনার প্রথমেই বলেন যে তিনিও একজন শিক্ষক ছিলেন। আরও জানান শিক্ষা ও শিক্ষকদের আন্দোলনে তিনি অতীতে ছিলেন, বর্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। আমন্ত্রিতদের সত্যপ্রিয় রায়ের বাঁধানো ছবি, কলম ও লাল গোলাপের কুঁড়ি দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

জেলা সম্পাদক বীরেন মন্ডল তাঁর বক্তব্যে বলেন, এ মুহূর্তে

ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে সমিতিকে শক্তিশালী না করলে আগামীদিনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। তিনি আরও বলেন যে সর্বস্তরের অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বাড়তি মমতা, আন্তরিকতা ও পাঠদানে নিষ্ঠা দেখানোর পরামর্শ দেন। সভার ১৩৭জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

চাকদহ পূর্ব আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২রা সেপ্টেম্বর তাত্‌লা চন্দ্রকিশোর বিদ্যাপীঠে চাকদহ পূর্ব আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পন্ন হয়। উদ্বোধক ছিলেন পূর্ণেন্দু গাঙ্গুলী।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সম্পাদক এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ। আলোচনায় ৬জন প্রতিনিধি অংশ নেন। আলোচনান্তে সম্পাদক জবাবী ভাষণ দেন এবং সংযোজন ও সংশোধন সহ প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

হাঁসখালী আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

হাঁসখালী আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা গত ১১ই আগস্ট হাঁসখালী হাইস্কুলে সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। অঞ্চলের অভ্যন্তরের বিদ্যালয়গুলি থেকে ১১১জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন নদীয়া জেলার সহকারী সভাধিপতি হেমন্ত ভৌমিক, স্থানীয় বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী নয়ন সরকার।

হাঁসখালী আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

হাঁসখালী আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১৯শে আগস্ট হাঁসখালী সমবায় বিদ্যাপীঠে অমল ব্যানার্জী নগরে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির অঞ্চল শাখার সভাপতি হেমরঞ্জন মল্লিক সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন। সভায় ১৭৩ জন সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে ১১৮ জন উপস্থিত ছিলেন। জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা সভাপতি আবুল কাশেম সরকার সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ও হাঁসখালী বিধানসভার বর্তমান বিধায়ক নয়ন সরকার।

সভায় অঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এবছর নবনিযুক্ত মোট ২২জন শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জেলা কমিটির সভাপতি আবুল কাশেম সরকার সমিতির ঐতিহ্যকে তুলে ধরেন।

বিধায়ক নয়ন সরকার বলেন, আজকের শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কাজ দুই-ই বাড়ছে। সমাজব্যবস্থার সাথে সংগতি রেখে আজকের ছাত্র-ছাত্রীদের আরও প্রতিযোগীমুখী করে গড়তে হবে।

রাণাঘাট মহকুমার এক বৎসরের পালিত কর্মসূচি বিষয়ক সভা

রাণাঘাট মহকুমা শাখার এক বৎসরের পালিত কর্মসূচি বিষয়ক সভা গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রাণাঘাট নাসড়াপাড়া হেমনলিনী বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন সমিতির জেলা সম্পাদক বীরেন মন্ডল। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন মহকুমা সম্পাদক অলোককুমার ভদ্র। আয় ও ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ বিজন ভট্টাচার্য। এই সভায় রাণাঘাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অলোক দাস এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাসকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শ্রী বিশ্বাস বলেন, সমিতির কথা বলতে গেলেই নদীয়া জেলা শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব অজিত নাথ সান্যালের কথা বলতে হয়। অতীতে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে



সকলকে আন্দোলন করতে হয়েছে। বর্তমানে সমিতির পতাকাতলে সকলকে আসতে হবে এবং বিশেষ করে নতুনদের অতীতের ইতিহাস জানতে হবে। অলোক দাস বলেন, এই সংবর্ধনা আমার নয়, আপনাদের সকলের। আমার বিশ্বাস, সমিতির সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছাতে পারব। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর মোট ১২জন বক্তব্য রাখেন। মোট ২২৩জন শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী

উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন সুকুমার কর।

নবদ্বীপ আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২রা সেপ্টেম্বর শ্রী গৌরাঙ্গ বিদ্যাপীঠে নবদ্বীপ আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধন করেন সমিতির রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যা ও শিক্ষা ও সাহিত্য পত্রিকার অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক শ্রীমতী অপর্ণা সান্যাল (ব্যানার্জী)। সমিতির আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য খসড়া প্রতিবেদন পাঠ করেন। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ বিমলকুমার ভৌমিক।

প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন সর্বশ্রী সিরাজুল ইসলাম, রাখহরি শী, অর্দ্ধেন্দু সরকার ও শ্রীমতী সান্তা ব্যানার্জী। এরপর বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ মন্ডল।

রাণাঘাট মহকুমা শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

রাণাঘাট মহকুমার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা রাণাঘাট ব্রজবালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে গত ২৭শে আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। ব্রজবালা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উদ্বোধনী সংগীতের মধ্যদিয়ে সূচনা হয়। আরম্ভেই মহকুমা সম্পাদক অলোককুমার ভদ্র সংক্ষেপে গত ১৪ বৎসর ধরে সমিতির এই ধরনের প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। উদ্বোধন করেন মহকুমা সমিতি তথা জেলা সমিতির সহ-সভাপতি মহীতোষ দেব। রাণাঘাট মহকুমার ৮টি আঞ্চলিক শাখার পক্ষ থেকে মোট ১৫৬জন প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। এছাড়াও একই মঞ্চে অজিত সান্যাল স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়। মহকুমায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র ও ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রয়াত নেতা অজিত সান্যাল সম্পর্কে সংক্ষেপে বক্তব্য রাখেন ট্রাস্ট-এর অন্যতম সদস্য পূর্ণেন্দু কুন্ডু। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

নবদ্বীপ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে কর্মশালা

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নবদ্বীপ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে গত ২৩শে জুলাই বাবলারি রামসুন্দর হাইস্কুলে 'শিক্ষা আন্দোলনে সমিতির সংগ্রামী ঐতিহ্য' বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সমিতির রাজ্য সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষা ও সাহিত্য পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক অপর্ণা সান্যাল (ব্যানার্জী), জেলা সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ মন্ডল, সহ-সভাপতি সুভাষ সরকার, সহ-সম্পাদক ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদস্য রণজিৎ মন্ডল এবং মহকুমা সম্পাদক সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য। কর্মশালায় সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন আঞ্চলিক সমিতির সভাপতি রবি ব্যানার্জী।

কর্মশালায় উপস্থিত ৭৮জন এস এস সি থেকে আসা এবং ৬০জন পুরানো শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সামনে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় শিক্ষা আন্দোলনে সমিতির সংগ্রামী ঐতিহ্য বিষয়ে উদ্বোধনী ভাষণ দেন সমিতির রাজ্য সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, সমিতির ইতিহাস জানতে হলে তার উৎস জানতে হবে। এজন্য কেন্দ্রীয় সমিতি প্রকাশিত শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন লেখা ও শিক্ষা ও সাহিত্যে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ ভালোভাবে



অনুধাবন করতে হবে। নবীনদের হাতে সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে। তাদের সচেতন করতে শিক্ষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করতে হবে। '৫৪-র সংগ্রামী ঐতিহ্য ও তার উত্তরাধিকার' বইটি পড়তে হবে। পুরাতন ও নবীন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুপাত বর্তমানে ৩০ : ৭০-তে এসে পৌঁছেছে। তাই এখনই নবীনদের এগিয়ে আসতে হবে।

নবদ্বীপ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে শিক্ষক দিবস পালন

গত ৫ই সেপ্টেম্বর নবদ্বীপ শিক্ষামন্দির স্কুলে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে নবদ্বীপ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে মহান শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক সভাপতি রবি ব্যানার্জী। এছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা

সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ মন্ডল, রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যা তথা 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক অপর্ণা সান্যাল (ব্যানার্জী) ও প্রবীণ সদস্য অর্দ্ধেন্দু সরকার। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, সমিতির প্রাণপুরুষ সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী ও যোগমায়া ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর সভার কাজ আরম্ভ হয়। উক্ত সভায় বিগত একবছরের মধ্যে অঞ্চলে যে-সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা বা শিক্ষাকর্মী অবসর গ্রহণ করেছেন, তাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, অর্দ্ধেন্দু সরকার, অপর্ণা সান্যাল (ব্যানার্জী) ও অধ্যাপক ডঃ নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ধমান

জেলা শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গত ৩রা সেপ্টেম্বর জেলা শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বর্ধমান সি এম এস হাইস্কুলে (দিবা) অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা স্তরে এই প্রতিযোগিতায় যারা প্রথম স্থান অধিকার করেছে তারাই জেলা স্তরে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন জেলা শাখার প্রাক্তন সম্পাদক দুর্গাশিব রায়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বর্ধমান এম ইউ সি কলেজের অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ সুকৃতি ঘোষাল বলেন যে সমাজে মূল্যবোধ ও নৈতিকতাবোধ অবক্ষয়ের পথে তাই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের একান্ত প্রয়োজন আছে, আর শিক্ষকরাই পারে ছাত্রদের মধ্যে মূল্যবোধ ও সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে।

বর্ধমান সদর মহকুমার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গত ১৩ই আগস্ট বর্ধমান সদর মহকুমার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান সদর মহকুমার ৩৪১ সদস্য বিদ্যালয়ের ২৪০টি বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়। জোনস্তরে এই প্রতিযোগিতায় যারা প্রথম হয়েছে তারাই মহকুমাস্তরে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন জেলা শাখার প্রাক্তন সম্পাদক দুর্গাশিব রায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন মহকুমা সম্পাদক শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানকে উদ্বোধন করেন শ্যামসুন্দর কলেজের অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ দেবপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণের মধ্যদিয়ে সুস্থ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করেন।

বর্ধমান সদর মহকুমার সমাবেশ ও গণডেপুটেশন

গত ২৯শে আগস্ট বর্ধমান সদর মহকুমা শাখার উদ্যোগে যে সমাবেশ ও গণডেপুটেশনের ডাক দেওয়া হয়েছিল তাতে সব জোন থেকেই ভাল সংখ্যায় সদস্যবন্ধুরা উপস্থিত হয়েছিলেন। মোট উপস্থিতির সংখ্যা ১২১২জন। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাকে পণ্যিকরণের বিরুদ্ধে, শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়বৃদ্ধির দাবিতে, শিক্ষাকে রাজ্য তালিকায় ফিরিয়ে আনার দাবিতে এবং সেইসঙ্গে রাজ্য সরকারের কাছে কিছু দাবি নিয়ে ও ঐ অফিসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ডি আই-এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল।

সমাবেশ ও গণডেপুটেশনে জেলার নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক মহম্মদ ইউনুস, জেলা সহ-সভাপতি সুভায চট্টোপাধ্যায়, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও প্রাক্তন নেতৃত্ব দেবেন্দ্রকুমার লাহিড়ী এবং জেলা কমিটির সদস্য আব্দুর রহমান। সমাবেশে দাবিপত্র পেশ করেন মহকুমা সম্পাদক শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা সভাপতি নুরুল হক।

বর্ধমান সদর মহকুমার বিগত একবছরের পালিত কর্মসূচি

বর্ধমান সদর মহকুমা শাখার 'বিগত এক বছরের পালিত কর্মসূচি' বর্ধমান জেলা শাখার আমোদবিহারী বসু ভবনে বিমল দাশগুপ্ত কক্ষে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

সম্পাদকীয় খসড়া প্রতিবেদন পাঠ করেন সম্পাদক শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত সদস্যরা সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর যা আলোচনা করেন সেই আলোচনাগুলিকে কেন্দ্র করে জেলা সম্পাদক মহম্মদ ইউনুস তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। জবাবী ভাষণ দেন সম্পাদক শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়।

কালনা আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

কালনা আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৩রা সেপ্টেম্বর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয় কালনা

মহারাজা উচ্চবিদ্যালয়ে।

উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলা প্রাথমিক বোর্ডের চেয়ারম্যান শাইদুল হক ও বিশেষ অতিথি হিসাবে



ছিলেন কাটোয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী আবু আয়েষ মন্ডল। জেলা নেতৃত্বের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জিত ব্যানার্জী। সভাতে প্রায় ৩০০জন সদস্য প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ১৭ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার জন্য আলোচনা সাপেক্ষে নিম্নলিখিত সংশোধনী ও প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ

১) ৫০% ডি এ মূল বেতনের সাথে যুক্ত করতে হবে।

২) S. T. যে পদগুলি একাধিক বৎসর যাবৎ প্রার্থী না পাওয়ার জন্য শূন্য আছে সেগুলি অবিলম্বে অসংরক্ষিত করতে হবে।

৩) বিদ্যালয়গুচ্ছের প্রয়োজনীতা আছে এবং সত্বর এই ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

৪) চাকুরীর মেয়াদকাল নির্বিশেষে সকল অবসরপ্রাপ্তকে ৫০% হারে পেনশন দিতে হবে।

৫) সভায় মূল্যবৃদ্ধি, জঙ্গীহানা-সন্ত্রাসবাদ ও ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্কের উপর তিনটি প্রস্তাব পাঠ করা হয় এবং গৃহীত হয়।

দার্জিলিং

শিলিগুড়ি মহকুমা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা

শিলিগুড়ি মহকুমা শাখার উদ্যোগে অবসরপ্রাপ্ত ও নবাগত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের নিয়ে গত ২রা সেপ্টেম্বর স্থানীয় দেশবন্ধু হিন্দী হাইস্কুলে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় ২৫০জন সমিতির সদস্য/ সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত ভাষণে মহকুমা সম্পাদক ভবেশ রায় সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ব্যক্ত করেন এবং তিনি আরও বলেন যে, প্রবীণের অভিজ্ঞতা ও নবীনের উদ্যমেই সমিতি শক্তিশালী হবে। নবাগতদের ৭জন সদস্য তাদের বক্তব্যের মধ্যে এই যৌথ সভার মাধ্যমে তারা সমৃদ্ধ হয়েছেন তা স্বীকার করেন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্যামলেন্দু দে, জেলা সম্পাদক তমাল চন্দ, জেলা সহ-সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্ত শিক্ষার প্রসারে, পেশাগত সমস্যা সমাধানে সমিতির ভূমিকা এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ফাঁসিদেওয়া আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

ফাঁসিদেওয়া আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১২ই আগস্ট ফাঁসিদেওয়া উচ্চবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্বোধক ছিলেন দার্জিলিং জেলার অন্যতম সহ-সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্ত। আঞ্চলিক শাখা সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যথাক্রমে বার্ষিক রিপোর্ট ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করার পর ৯জন সদস্য এই রিপোর্টের উপর গঠনমূলক আলোচনা করেন। আঞ্চলিক সম্পাদক কাজল দাসের জবাবী ভাষণের পর রিপোর্ট এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মহকুমা সম্পাদক ভবেশ রায় সভায় বক্তব্য রাখেন।

মাটিগাড়া-বাগডোগরা আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

মাটিগাড়া-বাগডোগরা আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৬শে আগস্ট মাটিগাড়া বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই সাধারণ সভার উদ্বোধন করেন জেলা শাখার কোষাধ্যক্ষ নবারুণ চৌধুরী। আঞ্চলিক সম্পাদক

অশোক সরকার সাংগঠনিক রিপোর্ট ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করার পর ৭জন সদস্য/সদস্যা এই রিপোর্টের উপর আলোচনা করেন। জবাবী ভাষণের পর সর্বসম্মতিক্রমে রিপোর্ট ও আয়-ব্যয়ের হিসাব গৃহীত হয়। মহকুমা সম্পাদক ভবেশ রায় ও জেলার সহ-সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করে অর্জিত অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সমস্ত সদস্যের আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের আবেদন জানান।

জেলা শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

জেলা শাখার উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ৯ই সেপ্টেম্বর তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে শুরু হয়। জেলার বিভিন্ন জোন থেকে প্রতিটি বিষয়ে প্রথম স্থানাধিকারীরাই এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রবীণ সদস্য সত্যব্রত বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ডঃ বিমল চন্দ সহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব উপস্থিত থেকে সফল ছাত্র/ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন এবং সমিতির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় শাখার কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শিলিগুড়ি মহকুমা শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি মহকুমা শাখার অন্তর্গত চারটি আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যথাক্রমে নকশালবাড়ী-খড়িবাড়ী আঞ্চলিক শাখার নকশালবাড়ী নন্দপ্রসাদ উচ্চবিদ্যালয়ে ১২ই আগস্ট, ফাঁসিদেওয়া আঞ্চলিক শাখার আমবাড়ী হাইস্কুলে, মাটিগাড়ার বাগডোগরা আঞ্চলিক শাখার চিত্তরঞ্জন উচ্চবিদ্যালয়ে এবং শিলিগুড়ি শহর আঞ্চলিক শাখার শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে ১৯শে আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক শাখাগুলির প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ হরে। সফল প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনীদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয়।

নকশালবাড়ী-খড়িবাড়ী আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

নকশালবাড়ী-খড়িবাড়ী আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১৯শে আগস্ট নকশালবাড়ী নন্দপ্রসাদ উচ্চবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা শাখার সহ-সভানেত্রী গীতা সিন্হা সভার উদ্বোধন করেন। আঞ্চলিক সম্পাদক সঞ্জীব মজুমদার এবং কোষাধ্যক্ষ অমল বর্মণ যথাক্রমে খসড়া প্রতিবেদন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। সভায় উপস্থিত ১০৩ জন সদস্যের মধ্যে ১০জন সদস্য প্রতিবেদনের উপর আলোচনার পর রিপোর্ট এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। জেলা সম্পাদক তমাল চন্দ তাঁর বক্তব্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে সমিতি সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করেন।

শিলিগুড়ি শহর আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

শিলিগুড়ি শহর আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১০ই সেপ্টেম্বর রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণে শিলিগুড়ি মহকুমা সম্পাদক ভবেশ চন্দ্র রায় বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক বিষয়ে সদস্যদের বেশি বেশি করে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। বিশেষত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কীভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার প্রভাব বিস্তার করে সাধারণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতি করছে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন।

আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক বিশ্বজিৎ নাগ সম্পাদকীয় খসড়া প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষ হরিসাধন মুখার্জী আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ১৫জন প্রতিনিধি প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। পরিশেষে প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এই সাধারণ সভায় জেলা সম্পাদক তমাল চন্দ অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর বক্তব্যে বলেন, সংগঠনকে পরিস্থিতি অনুযায়ী মজবুত করতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। এর পাশাপাশি আগামী কর্মসূচিও ঘোষণা করেন।

এই সাধারণ সভায় দুই শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব মেদিনীপুর

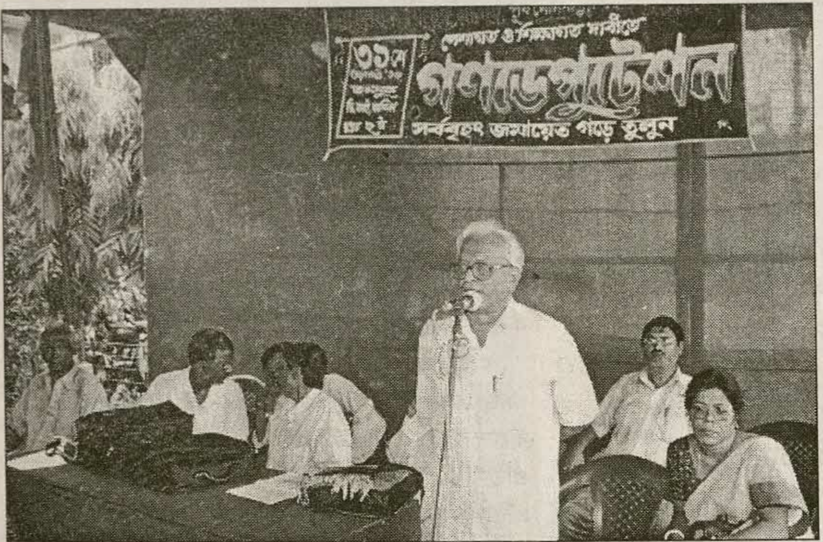
হলদিয়া-নন্দীগ্রাম-১ আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২রা সেপ্টেম্বর দুর্গাপুর জুনিয়র হাইস্কুলে নন্দীগ্রাম-১ আঞ্চলিক শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ৭৫জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। শোকপ্রস্তাব পাঠ ও নিরবতা পালনের পর সভার কাজ

শুরু হয়। রাজ্য সহ-সভাপতি ও হলদিয়া মহকুমা সম্পাদক জনার্দন দাস অধিকারী উদ্বোধনী ভাষণ রাখেন। বার্ষিক প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন জোনাল সম্পাদক শক্তিপদ সাহু। বিশিষ্ট সমাজসেবী সুনির্মল গিরি সময়োপযোগী বক্তব্য রাখেন। অভ্যর্থনা কমিটির তথা ঐ বিদ্যালয়ের সভাপতি যোগেশ চন্দ্র পন্ডা স্বাগত ভাষণ রাখেন। পঠন-পাঠন, পেশাগত ও প্রশাসনিক বিষয়গুলি নিয়ে ৯ জন প্রতিনিধি প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। সমাপ্তি ভাষণ দেন মানস ভট্টাচার্য।

জেলা শিক্ষাদপ্তরে জমায়েত-অবস্থান

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছে দাবীপত্র উত্থাপনের পাশাপাশি জেলা বিদ্যালয় প্রশাসনিক দপ্তরের কর্মপদ্ধতি পরিচালনা প্রসঙ্গে তমলুক ও হলদিয়া মহকুমার সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জমায়েত হয় ৩১শে আগস্ট ডি আই অফিসের সামনে। সমাবেশে পৌরোহিত্য করেন জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য তথা রাজ্য নেতৃত্ব জনার্দন দাস অধিকারী। দাবীপত্র পাঠ করেন জেলা সহ-সভাপতি মিনতি শাসমল এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ভাষণ দেন জেলা সম্পাদক তাপস রাজপন্ডিত এবং সহ-সম্পাদক অজয় মাইতি। বাণীব্রত বেরা, মানস ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য নেতৃত্ব ডি আই-এর সঙ্গে দাবীপত্র নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার শেষে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক আমিনুল আহসান সমাবেশে হাজির হয়ে প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন।



নন্দীগ্রাম-২ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ডেপুটেশন

নন্দীগ্রাম-২ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সুবদী দেবযানী বালিকা বিদ্যালয়ে গত ১১ই সেপ্টেম্বর পরিচালন কমিটির আর্থিক দুর্নীতি, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের উপর অন্যায় অত্যাচার ও দমন-পীড়নমূলক আচরণ-সহ ঐ বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র জানার অবৈধ সাসপেনশানের বিরুদ্ধে ৩২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী ও প্রায় ২৫০ জনের অভিভাবকবৃন্দের উপস্থিতিতে ডেপুটেশনে এবং একটি সভা সংগঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বরাচিরা পি বি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তাপসকুমার দাস। সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির আঞ্চলিক শাখা সম্পাদক উমাকান্ত দাস, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গৌতম মাটিয়া, শ্রীকান্ত পাল প্রমুখ।

শাখা সম্পাদক তাঁর বক্তব্যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যেখানে চাকুরীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত, সেখানে পরিচালন কমিটির সহ-শিক্ষকের প্রতি এমন অন্যায়-অবৈধ সাসপেনশানের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

জেলা শাখার উদ্যোগে জীবনশৈলী শিক্ষার পরিপূরক কার্যক্রম

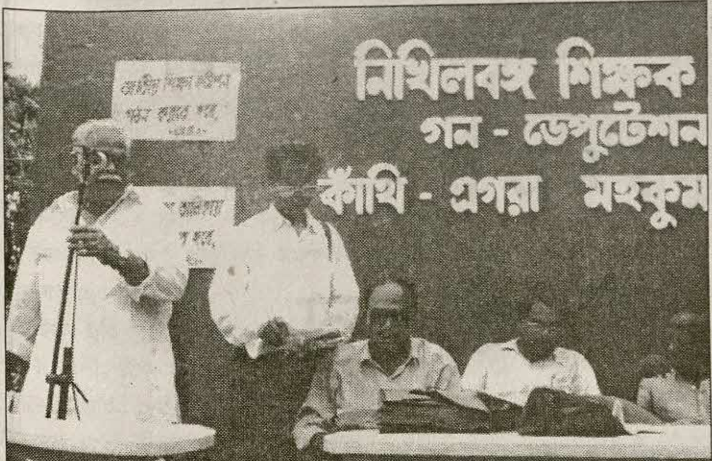
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুপ্রেরণায় এবং জেলা শাখার তত্ত্বাবধান কমিটির আয়োজনে ২৭শে আগস্ট তমলুকের হ্যামিল্টন হাইস্কুলে জেলাস্তরীয় জীবনশৈলী শিক্ষার পরিপূরক কার্যক্রমে প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। চারটি বিষয়ে মহকুমা পর্যায়ের সফল প্রতিযোগীরা এদিন অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ অশোক তুঙ্গ।



অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) আমিনুল আহসান, ডঃ কমলকুমার কুণ্ডু, ডঃ স্বপন ভৌমিক, রাজর্ষি মহাপাত্র, তাপস রাজপণ্ডিত প্রমুখ।

জেলা শাখার আহ্বানে কাঁথি শিক্ষাদপ্তরে গণডেপুটেশন

কেন্দ্রীয় পরিষদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৯শে আগস্ট জেলা শাখার আহ্বানে কাঁথি ও এগরা মহকুমার প্রায় ৭০০ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীবন্ধু কাঁথি শহরে অবস্থিত অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তরে গণ-ডেপুটেশনে মিলিত হন। দাবী-সমাবেশে পৌরোহিত্য করেন কাঁথি মহকুমা সভাপতি অবনী করণ এবং দাবীপত্র পাঠ করেন এগরা মহকুমা সম্পাদক সমীর সামন্ত। দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদানের পর আলোচনার বিষয়বস্তু সমাবেশে অবগত করেন কাঁথি মহকুমা সম্পাদক জয়ন্ত রায়। সমাবেশে ভাষণ দেন রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য জনার্দন দাস অধিকারী, জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য পূর্ণচন্দ্র গিরি, মিনতি শাসমল ও অজয় মাইতি। এ ডি আই-এর অনুপস্থিতিতে চারজন আধিকারিক সমাবেশস্থলে উপস্থিত হন এবং সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক অর্চনা পঞ্চধ্যায়ী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। সমিতির নেতৃত্বগণ তাঁদের ভাষণে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির আলোকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নগ্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সতর্ক করে দেন। পাশাপাশি সমিতির ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে নতুন প্রজন্মকে সংগ্রাম-আন্দোলনে অভিষিক্ত করার আহ্বান রাখেন।



জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সুন্দর ও সুষ্ঠু আয়োজনের মধ্যদিয়ে গত ২৭শে আগস্ট ধূপগুড়ি উচ্চবিদ্যালয়ে জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা পর্যায়ের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমার আটটি জোন থেকে ১৮২ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। বিসমিল্লা খান, তাপস সেন, শামসুর রাহমান ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত চারটি মঞ্চে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক মনোরঞ্জন ভদ্র, সহ-সম্পাদক মৃণাল পাল, সদর মহকুমা শাখার সম্পাদক সুধীর দাস, ধূপগুড়ি জোনাল সভাপতি যতীন্দ্রনাথ সরকার, জোনাল সম্পাদক প্রণবকুমার দত্ত প্রমুখ।

আলিপুরদুয়ার পূর্বাঞ্চল শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

আলিপুরদুয়ার পূর্বাঞ্চল শাখার উদ্যোগে গত ২৭শে আগস্ট কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলে ২০০৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ১০জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০



ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং সমিতির সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে অবসরপ্রাপ্ত ৬জন শিক্ষক ও ১জন শিক্ষাকর্মীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে জোনাল সম্পাদক অনন্তকুমার সাহা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জোনাল কমিটির সভাপতি অরুণকুমার ঘোষ।

আলিপুরদুয়ার পূর্বাঞ্চল শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৩রা সেপ্টেম্বর বারবিশা বালিকা বিদ্যালয়ে আলিপুরদুয়ার পূর্বাঞ্চল শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুভাষ সেনগুপ্ত। জোনাল কমিটির সম্পাদক অনন্তকুমার সাহা সভায় প্রতিবেদন পেশ করেন এবং কোষাধ্যক্ষ নীরোদরঞ্জন চক্রবর্তী বিগত এক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। ১০জন সদস্য প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। জেলা শাখার সভাপতি গিরীন নাহা সমিতিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সভায় বিভিন্ন ইউনিট থেকে ৮৫জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে যারা সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন তাদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

শোক

বিশিষ্ট চিত্রকর-ভাস্কর সোমনাথ হোরের জীবনাবসান

বিশিষ্ট চিত্রকর-ভাস্কর সোমনাথ হোর ১লা অক্টোবর '০৬ শান্তিনিকেতনে পূর্বপল্লীতে নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। অবিভক্ত বাংলার চট্টগ্রামের বরমা গ্রামে ১৯২১ সালের ১৩ই এপ্রিল প্রয়াত হোর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর যখন ১৩ বছর বয়স তাঁর পিতা রেবতীমোহন হোর মারা যান। দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে তিনি পড়াশোনা ও শিল্পচর্চা চালিয়ে যান। ১৯৪০ সালে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে আই এস সি পাশ করে কলকাতার সিটি কলেজে ভর্তি হন। সোমনাথ ছাত্র বয়সেই কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। চট্টগ্রামেই যোগাযোগ ছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে। শিল্পী চিত্তপ্রসাদ ও অন্য কয়েকজন বন্ধুর মাধ্যমে পার্টির কাজেও যুক্ত হয়ে যান।



কলকাতা থেকে তাঁকে ফিরে যেতে হলো যুদ্ধের কারণে। ১৯৪৩-এর ভয়ঙ্কর মন্বন্তরে একদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে সাহায্য করা অন্যদিকে মানুষের তৈরি এই বিপর্যয়ের দৃশ্য চিত্রিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন তিনি। ১৯৪৪-এ সেসব স্কেচ, ড্রইং ছেপে বের হয় কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' আর 'পিপলস্ ওয়ার'-এ। চিত্তপ্রসাদও সেই দুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী দৃশ্য এঁকেছিলেন পরম যত্নসহকারে।

সেইসব ছবি দেখে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পি সি যোশী ওঁকে পরামর্শ দেন কলকাতায় সরকারী আর্ট কলেজে পড়ার। এখানে তিনি জয়নূল আবেদিন, সৈফুদ্দিন আমেদের মতো শিক্ষকের সংস্পর্শে এলেন। ছাপাই ছবি, লিথোগ্রাফ প্রভৃতিতে সোমনাথ অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ এই সময়ের মধ্যে আর্ট কলেজে ছাত্র হিসাবে ছবি আঁকা ও ভাস্কর্যে তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে থাকেন।

১৯৪৬ সালে সারাবাংলা জুড়ে চলল ঐতিহাসিক 'তেভাগা আন্দোলন'। জান, মান কবুল করে বাংলার কৃষক রক্তে বোনা ধান জোতদার-জমিদারের হাতে না তুলে দেবার আন্দোলন-এ লিপ্ত হলো। এই সময় গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রয়াত সোমনাথ হোর কৃষকদের সংগ্রামের এক বিরল চিত্রবিবরণী সৃষ্টি করলেন যা 'তেভাগার ডায়েরি' নামে খ্যাত। দুর্ভিক্ষের সময়ে তাঁর আঁকা 'দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা'-ও এক অমূল্য সম্পদ। তেভাগা আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-এর বিশেষ সংখ্যায় প্রয়াত হোরের 'তেভাগার ডায়েরি'র চিত্রগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়। ঐ সংখ্যাটি পাঠককুলের বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

তখন বাংলায় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে লেগেছে নতুন জোয়ার। বামপন্থী ভাবধারা বিকশিত করতে তখন হাজির এ জগতের কান্ডারিরা। গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ। এঁদের সাহচর্য পেলেন সোমনাথ হোর। সুকান্তের মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগেই তিনি সুকান্তের যে ছবি আঁকলেন তা 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় ছাপা হলো। সরকারী আর্ট স্কুলে পড়া শেষ হলো না। আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলো। মাঝে তিনি গ্রেপ্তার হলেন। জেলে একসময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন জ্যোতি বসু। অবশেষে চলে গেলেন আত্মগোপনে। আরো পরে ১৯৫৭ সালে স্নাতক হলেন ফাইন আর্টসে।

১৯৫৪ সালে অতুল বসুর আমন্ত্রণে ইন্ডিয়ান কলেজ অব আর্টে শিক্ষকতা শুরু করেন। তখন তাঁর দক্ষতার প্রকাশ ঘটে

কাঠ খোদাইয়ে। তেভাগার ছবি, শ্রমজীবী জনতার মুখ, আন্দোলনের দৃশ্য একের পর এক ফুটিয়ে তুলেছেন কাঠ খোদাইয়ে। বিমূর্ত শিল্পের যাদুকর ছিলেন প্রয়াত সোমনাথ হোর। শোনা যায় নিজস্ব আঙ্গিকে আলাদা কিন্তু চিন্তায় রামকিঙ্করের কাছাকাছি ছিলেন তিনি।

১৯৫৮ সালে দিল্লির সরকারী আর্ট কলেজে গ্রাফিক বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। বডোদরার এম এস বিশ্ববিদ্যালয়েও ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে পড়াতেন। ১৯৬৯-এ যোগ দেন বিশ্বভারতীতে। এখানে কলাভবনের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে তিনি সোসাইটি অফ কনটেম্পরারি আর্টিস্টসে যোগদান করেন।

একসময় তিনি বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যক্ষ হন। এখান থেকেই অবসরগ্রহণ করেন। শিল্পী রামকিঙ্কর ও বিনোদবিহারীর সাহচর্য তাঁর শিল্পকলায় নতুন মাত্রা যোগ করে।

বামপন্থী ভাবধারায় স্নাতক এই শিল্পী খ্যাতির শিখরে উঠেও দরিদ্র মানুষ, সংগ্রামী মানুষ, ক্ষুধা ও ক্ষুধার্তের লড়াইকেই তাঁর শিল্পসাধনার মুখ্য উপজীব্য করেছিলেন।

সাতের দশক থেকে মূলত ভাস্কর্যে মনোনিবেশ করেন তিনি। প্রথা ভেঙে লোহার টুকরো, ব্রোঞ্জ, মোম দিয়ে অসাধারণ সৃষ্টি করে গেছেন একের পর এক। জনজাগরণ ঘটানোর লক্ষ্যেই তাঁর শিল্পসাধনা।

জীবনে অসংখ্য সম্মান লাভ করেছেন। তিনবার ললিতকলা আকাদেমি, গগন-অবনীন্দ্র সম্মান, কালিদাস সম্মান, মুজফ্ফর আহ্মদ স্মৃতি পুরস্কার এবং ভারত সরকারের এমিরিটাস ফেলো লাভ করেছিলেন তিনি।

কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই ও অন্যান্য শহরে সোমনাথ হোরের চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী হয়েছে বহুবার। বিদেশেও প্রদর্শনী হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য ভেনিস, টোকিও, সাওপাওলোর প্রদর্শনী। তাঁর স্ত্রী এবং কন্যাও চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর। তাঁর মৃত্যুতে শিল্পজগত ও গণআন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। সমিতি তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

বহুজন সমাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, দলিত নেতা কাঁসিরামের জীবনাবসান

দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর গত ৮ই অক্টোবর, রবিবার ৭২ বছর বয়সে কাঁসিরাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কাঁসিরামের জন্ম ১৯৩৪ সালে রোপার জেলায়। '৮২ সালে তিনি গঠন করেন দলিত শোষিত সংঘর্ষ সমিতি। '৮৪ সালে এই সমিতি থেকেই জন্ম নেয় বহুজন সমাজ পার্টি। তিনি দুবার লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। হয়েছিলেন রাজ্যসভার সদস্য।

বিশিষ্ট চিকিৎসক শীতল ঘোষের জীবনাবসান

গত ৯ই অক্টোবর কলকাতার এক বেসরকারী নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন খ্যাতিমান চিকিৎসক শীতল ঘোষ। বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি দীর্ঘদিন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও নীলরতন মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। চিকিৎসক হিসাবে তিনি বিভিন্ন নামী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চিকিৎসক হিসাবে রোগ নির্ণয়ে তাঁর খ্যাতি ছিল সমগ্র দেশজুড়ে।

কেরালার গণতান্ত্রিক ও কৃষক আন্দোলনের নেতা কমরেড পি সুধাকরণের জীবনাবসান

গত ৭ই অক্টোবর রাত্রি পৌনে নটার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সি পি আই (এম) কেরালা রাজ্য কমিটির



সদস্য ও পার্টির আলাপুরা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড পি সুধাকরণের জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ছাত্রাবস্থা থেকে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। গরীব মানুষ ও কৃষকদের স্বার্থে আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি ১৯৫৩ সালে কারারুদ্ধ হন। কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার কাজে আজীবন যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৯১ সাল থেকে আমৃত্যু রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন।

শিক্ষক কমরেড অনিল বিশ্বাসের জীবনাবসান

খোয়ারডাঙ্গা জলনেশ্বরী হাইস্কুলের শিক্ষক এবং আলিপুরদুয়ার পূর্বাঞ্চল শাখার দীর্ঘদিনের সদস্য কমরেড অনিল বিশ্বাস গত ১৮ই সেপ্টেম্বর বিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে স্কুটার দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হন। শিলিগুড়িতে একটি নার্সিংহোমে তাঁর চিকিৎসা হয়। দশদিন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকার পর গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁর জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর। দীর্ঘ ২০ বৎসর ধরে তিনি সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিনম্র আচরণ ও সহমর্মিতাবোধের

জন্য তিনি সকলের কাছে ছিলেন একান্ত আপনজন। তাঁর অকাল প্রয়াণে আমরা সকলে শোকে মূহ্যমান। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমিতি সমবেদনা জানাচ্ছে।

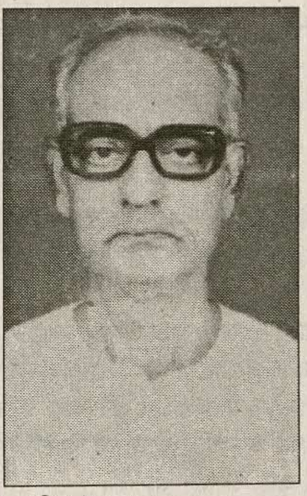
বিশিষ্ট লেখিকা প্রতিভা বসুর জীবনাবসান

'কবিতা', 'কালি ও কলম', 'কল্লোল' যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর যোগ্য সহধর্মিনী লেখিকা প্রতিভা বসু গত ১৩ই অক্টোবর, শুক্রবার সকালে একটি বেসরকারী নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

প্রতিভা বসু ১৯১৫ সালের ১৩ই মার্চ ঢাকা জেলার হাঁসড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম রাণু সোম। ছোট থেকেই তিনি সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে তিনি গান শুনিয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামের কাছেও তিনি গান শিখেছিলেন। ভজন, কীর্তন সহ বিভিন্ন রাগ-মিশ্রিত গানেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। বিয়ের পরে তিনি সাহিত্যসেবায় মন দেন, ফলে ধীরে ধীরে রাণু সোম পাঠকের কাছে প্রতিভা বসু নামে সমাদর লাভ করে। উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য সহ তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। তাঁর প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প 'মাধবীর জন্য' (১৯৪২), প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'মনোলীনা' (১৯৪৪)। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে 'রাঙা ভাঙা চাঁদ', 'পরশ পাথর', 'অতল জলের আহ্বান', 'সমুদ্র হৃদয়', 'মহাভারতের মহারণ্যে' অন্যতম। তিনি 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশনায় বুদ্ধদেব বসুকে সমানভাবে সহায়তা করেছেন এবং পরবর্তীকালে নিজে 'বৈশাখী' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।



বিশিষ্ট প্রাক্তন শিক্ষক নেতা কমরেড সুধীর রঞ্জন মুখার্জীর জীবনাবসান



নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির অবিভক্ত রাণাঘাট মহকুমা শাখার প্রাক্তন সম্পাদক (১৯৬৬-১৯৭২) তৎসহ প্রাক্তন নদীয়া জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক এবং প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, গণআন্দোলনের অগ্রণী কর্মী সুধীর রঞ্জন মুখার্জী গত ৩১শে জুলাই, ২০০৬ প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বৎসর।

প্রথমে শিক্ষকতা শুরু করেন নদীয়া জেলার গয়েশপুর নেতাজী বিদ্যামন্দির-এ ১·৮·১৯৫১ থেকে, পরে নদীয়া জেলার প্রীতিনগর ভূদের স্মৃতি বিদ্যাপীঠ (এইচ এস)-এ সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে এবং প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব পালন করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সত্তরের দশকে শাসকশ্রেণির নির্লজ্জ হুমকি, জোড়জুলুম, হিংসাত্মক কার্যকলাপজনিত কারণে বিদ্যালয়ে এবং তাঁর বাসস্থানে স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার ফলে (Absence Under duress) প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে কর্মচ্যুত হয়েছিলেন। অবশেষে বর্ধমান জেলার অমরপুর বি এগ্রি ইনস্টিটিউশন-এর প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন এবং সেখান থেকেই ১৯৯৩-এ অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন অমায়িক ছাত্রদরদী ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন শিক্ষক নেতা এবং গণ-আন্দোলনের দক্ষ সংগঠক, অগ্রণী কর্মী।

তাঁর মৃত্যুতে সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

গ্রন্থাবলোকন

শিক্ষাভাবনা — শতবর্ষে শিক্ষাপথিক

এপ্রিল-জুন, ২০০৬

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাখা

'শিক্ষাভাবনা'র আলোচ্য সংখ্যাটি যথার্থই সময়োপযোগী প্রচেষ্টা এবং মহান শিক্ষক নেতা সত্যপ্রিয় রায়ের নামে যাঁদের গবেষণা কেন্দ্র ও গ্রন্থাগার, তাঁদের পক্ষে এই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বকে শতবর্ষে স্মরণ করা স্বাভাবিকও বটে। এই পত্রিকার সাথে যুক্ত প্রত্যেককে অভিনন্দন। সঙ্গে আরও একটি কাজ ঐতিহ্য মেনেই এঁরা করেছেন তা হলো, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কিছু নমুনা প্রশ্নপত্র ও নম্বর বিভাজনের বিষয়টি স্পষ্ট করে প্রকাশ করা। আমরা সকলেই এবং ছাত্রছাত্রীরাও তাঁদের এই প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

'শিক্ষাভাবনা'র অন্যতম সম্পদ তার প্রবন্ধগুলি। এই সংখ্যায় অসাধারণ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন মিলন গাইন, নাম 'ভাববাদী দর্শন মানুষের জীবনবোধের অন্তরায়'। লেখকের সাহস এবং লেখাপড়া অভিনন্দনযোগ্য। তবে ভাববাদের কিছু ইতিবাচক দিকও আছে ; তার আলোচনা থাকলে আরও ভাল লাগত। অসিতকুমার ভৌমিক আজকের শৈশবের উপর 'শিক্ষা'র আক্রমণ নিয়ে একটি তথ্যসমৃদ্ধ রচনা উপহার দিয়েছেন যাতে স্বকীয়তার স্পর্শ নতুন আঙ্গিকের জন্ম দিতে পারত বলে মনে হয়। সমালোচক প্লেটো, লিঙ্কন, রবীন্দ্রনাথের ফাঁক দিয়ে লেখককেও দেখতে আগ্রহী। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজি শিক্ষা বিষয়ে শিপ্রা ভাদুড়ীর লেখাটি ভাল লাগল। সঙ্গে স্বাধীনতার পরে ভারতের ভাষাগুলির ইতিহাস একটু বিস্তারিতভাবে আলোচিত হলে প্রবন্ধটি আরও সমৃদ্ধ হতো বোধহয়। শতবর্ষে পা রাখা আমাদের সকলের শিক্ষক সত্যপ্রিয় রায়কে নিয়ে লিখেছেন রীতা সেন এবং উপাসনা নন্দী। বিশেষণ-সমৃদ্ধ প্রবন্ধ দুটির প্রথমটি সংক্ষিপ্ত এবং দ্বিতীয়টি দীর্ঘ। তবে প্রচুর তথ্য পাওয়া গেল।

উপসংহারে আসি মেকাইল রহমানের 'ইংরিজির ব্যাপার স্যাপার-১' প্রবন্ধটির কথায়। সমালোচকের কাছে তাঁর বেশিরভাগ বক্তব্যই বিতর্কিত এবং পরস্পর বিরোধী মনে হয়েছে। ইংরাজি নিয়ে 'আত্মঘাতী, অপরিণামদর্শী পরীক্ষা-নিরীক্ষা' ইত্যাদি শব্দগুলিও কেমন চেনা চেনা ঠেকে। বিশ্বায়নের 'খোলা' আনন্দের বাজারে 'অপরিহার্য' ইংরাজির সুনন্দ পসরাতেই এই ধরনের 'শিক্ষাচিন্তা'র বিকিকিনি দেখেছি কি? আসুন, উত্তরটা সকলে মিলে খুঁজি আর অভিনন্দন জানাই আরও একবার 'শিক্ষাভাবনা'র অক্লান্ত সৈনিকদের।

— *সোনালী দত্ত*

আহ্বান (ত্রৈমাসিক জেলা বুলেটিন)

এপ্রিল-জুন, ২০০৬ ● পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখা

একটি ভাল প্রচ্ছদ অনেক সময় একটি ভাল পত্রিকার চরিত্রের পরিচয় বহন করে ; 'আহ্বান'-এর আলোচ্য সংখ্যা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'জেলা সমিতির আহ্বান' অনেকগুলি বিষয়কে কোলাজের মত তুলে ধরেছে, যার সবক'টিই প্রাসঙ্গিক। সমৃদ্ধ কয়েকটি প্রবন্ধে অলঙ্কৃত হয়েছে পত্রিকাটি ; তার অন্যতম শেখ ইসরাইল-এর কমরেড অনিল বিশ্বাসকে নিয়ে রচনাটি। অনেক

অজানা তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল। 'যুদ্ধের বিভীষিকাঃ অশান্ত রবীন্দ্রনাথ' এক অসাধারণ রচনা — অনুত্তম ভট্টাচার্য নিঃসন্দেহে গবেষণাধর্মী কাজ করেছেন এখানে। সবুজায়ন নিয়ে ডঃ অচিন্ত্যকুমার সামন্ত তথ্যনির্ভর একটি প্রয়োজনীয় লেখা লিখেছেন, যা হয়ত স্বকীয়তার পরোয়া করে না। অপরেশ ভট্টাচার্যের লেখা 'গ্রামবাংলার ধারাবাহিক সাফল্য ঃ মিডিয়ার অপপ্রচার' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রাসঙ্গিক, তথ্যবহুল এবং সুলিখিত।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'বর্তমান শিক্ষা আন্দোলনের অভিমুখ' শীর্ষক রচনাটি। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার বিপন্ন দশা যে কোন্ ভয়ঙ্কর পরিণতির সামনে এনে আমাদের দাঁড় করিয়েছে, শিক্ষাকে 'বিশ্বায়নের' ধ্বজাধারীরা কীভাবে রাষ্ট্র-বিচ্ছিন্ন এক পণ্যে পরিণত করছে, সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে গিয়ে কীভাবে সেখানে ধনীজনের একাধিপত্য স্থাপিত হচ্ছে এসবের এক জ্বলন্ত দলিল এই প্রবন্ধ। তবে কবিতা প্রকাশের ক্ষেত্রে এই মুখপত্রকে আরও একটু সাবালক হতে হবে।

পত্রিকার শেষে রয়েছে সমিতি সংবাদ — সংক্ষিপ্ত অথচ বিচিত্র খবরের সমাহার। এই অংশ শিক্ষা-আন্দোলনের সাথে যুক্ত মানুষের প্রতি পত্রিকার সুগভীর দায়বদ্ধতার পরিচায়ক। 'আহ্বান'-এর ডাক সবাই শুনুক এবং সাড়া দিক — এই শুভেচ্ছা রইল।

— *সোনালী দত্ত*

অন্বীক্ষা (ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, জলপাইগুড়ি জেলা শাখা

সংগঠন ও সাংগঠনিক ভাবনা বিস্তারের একটি অন্যতম মাধ্যম তার মুখপত্র। সমিতির ইতিহাসে তাই ছাপা পত্রিকার কদর পরিলক্ষিত হয় জন্মলগ্ন থেকেই। আমার হাতের কাছে এই মুহূর্তে সযত্নে লালিত নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, জলপাইগুড়ি জেলা শাখার ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'অন্বীক্ষা'। এটি শারদ সংখ্যা। সম্পাদকীয় অংশে স্বাভাবিকভাবেই এ পত্রিকার উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত হয়েছে। 'অন্বীক্ষা' নিছক শারদ সংকলন নয়।.... সমিতির ঐতিহ্যময় অতীত, সত্যপ্রিয় রায়, অনিলাদির প্রদর্শিত পথে আন্দোলন সংগ্রামের ভাষায় আগামী দিনের প্রতিশ্রুতি। পত্রিকার আয়ুষ্কাল স্বল্প। এটি প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা। প্রথম সংখ্যাটি দেখার সুযোগ আমার হয়নি। তবে দ্বিতীয় সংখ্যার সূচিমুখ অংশ বিচিত্র গন্ধ ও বর্ণে শোভিত। শিউলি সুবাসে প্রচ্ছদপট মুখর। কাশফুলের দোলায় এলোমেলো মেঘের ভেলায় বিশ্বায়নী টইটুম্বুর আনন্দ বাতাস। তবুও সূর্যশপথে দায়বদ্ধ এ উচ্চারণের মলাট। লেখা সম্পর্কে বলতে গেলে প্রবন্ধের কথাই প্রথমে পারা যেতে পারে। কয়েকটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আমার ভাবনার আকাশকে প্রসারিত করে। রমা কর্মকারের 'উত্তরবঙ্গের টোটো উপজাতি' একটি অনুচ্চারিত বিষয়ের প্রতি একঝলক আলো। কারণ উত্তরবঙ্গের এই অপেক্ষাকৃত প্রান্তিক ও অন্যান্য উপজাতির দীর্ঘ সময় ভেদ করে একটি সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার প্রতিজ্ঞা আজ সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। তাদের জীবনযাপন প্রণালী সর্বোপরি জীবনে উঠে আসার স্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে এ লেখায়। তিনি একটি দায়বদ্ধ চেতনায় কলম ধরেছেন এ লেখায়। একই সঙ্গে শমিতা গোস্বামীর 'সাঁওতাল পরগণা থেকে তরাই-এ সাঁওতাল জনজাতি' রচনাটিও তরাই-এর স্নিগ্ধ সবুজায়নের মতো সুধৌত একটি রচনা। এখানে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ইঙ্গিতে লেখিকা একটি সমাজের সুখ দুঃখ এবং তার নিভৃতে স্বাভাবিক নিকানো দাওয়ার মীমাংসা সূত্রকেও বাগিচা শিল্পে রূপান্তরিত করেছেন। আর্থ-সামাজিক বঞ্চনার ধারাবিবরণ না হয়ে এ রচনা আমাদের উৎসমুখে যাবার একটি পথ খুলে দিয়েছে। তবুও রচনাটিতে আরও কিছু পারম্পর্য তথ্য থাকলে গবেষণার সূত্রসম্পর্ক হয়ে উঠতে পারত। সুকল্যাণ ভট্টাচার্যের 'গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলন ঃ প্রেক্ষাপট ও পরিণতি' ক্ষমতাদখলের অলিন্দে যাবার একটি সোনার পাথরবাটির গল্প। এ গল্প কোচবিহার-এর বিশালতা তার বহু আন্দোলনের প্রেক্ষিতে একটি কালি ছেটানো অধ্যায়। লেখক ঠিক কথাই বলেছেন, এ শুধুমাত্র রাজনৈতিক অস্থিরতার অছিলায় আরও এক মুখোশের মুখ। রচনাটিতে তথ্যের একটি সাযুজ্য আছে যা আমাদের অনেকগুলি আবছা সমস্যার আলোকিত সমাধান করতে সাহায্য করবে। তবুও শুধুমাত্র ভাবাবেগ নয়, এ অঞ্চলের উন্নয়নও আমাদের অভিপ্রায় হওয়া দরকার। আর সেই উন্নয়নে অর্থনৈতিক আয়তলেখ যেমন থাকবে তেমনই থাকবে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষাবৈচিত্র্যের বহুদর্শী ভাবনা। তবেই সমৃদ্ধ হবে হিতসাধনী ভাবনামালা। শিবপদ ভৌমিকের 'লোকসংস্কৃতির বিশ্বায়ন'

রচনাটিও একটি বাস্তব বিশ্লেষণধর্মী রচনা। সাম্রাজ্যবাদী পণ্যীকরণ, ভোগসর্বস্বতাকে পাথেয় করে যে আন্তর্জাতিক মুকুট পরতে চাইছে তার বিরুদ্ধে রচনাটি একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। 'সংস্কৃতি' বিশ্বায়নের কাছে বাধ্য থাকবে এটা সাম্রাজ্যবাদের দাওয়াই। আর তাই লোকভাবনার আকাশেও আজ কালো মেঘ। সামাজিক অপবাদগুলিকে সরিয়ে একটি প্রগতি-রুচিসম্মত সমাজই আমাদের কাম্য। শিবপদবাবুর রচনাটি আর একটু বড়ো হলে এবং প্রাসঙ্গিক আরও কিছু তথ্য বিশেষত উত্তরণের লোকগান কিংবা আধুনিকতার ব্যাপ্তি নিয়ে যে দ্বন্দ্ব আজ প্রকট হয়ে উঠছে তার সম্পর্কে আরও বিশ্লেষণ থাকলে ভালো লাগত। বীরেন্দ্রনাথ রায়ের 'বিদ্যালয়ের খেলাধূলায় অভিভাবকদের ভূমিকা একটি আত্মমগ্ন ক্রন্দনের স্বরলিপি। তাঁর রচনার শেষ স্লোগান — 'সকলের জন্য যেমন শিক্ষা চাই, তেমনি সকলের জন্য চাই খেলাধূলা' কবে সকলের হবে তা আজ একটি সংগ্রামের প্রারম্ভ। কবিতার মধ্যে সুভাষ চৌধুরী 'রক্তাক্ত লেবানন 'হয় সমাজতন্ত্র নয় মৃত্যু'র ঐক্যে একটি ঐতিহাসিক পালাবদলের পক্ষের কবিতা। এ ধরনের কবিতায় স্লোগানধর্মী লাইনের সংযোজন হওয়া এমন কিছু আশ্চর্য নয়। হয়েছেও। তবে আশ্চর্য সেই চপেটাঘাতে কবির ভাবনা কোথাও যান্ত্রিক হয়ে পড়েনি। আমাদের এমন একটা গাঢ় অনুভূতি কবি জীবনানন্দ সম্পর্কে রয়েছে যে তিনি এক ক্লান্ত নাবিক। চিলের ডানায় যাঁর ঘাম শুকিয়ে নেবার একটি অবসন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। পলাশ রায়ের 'জীবনানন্দের সাথে' কবিতায় প্রথম অংশে সেই সলজ্জ অভিমান কিছুটা নস্ট্যালজিয়ায় আক্রান্ত হলেও শেষ অংশে তিনি আমাদের সেই সত্যে উন্নীত করেন। 'হে কবি তোমার মধ্যে যেন খুঁজে নিতে পারি/জীবনের আলোকিত পথ'। তাই জীবনানন্দ তিমিরবিনাশী কবি। 'শঙ্খচিলের উড়ান'-এর কবি প্রশান্ত ধরের রচনা এখন দূরবীন সঞ্চারী হলেও মাঝে মাঝে যা পাওয়া যায় তাতে কবিকে খুঁজে পেতে আমাদের কোনো কষ্ট হয় না। আর 'অদৃশ্য টুপির পাহাড়' কবিতাকে একটি আত্মদর্শন বললেও খুব কম বলা হয়ে যায়। দিব্যদর্শনও বটে। প্রথম লাইনেই তিনি যে চাবুক চালান, তার ক্ষত (!) দীর্ঘদিন থাকবে। 'সত্যিই বলেছো তুমি — আশি বছরের আগে আমার/সাবালক হওয়া হবে না'। কেন এই নিরালম্ব আত্মঅভীক্ষ তাঁর! শব্দ, বাক্য সর্বোপরি ভাবনা বিস্তারে রচনাটি অনেকবার সকলের পড়ার মতো। তবে আমরা তাঁকে দেবব্রত বিশ্বাস হয়ে যাবার ব্রাত্য অভিমান থেকে বিরত থাকার কথাই বলব। কারণ সেখানে গান মুক্ত থাকে না। হয়ত কবিতাও। কুরুক্ষেত্রের শরশয্যায় ইচ্ছামৃত্যু সে যে বড়ো নিজের কাছেই অনভিপ্রেত প্রশ্ন। হয়তবা সিদ্ধান্ত। আমরা এ সিদ্ধান্ত মানছি না মানব না। তিনি বরং প্রান্তপল্লী শ্রীনিকেতনকেই বেছে নিন। কিন্তু আমাদের উপহার দিন কবিতা। যা দিয়ে মানুষ বাঁচে হাজার বছর। 'না লেখা কবিতাগুলো বুকের ভেতর/উড়ে যায় পুড়ে যায় চোখ ছুঁয়ে তোর' — এ কবিতার কবি অনিন্দিতা গুপ্ত রায় অনেক লক্ষ লাইনের ভিড়ে হারিয়ে না যাওয়া এক কবি। তাঁর কবিতা অতীতেও পড়েছি। একটি উত্তরণ তাঁর অনেক কবিতাতেই প্রশ্রয় পায়। এ কবিতাও (প্রত্যয়) তার ব্যতিক্রম নয়। 'মুঠো খুলে নিয়ে যায় ডাকনাম তোর/জেনে রাখ আসবেই স্বপ্নের ভোর'। অন্তমিলের হালকা পালকে বড়ো 'উষ্ণ আদরে' লেখা তাঁর কবিতা। বিষাদ, বিষণ্ণতা এইসব সহজাত জীবন উপাত্তকে স্বীকার করে নিয়েও তিনি পরক্ষণে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চান সেইসব মেদুরতা। আর সেই উত্তরণে সাহায্য করে তাঁর 'না লেখা কবিতাগুলো বুকের ভেতর'। এ সংখ্যায় একটিমাত্র বড়ো গল্প আছে। মনোরঞ্জন ভদ্রের 'কাঁসাই নদীর ধারে'। মনোরঞ্জন ভদ্রের লেখা দু-একটি কবিতা নজরে এসেছে। গল্প আসেনি সুবল, বেলা ও সৌম্যকে নিয়ে একটি নিপাট ধারাপাত সূচনায় ধরা পড়লেও। সামাজিক আবেগ ঠিক রাখার ক্ষেত্রে একটু বেসামাল হয়ে পড়েছে গল্পটি। সৌম্য ও বেলার আপাতসারল্য দিয়ে গল্পকার কোন্ গন্তব্যে পৌঁছতে চাইলেন বোঝা গেল না। এ গল্পের উত্তরণে বেলার প্রশ্রয় কীসের ইঙ্গিত! তা কি কোনো গোপন আবেগের সমর্পণ! আবার মুহূর্তেই নিজের পরিচয়ে ঘোমটার আড়ালে খেমটা নাচ দিয়ে কোন বিশ্বায়নী নাচ তিনি নাচলেন। আসলে সৌম্যর বোধের উত্তরণ আরোপিত না হয়ে প্রণোদিত হলেই ভালো লাগত। গল্পের জমি ভালো। শব্দচয়ন, কথোপকথন ভঙ্গিমা কাঁসাই উপত্যকার জলবায়ুর সঙ্গে ভীষণ মানিয়ে যায়। ছোট গল্পের মধ্যে ভালো লাগে 'আলোর ঠিকানা', 'উপলব্ধি'। পোলিও অনুনাটিকাটি যেহেতু একটি অতিবাস্তব অভিমুখীকরণ তাই এতে অন্তর্নিহিত উপাচার অপেক্ষা প্রচারসর্বস্বতার দায়ই বিশেষ বর্তে যায়। রয়েছে রম্যরচনা, বিদ্যালয় পরিচিতি, শিক্ষার্থীদের বিভাগ, পাঠকের কলম, প্রতিবেদন, সমিতির পালিত কর্মসূচি ইত্যাদি বিভাগ। রাজ্যের সমিতির সব জেলারই এ ধরনের পূর্ণাঙ্গ, নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে। সমিতির জন্মলগ্নে 'শিক্ষা ও সাহিত্য' প্রকাশের মধ্যদিয়ে যে আবেগ জন্ম নিয়েছিল তাকে প্রসারিত করার কাজে আমরা সকলে এগিয়ে চলেছি। আগামীতে নিশ্চয় হবে। দায়বদ্ধতাকে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করা যায় না। কারণ তা প্রেরণার জন্ম দেয়। পরের সংখ্যার জন্য অপেক্ষায় রইলাম।

— অশোক অধিকারী

প্রতিবেদন

ঃ গ্রন্থাগারিক দিবস ঃ

ডঃ এস আর রঙ্গনাথনের ১১৪তম জন্মদিবস উপলক্ষে গ্রন্থাগারিক দিবস–২০০৬

রবীন্দ্রভবন, বালি, হাওড়া

১৩ই আগস্ট সকাল ১০-৩০ মিনিটে গ্রন্থাগারিক দিবস-২০০৬-এর অনুষ্ঠানটির সূচনা করলেন পাঠাগার আন্দোলনের বহুখ্যাত নেতা শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৬০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিলেন ইয়াসলিক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মসমিতি। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন বালি পৌরসভার চেয়ারম্যান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হাজরা। বালিগ্রামে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ঐতিহ্য ও ইতিহাস বিষয়ে বর্ণনা করে তিনি পৌরসভার মুখপত্র পুরযাত্রিক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন। মুখপত্রে বালিগ্রামের ১৩টি এবং গ্রামাঞ্চলের ৩টি পাঠাগারের সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। পত্রিকাটি সংক্ষিপ্ত আকারে বালিগ্রামের ঐতিহ্যসম্ভূত যে ইতিহাস বর্ণনা করেছে তা সত্যই প্রশংসনীয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ঘোষণা করা হয় অনিবার্য কারণবশত পাঠাগার মন্ত্রী শ্রীতপন রায়, পরিবেশমন্ত্রী শ্রীমোহন্ত চ্যাটার্জি এবং সাংসদ শ্রীস্বদেশ চক্রবর্তী সভায় উপস্থিত হতে পারবেন না। বি ই কলেজের শোকাবহ ঘটনার কারণে অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত হতে পারেননি। এঁদের অনুপস্থিতি দূর দূরান্ত থেকে আগত পাঠাগার কর্মীদের কিছুটা হতাশ করে।

অনুষ্ঠানে ইয়াসলিকের সম্পাদক শ্রীদীপককুমার পাল বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় বিধায়ক শ্রীমতী কনিকা গাঙ্গুলী পাঠাগারের প্রয়োজনের কথা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি লক্ষ্য করেছেন পূর্ব বাংলার মানুষদের পাঠাগার-প্রীতি তুলনামূলকভাবে বেশি। শ্রীঅনুপ সরকার জনগ্রন্থাগারের প্রয়োজনের কথা বলে বলেন যে পাঠাগারের মানুষ যেন সব খবর পায় এবং পাঠাগারকে Centre of Information হয়ে উঠতে হবে। দুর্গাপুরের গ্রন্থাগারিক শ্রীমৃদুল মিত্র পাঠাগারহীন paperless society'র কথা ভেবে আতঙ্কিত বোধ করেন। তিনি ডেল কর্নেগির উল্লেখ করে বলেন ১ লক্ষ ৪৮ হাজার না দিয়ে যে ছেলে জীবন শুরু করেছে সেই নয়কে হাঁ করতে পারে কেবল পাঠাগার। পশ্চিমবঙ্গের ১৫ লক্ষ পাঠকের সামনে আছে ৫৪ লক্ষ বই। তথ্য পরিষেবা কীভাবে দেওয়া যাবে, বইগুলি কী ভাবে ব্যবহার করা যাবে সে বিষয়ে সবাইকে ভাবতে হবে। শ্রীসত্যব্রত ঘোষাল তাঁর দীর্ঘ ভাষণে Right to Information স্বীকৃত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। টি ভি'কে তিনি পাঠাগারের প্রতিযোগী বলে ভাবতেই চান না। তথ্য যদি ঠিকমতো দেওয়া যায় এবং তার প্রবহমানতা থাকে তাহলে পাঠক fact এবং fiction-এর পার্থক্য বুঝতে পারবেন এবং হয়তো বাঁক কাঁধে তারকেশ্বর যাবার প্রবণতাও কমবে। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীরায়চৌধুরী জাতীয় অধ্যাপক ডঃ রঙ্গনাথনের অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন পদার্থবিদ্যায় যেমন আইনস্টাইন, পাঠাগার বিজ্ঞানেও তেমন ডঃ রঙ্গনাথন। তাঁর দায়বদ্ধতা এই প্রজন্মও গ্রহণ করুক। পাঠাগার সবার জন্য যেন খোলা থাকে। সাধারণ পাঠককে যেন গ্রন্থাগার ফিরিয়ে না দেয়। একটি দেশের উন্নতি সে দেশের পাঠাগার ও পাঠকের সংখ্যা দেখে বোঝা যায়।

— *অরুণকান্তি দত্ত*

❋ বিজ্ঞপ্তি ❋

২২শে নভেম্বরের সংসদ অভিযান

আগামী ২২শে নভেম্বর, ২০০৬ সকাল ১১টায় দিল্লির রামলীলা ময়দান থেকে এস টি এফ আই-এর নেতৃত্বে সংসদ অভিযান শুরু হবে। যন্তর মন্তরে মূল সভাটি অনুষ্ঠিত হবে। ২১শে নভেম্বর, ২০০৬ আপনার জেলার সংসদ অভিযানে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের নিউ দিল্লি কালীবাড়ী, মন্দির মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০০১ পৌঁছতে হবে। ফোন নং ঃ ২৩৩৬ ৩৯৬২।

এখানেই ২১, ২২ এবং ২৩শে নভেম্বর, ২০০৬ — এই তিনদিন থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন দিল্লি কালীবাড়ীতে থাকা-খাওয়ার যা ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েই আমাদের থাকতে হবে। কোনো জেলার প্রতিনিধিরা যদি মনে করেন এরথেকে ভাল ব্যবস্থায় তাঁরা থাকতে চান তবে তাঁরা নিজ ব্যবস্থাপনায় ও ব্যয়ে থাকার ব্যবস্থা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সমিতির কোনো দায়িত্ব থাকবে না।

আপনার জেলার অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের নামের তালিকা (মোবাইল নম্বর সহ) ২৮শে অক্টোবরের মধ্যে সমিতির রাজ্য দপ্তরে অবশ্যই পাঠিয়ে দিন। কারণ নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিনিধিদের নামের তালিকা নতুন দিল্লি কালীবাড়ীর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে।

আরও কয়েকটি জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়

* সংসদ অভিযানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিনিধিকে ভোটারস্ আইডেন্টিটি কার্ড অথবা প্যান কার্ড (অরিজিনাল) নিরাপত্তার কারণে অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে।
* মশা মারা ধূপ বা ক্রীম, মশারি (টাঙানোর ব্যবস্থা সহ), শীতের পোষাক, মাথার হাল্কা বালিশ, চাদর, বেড শীট, কম্বল সঙ্গে নিতে হবে।

নিউ দিল্লি কালীবাড়ীতে আহারাদির সময়

** সকালে প্রাতঃরাশ ঃ সকাল ৭-৩০ মিনিট থেকে ৮-৩০ মিনিট

** দুপুরের আহার ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২-৩০ মিনিট

** রাত্রের আহার ঃ রাত ৭-৩০ মিনিট থেকে ৯-৩০ মিনিট

** সমিতি কেবল ২১, ২২ ও ২৩শে নভেম্বর, ২০০৬ কালীবাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করেছে। কাজেই যাঁরা ২০শে নভেম্বর দিল্লি পৌঁছবেন, ঐদিন দিল্লিতে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা সমিতির পক্ষে সম্ভব হবে না।

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক
নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

এস টি এফ আই-এর আহ্বানে সংসদ অভিযান

২২শে নভেম্বর, ২০০৬

জমায়েত ঃ সকাল ১১টায়

স্থান ঃ রামলীলা ময়দান

নতুন দিল্লি

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের

কেন্দ্রীয় সমাবেশ

দাবিসমূহ

- কেন্দ্রীয় সরকারকে সাম্রাজ্যবাদ তোষণনীতি প্রত্যাহার করতে হবে।
- শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, বেসরকারীকরণ বন্ধ করতে হবে।
- পেনসন ব্যবস্থার বেসরকারীকরণ বন্ধ করতে হবে।
- মডেল রাইট টু এডুকেশন বিল-২০০৬ পুনর্বিবেচনা করতে হবে।
- ৮-১৬-২৪ বছর অন্তর পরবর্তী বেতনক্রমের সুপারিশ কার্যকরী করতে হবে।
- অবিলম্বে ৩৬টি বি এড কলেজের বি এড পরীক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান করতে হবে।
- শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।
- নতুন শিক্ষাকর্মীর পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং শূন্যপদে নিয়োগের অনুমতি দিতে হবে।
- ধর্মঘটের অধিকারকে আইনগত স্বীকৃতি দিতে হবে।
- শিক্ষা প্রশাসনের সর্বস্তরে আমলাতান্ত্রিক বাধা দূর করতে হবে।
- চিকিৎসাভিত্তিক ছুটির উর্ধসীমা বাতিল করতে হবে।
- কিদ্‌ওয়াই কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করতে হবে ...প্রভৃতি।

৩ নভেম্বর ২০০৬

বেলা ১টা

স্থান

রানি রাসমণি এভেনিউ কলকাতা

— বক্তা —

পার্থ দে

বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ও সমিতির নেতৃবৃন্দ

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

বিদ্যাসাগর ভবন

৯/২, ব্লক ডি জে, সেক্টর II, সল্টলেক

কলকাতা-৭০০ ০৯১

সংখ্যা এল/সে কি/৯৮/২০০৬ — তারিখ ঃ ১৭·১০·২০০৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২০০৭ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সি সি ও স্পেশ্যাল পরীক্ষার্থীদের ফর্ম পূরণ করার শেষ তারিখ ছিল ১৭ই আগস্ট, ২০০৬।

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক বন্যাজনিত পরিস্থিতি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থ বিবেচনায় ২০০৭ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সি সি ও স্পেশ্যাল পরীক্ষার্থীদের ফর্ম পূরণ করার তারিখ আগামী ১৬·১১·২০০৬ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। ১৬·১১·২০০৬ পর্যন্ত সংসদের সমস্ত আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে সি সি ও স্পেশ্যাল পরীক্ষার্থীরা ফর্ম সংগ্রহ ও তা পূরণ করে জমা দিতে পারবেন।

১৬·১১·২০০৬-এর পরে সংসদের পক্ষে কোনোভাবে আর সি সি ও স্পেশ্যাল ফর্ম ২০০৭ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য জমা নেওয়া সম্ভব হবে না।

১৭ অক্টোবর, ২০০৬ — **ডঃ দেবাশিস সরকার**
সচিব

Teachers' Journal

ORGAN OF THE ALL BENGAL TEACHERS' ASSOCIATION

Editor : Sri Bikash Mandal ★ Joint Editor : Smt. Aparna Sanyal (Banerjee)

VOL. LXXXV **NO. 10** **OCTOBER, 2006**

Editorial

TRUTH AND FALSEHOOD

The sun germinates the life, the moon soothes the mind
And the stars adorns the pavilion of sky.
Natural bodies to all are meaningfully benign and kind
Tender hearts inculcate humane feelings, lend support to all
disdavanteged, and in the act never shy.

Some wear the garb of enlightenment, ignorant of their ignorance
Consider them wise in their own esteem,
Proud of their vain learning and false 'fragrance'
But delude people, yet can never satisfy their whim.

Far apart are wisdom and ignorance;
The first leads to the path of self-realisation,
While the second makes one more and more
Estranged from one's real Self;
It's reasoning which can bring light within.

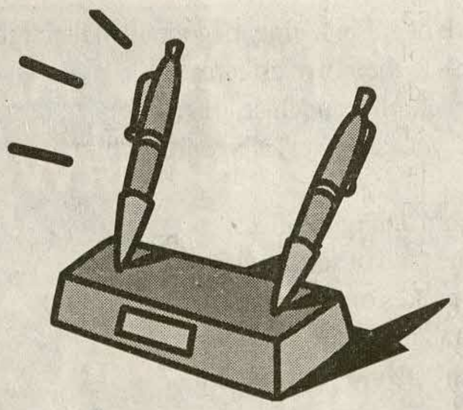
Keep open the windows of judgement, make the effort bright,
Allow not heart to drown in deep and dark 'twilight'.
Keep alive the bright rays of hope, push aside despair and fear
Life vibrates with actions having directions, corner awe-soaked contemplations;
March ahead with your compatriots dear.

Hatred can never put an end to hatred
Love for the better alone can everything do
A strong wind of resistance blows down all caprices and misdemeanours too.
The teachings of history stand as a beckon light, endorse everything true.

Life is shaped by understanding, we become what we think.
Joy follows an unsullied thought like a shadow,
It's a vile rumination of the past, which to the world of reality doesn't acc
Ruminate the positive aspects of life which are true.

The whisper even of southern wind cools each and all,
It never differentiates between tall and small.
Truth triumphs over falsehood, none can cover-up this eternity
Togetherness of egalitarian perceptions embrace not futility.

12 October 2006



Call Of The Association

SIBAPRASAD MUKHOPADHYAY
General Secretary

Autumnal festivals ended when natural calamity played havoc in as many as 16 districts of the state. Near-a-deluge hit 83 lacs of people sand 90 lives were lost. More than 4 lacs houses were damaged either completely or partially. Agricultural loss reads Rs. 1.5 thousand crore. The pro-people LF govt has alread allotted Rs. 104 crore for relief. The CM of the state had visited some of the affected areas and announced that all possible helps would be awarded to the victims. He did this during the days of the festivals. ABTA already has handed over a cheque of Rs. 50,000/- to the Hon'ble Finance Minister, Asim Dasgupta. Another amount of Rs. 50,000/- has been deposited to the West Bengal. State Relief Committee by the Association for relief. Through a letter the District Secretaries have been requested to collect money and relief materials for the flood victims. The winter is just ahead. Winter garaments are to be distributed among the students of the flood-hit areas. The highly responsible members have already enagged themselves in the task. The district secretaries are requested to send reports on complation of the assigned social obligation.

Relief and reconstruction works are on throughout the state. Efforts are on to ameliorate the condition of the flood victims. Simultaneously the treatment of the dengue and chickungunya infected persons is going on. The TMC and other parties has been passing through crisis. The sole object of the strike is to vitiate the industry-friendly environment of the state. The opposition parties want to oppose the initiative of the establishment of proposed Tata Motor Company at Singur; if materealised, this factory will create congemial atmosphere for growth of ancillary industries of every variety which will create extended job opportunity. The LF Govt is awarding maximum compensation money to the farmers and initiative for alternative income opportunity of needy persons has started. In the era of globalisation's jobless growth and retrenchment, the state govt is making efforts for creation of job opportunities despite constraints. The TMC is working against the interest of the state.

But the TMC in the last elections pledged for creation of industrial zones in the districts. Now the TMC is desperate to foil the ventures of indistrial growth. The Association called to oppose the strike all over the state. The district branches were requested to take necessary steps to keep the edul institutions open and it is expected that the people of the state attached due respect to this call.

The UPA govt pledged in the CMP that it would enact Right to Education Law recognising the duty of awarding free compulsory education of the children of the age group of 6-14. But now the UPA govt declines to bear the financial burden and asks the state govts to enshoulder the pecuniary responsibility. For this purpose, Model Rights to Education

Bill 2006 has been sent to the states. The UPA govt asserts that the state govts should bear the burden of compulsory free education of the children following the guidelines of the said bill. The allocation of money for Sarbasiksha (EFA) will be reduced to 50% from 75%. In simple words, money meant for education will be reduced. But the central govt is bound to bear all financial responsibility for compulsory free education of the children as per 86th amendment, 2002.

The Association has already opposed the intention of the central govt. ABTA has sent a letter to the Hon'ble School Education Minister, Prof. Partha Dey apprising him that the state govt should protest against attempted distroying of constitutional obligation by the central govt. The UPA govt wants to evade responsibility. The ABTA along with ABPTA arranged for a Convention on Model Right to Education Bill 2006 on 12 August, the foundation day of STFI at Satyapriya Bhaban. The speaker was Prof. Ranjugopal Mukherjee. Another convention was organised on the same bill on 23 September at Satyapriya Bhaban in which eight leftist Teachers-Edul-Employees Organisations participated. On that day the speakers were Hon'ble Minister, Prof. Partha Dey, Sri Kanti Biswas and Principal Bhabes Moitra. In the convention a resolution was accepted demanding reconsideration of the bill. The copies of the resolution have been sent to the Hon'ble Prime Minister and Central Human Resource Development Minister.

Meanwhile the Hon'ble School Education Minister of the state has informed that the central govt. forciblly is imposing the Bill. It can not be tolerated. The state will prepare an alternative bill consulting the educationists and the same will be sent to the central govt. In the alternative bill proposal will be made for joint sharing of financial responsibility by the central and state govts – in the affairs of education, central govt can never avoid responsibility. The central govt should take major financial burden for elementary education – Prof. Dey has reiterated.

ABTA cannot sit idle – district branches are advised to organise meetings opposing the bill.

Campaign programmes are on in the districts for Central assemblage to be held on 3 November. Efforts should be made to make the programme highly successful.

The state level cultural competition will be held at St Pauls Institution on 5 November. The programme is to be make successful like previous years.

'March to Parliament' on 21 November organised by STFI is an important programme. The participants will assemble at 11 a.m at Ramlila Maidan, New Delhi, on that day. The representatives of our Association will stay at Delhi Kali Bari, Mandir Marg, New Delhi-110001. Arrangement has been made for food as well from 21-23 November.

This is the first unaccompained programme of the STFI. As a constituent member of the federation we should endeavour to make the Parliament March programme successful in all respects.

ABTA Znidabad

Teacher-Education Employee-Student-Guardian Unity Zindabad

Jiban Shailee : A Step Towards Life Centric Education – An Institutional Task

Baidyanath Mukhopadhyay
Ex-teacher, Subhaspalli Bidyaniketan, Burdwan

The West Bengal Board of Secondary Education is introducing 'Jiban Shailee' as a subject in secondary education. There is already some misgivings about it which is quite natural and the Board (WBBSE) is shaking off its primary vacillation and has moved a few step forward. It has published a hand book for Teachers' guide, imparted training to assistant teachers by making resource persons at state, division and block level. The men in the field of Educational Research and Training have set the tune in this regard.

Before going into various aspect of the subject let it be realised that an average secondary school in the state as it stands today, is not capable of confronting various onslaught (?) in the process of its (Jiban Shailee) learning. This is simply for the fact that this is not a subject to be dealt with separately rather it is a learning process which establishes link between the great teacher (nature) and the learner (rational beings).

There are thousands of questions in the quest of life, particularly in the domain of age specific group of human being. Who are to reach them? How to reach them?

The pertinent question is whether the adolescents are the only concerned group of life centric education? The clear answer is No. They may be at the centre and hence are the target group but there are other equally no less concerned groups–the teachers, the guardians and the members of the society at large.

In the age we are living and passing through we are treated to enter into a global village. Rapid access to information and entertainment of different region of the planet, mixing and interaction of the diverse culture of different population as a result of technological revolution, has brought forth a new generation of thinking. Behavioural pattern, dresses and food habit have changed enormously. Consumption of liquor is no longer confined to a prohibited zone. For example, The percentage of effected families belonging to Bengali middle class is not negligible (Offering and consuming liquor is already part of the culture of the high & low strata of the society), occasional celebration and community festivals are also platform for encouraging those activities.

Pedagogy, the science of teaching–is to know how to assist the child towards the understanding of life. The school then must become a miniature of adult environment containing all the activities of life carried on in a disciplined and thorough way so that the pupil may learn or play with a purpose. Theories are there and should be but what is important is that the fact of life is to be presented as it is lived. Environment both physical and aesthetical creates stimuli among individuals. Various types

of reactions which are characteristics of individuals depend on those stimuli. Hence close observation of nature is the basis of life centric education.

To deal with we are to concentrate on the following points :

(i) To give expression to individuality

(ii) Children play – there is infinite craving on the part of organism for self expression. Play is one of the best way of self expression.

(iii) Teacher prepares his/her lesson from his/her lesson's point of view not individual's point of view.

(iv) For formation of student's character teaching of Art is necessary. Creation of crude earthenware pot to creation of Ajanta & Elora – all are art.

(v) Mysterious link between individul life and life of nature society which surrounds him.

The most unfortunate part of our teaching-learning process is that we give the least importance to the aspects of life that are outside the school syllabus. The reason is manifold. Some of them are :

(i) We feel problems of students can be solved by utilising class room teaching only.

(ii) Direct observation of nature in early school days is prevented now. Our school is comparable to prison house made to prevent a child to be influenced by the natural elements around us.

(iii) The prevailing condition in the field of education are:- (a) absence of massive orientation of the teachers making them vulnerable to one sided thinking supported by some dogmas, (b) absence of close interaction with the development of knowledge for combating the challenge, (c) most of the teachers have got no access to the updated books on child psychology which makes one keen observer with sound judgement.

Now we are serious enough for introducing 'Jiban Shailee' in secondary school and as such we should ponder over whether we can converge on the following points :

1) That 'Jiban Shailee' can not be introduced as educational subject with a framed syllabus still it has to be assimilated in its reality.

2) That 'Jiban Shailee' can not be introduced in schools in isolation rather it should and must be a community project.

3) The school complex or cluster of schools as we may call it is still a conceptualised thinking and still awaiting to be materialised.

4) School complex is a proper platform over which 'Jiban Shailee' can take root. School complex should not be a settlement of a number of loosely fitted schools having neither authority to govern nor direction mandatory to its member schools. Functioning of school complex must be through CRC (Cluster Resource Centre). Functioning of school complex should not be construed as an yeomen's work. Multifaced activities of secondary schools which is growing voluminously with the change of time to meet the challenge of the day is being seriously handicapped due to poor quality of school organisation, absence of clear aim, motivation, planning, training etc. This leads to lack of discipline and transparency, prevalency of age old practices in teaching and learning, outdated notion on evaluation, obscurantist view in getting external people to speak to the students and faculty, absence of updated office records and finally the students are regarded as liability not human resource.

In order to make the scheme of 'Jiban Shailee' effective in secondary school (as well as to make the objective of time bound programme of Sarva Siksha Aviyan a reality – Jiban Shailee and Sarva Siksha are insparable) the WBBSE should consider that it has a direct access to the organisation of school complex. To achieve this the Board has to evolve a **diversified mechanism** so that education may reach the grass root level.

A catalogue of programme may be considered –

1. A subject on Aeasthetics (Nandanik) can be introduced carrying 100 marks with the following contents :

(i) Recitation (Solo or Group)
(ii) Music (Vocal/Instrumental)
(iii) Discussion (Single/Group)
(iv) Impromptu
(v) Reading from text (Prose/Poetry)
(vi) Story telling
(vii) News reading
(viii) Drama
(ix) Mime
(x) Shadowgraphy
(xi) Jagglery
(xii) Handicraft using, paper, paper pulp, Thermocol, Bamboo, Pith, Cane, Soil,
(xiii) Gymnastic
(xiv) Drill
(xv) Asanas

All these items may be separately grouped into three part –

1st group from	(i) -(xi)	40 marks
2nd group	(xii)	40 marks
3rd group	(xiii) - (xv)	20 marks

The 3rd group is allotted lesser marks keeping in view of the fact that work education group is compulsory for students of class VI, VII, VIII and additional for IX & X.

Students may have option to take 3 items of the content in Gr. I and II school may arrange teaching the subjects from its own resources or take help from experts on the subject who could volunteer their service in the interest of the institution concerned in particular and society at large.

2. Project Report : It may be done by individual or group

(a) Project :- One of your friend who resides close to your residence has fallen ill.
(b) Forming : Forming a team with friends and parents.
(c) Informing parents about the incident & informing other friends.
(d) Performing
(e) Conclusion

To elaborate :

(a) Project :- A mission bends people together in a team. Effective team members share mission and vision.
(b) Forming :-
(i) A group of 4-6 members form a team and they share the mission.
(ii) There should be open communication & discussion on all the points raised during the work.
(iii) There must be mutual understanding and trust.
(iv) Their should be creative conflicts.
(c) Informing :- The team so constituted should have all necessary informations such as –
(i) The family of the sick boy (belong to which category Rich/Middle/Poor).

(ii) No. of members of the family.

(iii) Who (member of the family) cares for the boy.

(iv) With whom the boy has open talk.

(v) Does the boy get proper treatment - Medical, Physical, Mental.

(vi) Whether the family is health conscious.

(vii) Idea of the family about cleanliness.

(viii) Idea of the family about pollution - water/sound/air.

(ix) Whether the family is acquainted with community health/Students' Health Home etc.

(d) Performing :-

(i) Appropriate working method to combat the situation.

(ii) Individual member of the team should be empowered to take the lead.

(iii) Each one has a potentiality to be a leader in that in different situation every one has a role to play.

(iv) Inspiration brings a sense of power among people. When one is inspired one gets real empowerment.

(e) Conclusion :- Each member of the team may try to conclude in his/her own way and finally the consensus is achieved.

The following projects may be considered :

(i) You have performed a household work in a team with other members of the family.

(ii) You have done something towards helping your friend in his studies.

(iii) A description of conversation stressing on mode of talking, gesture, body language with your elder or junior.

(iv) How do you enjoy your leisure time.

(v) Your visit to a Hindu/Muslim/Christian family.

(vi) A programme of your choice in T.V.

(vii) A description of a portion of your recently read book.

(viii) The influence of sunrays on your life.

(ix) A travel by Bus/Train/Boat.

(x) One of your successes which you think great which other may think otherwise.

(xi) Influence of your elders on you.

(xii) Meeting and conversation with a senior student.

(xiii) Meeting and conversation with a girl friend.

(xiv) Your talk in a language other than your mother tongue.

(xv) Your talk with the puller of the Rickshaw you are riding.

(xvi) Your fascinating experience.

(xvii) Your idea about night sky.

(xviii) A lively description of the game you play.

3. Interaction

a) With the family

b) With the class

(a) In a quest for oneself one (Boy/Girl) must find time to sit with and to talk with the family. The elders in the family have to arrange for this. Following steps are suggested–

(i) Celebration of achievements, however small. It should be noted that a success and failure has got different meaning in the context of different situation.

(ii) Organising entertainment by participation of family members.

(iii) Inventory methods for expressing one self–say by bringing forth childhood day/ memorable day–when one is inspired or dejected.

(b) In a class meant for the lifestyle or before starting of the class or at the tiffin hour one may gather information on –

(i) One who recites with distinct pronunciation.

(ii) One who has always a smiling face.

(iii) One who retires at 11.00 p.m.

(iv) One who has recently read a book on a great man.

(v) One who has got no brother or sister in his/her family.

(vi) One who has never boarded a train/ boat.

(vii) One who has never tasted a particular fruit.

(viii) One who has lost his/her father/ mother.

(ix) One who has not seen a tiger.

(x) One who has climbed a mountain.

(xi) One who has visited forest.

(xii) One who has visited other state.

All the members (students) of the class be brought in 12 groups.

4. Creating Platform

Inculcating

(a) Self confidence

(b) Identify oneself with the masses

(a) Inculcating self confidence. Each boy or girl has a separate domain of activity in which he or she has got affinity. It is by creating platform for each of them not only the field of interest will be judged but also the centre of excellence will get exposure and can easily be marked. The following items may be of choice:

(i) Observance of days through out the year.

(ii) Issuing weekly bulletin with some literary aspects on a prominent place in the school premises

(iii) Producing teaching-learning materials.

(iv) Producing scientific/historical charts geographical & scientific models.

Memorable days may be observed one or two days in a week by organising seminars, depicting pictures and displaying banner writings in class room or prominent place.

Original writings in the bulletin is to be encouraged.

The students may be provided with materials for producing TLM also they may be encouraged to use used up or thrownaway materials.

Note : Days may be observed/celebrated within or outside school hour without disturbing the normal functioning of the school. Students will take lead and particiate in every item of a programme.

(b) Participation in Mass collection for the victims of natural calamities, anti-war demonstration, for communal harmony.

5. Parent-Teacher Association

Meeting with parents are to be organised at regular intervals, involving. lesson of various topics.

(i) Behavioural pattern of the students and response of the elders and vice versa.

(ii) Physical change relating to adolescence and its impact on the mental set up of students.

(iii) Addiction to wine, drugs and smoking.

(iv) Stress and hazards affecting the growth and development of the students that need to be addressed by the society.

(v) A unit at the family level is to be formed centering each boy/girl. A work plan is to be evolved by such a unit for both the adolescent boy/girl and his/her family. This work plan should be in comformity with the work plan by the teacher.

(vi) Personal contact with each and every boy/girl is to be made through personal

equation such as date of birth, hobby, favourite player/singer etc.

Illustration : Greetings may be exchanged with students on a particular day on which their birthdays fall.

A detailed work plan should be framed on the basis of the programme as suggested above which will form the content of the working principle of lifestyle education. This will help in forming not the syllabus of the subject but some more action plan on some new found field of experience.

There can never be two opinions that the onus of implementing such a programme lies on the teaching community, even after taking into consideration various limitations and constraints our school system is undergoing. There are various organisations and establishments whose help in this regard we can count. One thing is certain – those who in the teaching community find other source of income and can't spend even a minute beyond 'eleven to four' must change because everything is changing in the world.

POEM

Teacher and teaching

Sudip Ganguly, Assistant Teacher
Chetla Boys' High School, Kolkata

Teacher trains the mind
of students in academic institution –
Teacher ought to be generous or kind
Knowledge through education –
A teacher can provide :
Teacher is the philosopher and guide.
Illiteracy means unconscious life
without shining sun
of knowledge;
and knowledge is a blessing.
Teaching too, refers to learning

13.10.2006

To

Dr. Manmohan Sing

Hon'ble Prime Minister

Government of India

New Delhi

Sub : Proposal for reconsideration of Model Right to Education Bill, 2006.

Respected Sir,

We, the General Secretaries and representatives of eight Left teacher's and educational employees' organisations of West Bengal which represent several lakhs of primary and secondary teachers of the state would like to draw your attention to the 'Draft Model Right to Education Bill, 2006' sent to West Bengal recently for your reconsideration and favourable decision for the following reasons :

First, having failed to receive responses from all the State Governments in favour of Right to Education Bill, 2005 which was proposed on the basis of the recommended essential provisions of the legislation suggested by the Sibal Committee a Model Right to Education Bill, 2006 has been sent to the states after 'further consultation' (as stated in the letter of Shree Champak Chatterjee, IAS, attached with the Model Right to Education Bill, 2006).

Our question is : who were consulted?

The human resource ministry dropped the plan to table it in Parliament. No conference either of Chief Ministers, or of Education Ministers of States or of Educationists was convened before taking such decision. It is curious to note who were consulted has not been mentioned in any communication of the Central Government.

The Centre has quietly sent the 'Model Right to Education Bill, 2006' to the states. It is not in conformity with our democratic set up.

Second, we have come to know from the letter of Shree Champak Chatterjee, IAS "Instead of a Central Legislation a 'Model Right to Education Bill should be formulated and circulated as a frame-work for states to adopt the same by enacting new legislation, if they do not have any, or modifying suitably where necessary, their Act if they already have one".

Why will not there be Central Legislation to provide for free and compulsory education to all children between 6 and 14? It remains unanswered.

According to a new Article 21 A (Right to Education) in Part III ('Fundamental Rights') of the Constitution :

"The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state, may, by law determine".

The term 'The State' has been clearly defined in Part III, Fundamental Rights of the Constitution which runs as follows :

"Unless the context otherwise requires, "The State" includes the Government and Parliament of India and the Legislature of each of the State and all local and other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India".

Then how does the Central Government decide not to place any bill for Central Legislation on education in the 'Parliament of India' for appropriate action?

Third, in Model Right to Education Bill, 2006 funding under Sarva Siksha Abhiyan (SSA) has been made contingent upon enactment of appropriate State Acts on free and compulsory education. SSA-Fund on 75 : 25 basis (90 : 10 in case of North Eastern States and Jammu & Kashmir) during the 11th Five year plan will be available for those states which will adopt the Model Right to Education Bill, 2006 'intoto' and those states which will fail to do so will get SSA-Fund on a 50: 50 basis only in accordance with the MOU signed with the Central Government. These are blatant violation of the principle of State-autonomy.

It has been suggested by the Central Government that "The Draft Model Bill on Right to Education, 2006 proposes that the first charge on the revenues of a state next only to law and order, shall be that of matters related to free and compulsory education".

Is it not strange that the Central Government sets the priorities of the state budget and shifts the financial burden for the implementation of the directive of the Constitution on the already weak shoulder of the States?

Fourth, in the "Right to Education Bill, 2005" the responsibilities of the respective Governments (Central and State) were clearly stated in Chapter III of the draft but in the Model Right to Education Bill, 2006 only "Responsibility the state" has been mentioned, still now, education in the concurrent list. Therefore, it is a concurrent responsibility of the Central and the State governments.

The State governments are spending 12 to 20 percent of the State budget on education. The Government of West Bengal has decided to spend 14 percent of the total State budget on education in the year 2006-07 inspite of the financial crunch.

Unfortunately, the Central Government did not keep its promise to spend 6 percent of GDP on education as announced in CMP. The Central Government has allocated only 4.3 percent for education in the last 'Central Budget' though the Central Government has imposed 2 percent education cess on income and service charges.

We firmly believe that at present when will millions of poor children are out of school in our country the implementation of consitutional mandate is the primary responsibility of the Central Government.

We demand that education should be removed from the Concurrent list and included in the State list again to respect State-autonomy.

We also demand that early chilhood education of children of the age of 0 to 6 must be

recognised as "Fundamental Right". We must not forget, our constitution makers categorically stated in the chapter of Directive Principle of State Policy (Article 45) that "The State shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this constitution for free and compulsory education to all children until they complete the age of 14 years."

With thanks,

Siva Prasad Mukhopadhyay
General Secretary/Representative
All Bengal Teachers' Association

Pradip Biswas
General Secretary/Representative
All Bengal Primary Teachers' Association

Swapan Mandal (for General Secy.)
General Secretary/Representative
Bangiya Sikshak-O-
Sikshyakarmi Samity

Jaharlal Chatterjee
General Secretary/Representative
Bangiya Prathamik Sikshak-O-
Sikshyakarmi Samity

Tarit Brahmachari
General Secretary/Representative
Sara Bangla Sikshak-O-
Sikshyakarmi Samity

Sudip Narayan Goswami
General Secretary/Representative
Sara Bangla Prathamik Sikshak Samity

Rajkumar Raha
General Secretary/Representative
Paschim Banga Madhyamik
Sikshak Sangha

Sukumar Chakraborty
General Secretary/Representative
Prathamik Sikshak Sangha,
West Bengal

★★ Copy to H.R.D. Minister, Government of India
★★ Copy to Chief Minister, Government of West Bengal
★★ Copy to Higher Education Minister, Government of West Bengal
★★ Copy to School Education Minister, Government of West Bengal
★★ Copy to Madrasah Education Minister, Government of West Bengal
★★ Copy to General Secretary, S.T.F.I.
★★ Copy to General Secretary,...

SCHOOL TEACHERS' FEDERATION OF INDIA

4, Dr. Radhakrishnan Nagar, Abdullah Street, Choolaimedu, Chennai-600 094

October, 2006

Dear Comrades,

The Secretariat meeting of STFI was held on 16th September 2006 at 2.00 PM at ABTA Office Kolkata, Com. Kartik Mandal presided the meeting. General Secretary presented the work report. Joint General Secretary A.K.Chandran, Vice-Presidents Sibaprasad Mukhopadhyay, Pradeep Biswas, S.T. Antonysamy, John Philip, Sultansing Ola, secretaries Utpal Roy, Amal Chatterjee and M.K. Sreedharan attended the meeting.



Comrade K. Rajendran, General Secretary of STFI, speaking at the Secretariat meeting on 16th September, 2006

The Central exicutive meeting was held on 16th September 2006, at 6.00 P.M. at ABTA Office, Kolkata, Com. Kartik Mandal presided the meeting General Secretary K. Rajendran presented the work report. In addition to the secretariat members, C.E.C. Members Baidyanath Mukhopadhyay Miss. Mitra Bhattacharya, N. Ramanaiah Sastri, A. Subramanian, A. Mayavan, R. Jayaraman and Narayan Ruthrapal attended the meeting.

The General council meeting was held on 17th September 2006 at 10.00 A.M at ABTA office, Kolkata. Com. Kartik Mandal presided the meeting. In addition to secretariat and CEC members, General council members Samarendra Sarkar, Abhijit Mukherjee, Ehshanali, Anjali Hazra, Biresh Sikdar, Bikas Mandal, Manoranjan Bhadra, Nirmalendu Guha, Mozammel Haque, Samir Bhattacharya, Aberesh Bhattacharya, Dilip Sarkar, Janardan Das Adikari, D. Rami Reddy, G. Muralidaran, N. Parvadarajan, Devendar Singh, N. Sadanandan, P.D. Sreedevi, C. Usman, K.M. Sukumaran, M. Shajahan attended the meeting.

Welcome Address : was given by Com. Sibaprasad Mukhopadhyay, President Kartik Mandal

placed the ajenda before the council and got the approval and it was accepted.

Condolance : The president himself moved the Condolance resolution to the sad demisal of Gita Sen of T.G.T.A (H.B.Road) Com. Suboodh Roy, freedom fighter, Com. Fnoolvene Guha ex-minister of Edu. Com. Amiya Bose leader of BTEA, Com. Mahaboo Jalenbe, Com. Nianmatha Talukder, freedom fighter, Com. A. Kannan former all India Vice President CITU, Com. A. Kanaran National leader of Agriculture workers union, Artist Bismilla Khan, Shanshedrahman great poet, The General Council paid homage to the people who lost their lives in the fight against imperialism, terrorism and communal forces and also those who lost their lives in the natural calamities.

Work Report : The General Secretary placed before the council the work report. The report contained former secretariat, and CEC meetings, state level work shop on education, meeting with HRD minister, All India convention on Education, Observation of demand day on 12th of August 2006, National convention of workers, the action programme for the success of All India General Strike on 14th December of 2006, March to parliament to withdraw PERDA Bill on 18th August 2006, STFI Bulletinn, expansion of organization, Prospects of new affiliations, the Parliament March on 22nd November 2006 and the one time organization found to be collected (Rs.2/- per member) General Secretary requested all the constituent organizations to move strongly to mobilize the units in order to make 22nd November, 2006 Parliament March and 14th December, 2006, All India General Strike a grand success.



Comrade Kartik Mondal, President of STFI speaking at the General Council meeting on 17th September, 2006

Discussion : The following General council members participated in the discussion. (1) Com. Samarendra Sarkar (ABTA), (2) Com. Devendra Singh (R.S.S) (S)}, (3) Com. R. Jayaraman (Pondichery), (4) Com. C. Usman (K.S.T.A), 5. Com. Ramanaiah Sastri (APUTF), 6. Com. Nimalendra Guha (ABPTA), 7. Com. Parvatha Rajan (TNPTF), 8. Com. Narayan Ruthrapal (TTA H.B. Road), 9. Com. Amal Chatterjee (T.G.T.A H.B. Road), 10. Com. A Subramanian (T.I.A.S), 11. Com. A. Mayavan (TNHHSSGTA), 12. Com. P.d. Sreedevi (KSTA), 13. Com. Mitra Bhattacharya (ABTA) 39 out of 71 General Council Members attended the meeting 13

Ciomrades including 2 women participated in the discussion.

After General Secretary reply our former President and special invitee from Bihar, Lal Bahadur Singh adressed the General Council.

Resolution : 1. Comrade A.K. Chandran moved a resolution to make All India General strike on 14th December of 2006 a grand success. It was supported by M.K. Sreedaran.



Members of General Council of STFI present at the meeting.

2. Com. S.T Antonysamy moved another resolution demanding central Government to pass the right to Education Bill with proper basic changes. It was supported by Com. John Philip.

The two resolutions were passed unanimously by the General council.

Decisions taken to the G.C.

1. Rally on 22nd November, 2006 will start from Ramleela ground at 11.00 A.M.
2. More attention must be taken on Haryana, Rajasthan and Punjab to mobilize more teachers to the rally.
3. Component organisations should provide funds to spent on rally mobilization of their units.
4. All secretariat members should be present on 20th November, 2006 at New Delhi for preparative works.
5. It was decided to pay the actual II class train fare to the secretariat members to attend the meetings.
6. In every CEC meeting the treasurer should place the account.
7. Two internal auditors should be elected by the General council.
8. Com. C. Usman (KSTA) and Com. Manoranjan Bhadra (ABTA) were elected as internal auditors by the General council.

18.9.2006

K. RAJENDRAN
General Secretary, STFI

DENGUE

Dengue is a viral infection caused by a group-B Arbo Virus-a Flavi virus. This virus include serotypes 1,2,3 &4 called DEN-1, DEN-2, DEN-3 & DEN-4. Incubation period 5-6 days usually may also varyfrom 3 to 10 days.

Clonocal feature=Fever, chill, pain behind eye-ball, muscle-pain. For first two days of illness = malaise and headache; Acute onset of fever. backache, generalised pain, painful red eyes, lymph adenopathy, lacrimation, anorexia, nausea, vomiting, bradecardia, depression.

The fever may be continuous or interrupted on 4^{th} or 5^{th} day. The fever last for 7 to 8 days.

Rash - develops gradually, centripetally, Convalescence is slow. One attack of dengue gives immunity for 9 months and after several attacks a degree of permanent immunity develops.

DENGUE HAEMORREGIC FEVER (D.H.F.)

A probable or confirmed case of Dengue fever may have haemorregic tendency which is proved by –

- Positive tourniquet test
- Petechiae, echymosis or prpura
- Bleeding mucosa from gastrointestinal tract, injection sites, haematemesis, malaena
- Signs of plasma lickage (pleural effusion, asscites, hypoprotinaemia)
- Bleeding manifestation is due to low plate count 100000 cells or less/cumm (normal plate count is 250,000 cells/cumm)

DENGUE SHOCK SYNDROME (D.S.S.)

A dengue fever case may lead to shock - DSS (Dengue Shock Syndrome) manifested by weak pulse, low pulse pressure (20 mm of Hg) (Pulse pressure=Systolic pressure-Diastolic pressure, usually 140-90=50 mm of Hg). Hypotension -(Systolic below 100 mm Hg; diastolic below 60 mm HG). There will be low urine formation, cold clammy skin, altered mental state.

LABORATORY DIAGNOSIS

The diagnosis of DF/DHF can be confirmed by serological tests. This includes detection of Igm antibody which appear at the end of 1st week of the onset of signs and symptoms and are detectable for 1 to 3 months after acqute episode.

A rising titer of IgG antibody in paired sera taken at the interval of 10 days or more ids comfirmatory. IgG indicates previous infention and are useful for sero-epidemiological studies to determine silent infection and immunity levels in local population.

For diagnostic test kits "Antigen" is produced in a limited quantity at NIV (National Institute of Virology, Pune). The antigen is also available in commercial lab-farm.

Blood for serological studies should be carefully collected from suspected DF/DHF cases as early as possible after hospital admission or attending at a clinic; also this is done shortly before discharge from hospital. If

possible also this can be done 21 days after onset of the disease.

Failure to leave an interval of 10 to 14 days may prevent one to detect primary dengue case by serological test.

Specimen containers should be clearly labelled with this information.

- Name of patient
- Name of mother/father
- Age
- Complete residential address
- Name of Hospital/BPHC sending blood samples
- Registration No. of the patient
- Date of illness (Onset)
- Date of hospitalisation
- Date of collection of sample
- Provisional diagnosis
- Brief clinical findings
- Result of tourniquet test.

MANAGEMENT DENGUE FEVER

- Bed rest during acute fever stage
- Paracetamol Tablets to be used (No aspirin or Ibuprofane)
- Keep the body tempeture below 39 degree C by cold sponging of the body and use up paracitamol.
- Adequate oral fluid - more than 2 liters a day.

MANAGEMENT DENGUE HAEMERREGIC FEVER

- Management of febrile illness with adequate fluid and use up paracitamol. No APC/Aspirin/Brufen.
- Oral. I.V, Fluid with normal salaine, use of Plasme Expander (Haemaccel), Fresh frozen plasma, blood transfusion.

MODE OF TRANSMISSION

Bite of female Aedes Aegypti mosquito during day time. The mosquito become infected by biting a patient with dengue infection. Female mosquito becomes capable of transmission of dengue virus after 8 to 10 days of first blood meal from infected patient. This infected mosquito remains dangerous for about 21 days after that. A mosquito usually live up to 21 to 40 days depending on atmospheric temperature, humidity etc. This type of mosquito has white stripes on the back and legs and are also called tiger mosquito. Aedes Aegypti and Aedes Albopictus are vectors of dengue which lay eggs in clean water, containers, in and around houses, schools, work places etc.

CHIKUNGUNIA FEVER

Due to Chikungunia virus this takes place. The vector is same as that of dengue. In our country mainly south India and western India are affected. Chikungunia usually starts with fever, chill, headache, nausea, vomiting, joint pain and rash. In Swahili language Chikungunia means which bends up with severe arthritic pain. The time between the bite of mosquito carrying the virus and the start of the syndrome ranges from 1 to 2 days.

It is diagnosed by blood test (ELISA). NIV, Pune and NICD, Delhi supply ELISA kit.

Any one who is bitten by infected mosquito can get this viral fever.

TREATMENT

There is no treatment in specific sense. Only supportive therapy as that of dengue fever is applicable.

PREVENTION

For both Dengue and Chikungunia

- Use of mosquito repellent on skin and clothing
- When indoors stay in well-screened areas. Use bed-nets if sleeping in areas that are not screened or air-conditioned.
- When working outdoors during day time wear long sleeved shirts and long pants or Salwar-kamez for female to avoid mosquito bite.
- Source reduction is very important, take care of stored water in any container which can be emptied very frequently.
- Use larvicidal like Tenephos.
- Use of Larvivorus fish.

Dengue fever in West Bengal as on 18.10.2006 (from 1.1.06)

Total cases diagnosed as suffering from Dengue fever	573
Cases reported on the day	31
Death report received on the day	0
Total Deaths :	04
Seropositive death cases :	04

	District	Total cases	Cases reported for the day	Total deaths
1	Bankura	5	0	0
2	Birbhum	7	0	0
3	Hooghly	25	2	0
4	Howrah	35	1	1
5	Kolkata	331	17	1
6	Purba Midnapore	11	1	0
7	Paschim Midnapore	6	0	0
8	Malda	2	0	1
9	Murshidabad	16	1	0
10	North 24 Parganas	58	4	0
11	Nadia	9	0	0
12	South 24 Parganas	36	0	0
13	Burdwan	12	2	0
14	Purulia	2	0	1
15	Uttar Dinajpur	2	0	0
16	Dakshin Dinajpur	1	0	
17	Not known	4	0	0
18	Other States (Orissa, Jharkhand)	11	3	0
		573	31	4

Addresses of 2 cases have not been intimated.

Collected from School Education Department, Govt. of West Bengal.

প্রকাশনার তারিখ ঃ ২৮ অক্টোবর, ২০০৬ Regis[illegible] -- SSRM/KOL/RMS/WB/RNP-225/2004-06

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ-প্রবর্তিত নতুন পাঠক্রম অনুসারে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য প্রকাশিত সেরা বই

● বর্দ্ধন ● সেন ● ভক্ত ●
উচ্চমাধ্যমিক জীববিজ্ঞান

● Chaudhuri ● Bardhan ● Bhakta ●
A TEXT BOOK OF BIOLOGY

● শ্যামলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ●
দর্শন প্রবেশিকা

● গৌতম মল্লিক ●
উচ্চমাধ্যমিক অর্থনৈতিক ভূগোল

● শচীন্দ্রনাথ মন্ডল ●
আধুনিক ভারতের ইতিহাস
আধুনিক ইউরোপ ও বিশ্বের ইতিহাস

● বৈদ্য ● মজুমদার ●
উচ্চমাধ্যমিক গণিত

● Utpal Roy ●
INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE

● উৎপল রায় ●
উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান

● তারাপদ সাঁতরা ●
উচ্চমাধ্যমিক ভূগোল

● রাধাশ্যাম সামন্ত ●
উচ্চমাধ্যমিক আধুনিক ধনবিজ্ঞান

● নারায়ণী বসু ●
গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রূষা

● ঘোষ চট্টোপাধ্যায় ● বসু ●
উচ্চমাধ্যমিক খাদ্য ও পুষ্টি

● P. K. De Sarkar ●
HIGHER SECONDARY ENGLISH GRAMMER & COMPOSITION

● বর্দ্ধন ● সেন ● ভক্ত ●
জীববিদ্যা

● বর্দ্ধন ● সেন ●
জয়েন্ট এনট্রান্স জীববিজ্ঞান

● Chaudhuri ● Bardhan ●
JOINT ENTRANCE BIOLOGICAL SCIENCE

● মহাদেব দাসখান ●
পদার্থবিদ্যা
জয়েন্ট এনট্রান্স পদার্থবিদ্যা

● Mahadeb Daskhan ●
A TEXT BOOK OF PHYSICS
JOINT ENTRANCE PHYSICS

● Dibakar Kundu ●
MODERN INTRODUCTION TO EDUCATION

● শ্রীহর্ষ বৈদ্য ●
গণিত

ক্যালকাটা বুক হাউস

১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ফোন ঃ ২২৪১-০৯৬৫/২২৪১-৯৪০৪

Printed by Sibaprasad Mukhopadhyay on behalf of All Bengal Teachers' Association, at the Ganashakti Printers (P) Ltd. 33, Alimuddin Street, Kolkata-700 016 and also Published by him at the A.B.T.A. Office, P-14, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata-700 013.